প্রকাশক

ব্ল্যাকি (ইণ্ডিয়া) এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১০/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া ১৩৬৭

প্রচ্ছদ
শ্রীশচীন রায়

মুদ্রাকর

সারদা প্রিন্টার্স
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

অস্তিত্বের

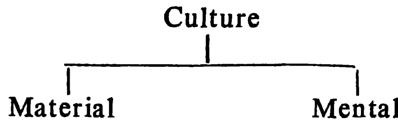
নানা

মহল

সূচি

ভারত-সংস্কৃতি ও আমরা

'Culture means the total accumulation of material objects, ideas, symbols, beliefs, sentiments, values, and social forms which are passed on from one generation to another in any given society'—ইউনেস্কোর Traditional Cultures in South-East Asia গ্রন্থে প্রদত্ত 'Culture'-এর এই অর্থ সাধারণভাবে স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই। একটি জাতির কালচার-এর স্বরূপ-পরিচয় উদ্ধার করতে হলে বিষয়টিকে দু'দিক থেকে বিচার করা উচিত। বিষয়টিকে আমরা এইভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি—



ভারত সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে তাকেও এই উভয় দিক থেকেই বিচার করতে হবে।

অনেকের ধারণা, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় পণ্ডিতেরাও আছেন, যে, ভারত-সংস্কৃতি বুঝি কেবল তত্ত্ববিদ্যা-অন্বেষণেই সময়, শ্রম এবং ধী-শক্তিকে ব্যবহার করেছে—প্রথম থেকে এ-পর্যন্ত। সাধারণ ভারতীয়রা যখন তাঁদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কিছু বলেন এবং গৌরববোধ করতে চান, তখন মানুষের অন্তর্জীবনের উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম দিকগুলি নিয়ে ভারতবর্ষ যে অবিশ্বাস্য বিশ্লেষণ-প্রতিভার ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে, সে দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এমন-কি 'কালচার' -এর ঐ m e n t a l দিকটিকেই 'একমাত্র' বলে চিহ্নিত করতে চান।

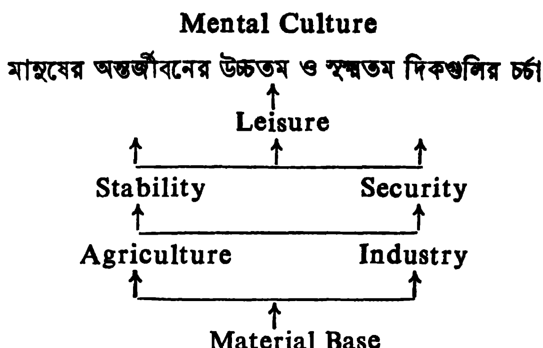
এর ফলে দু'টি বড়ো রকমের ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে। প্রথমত, বিশ্বে এবং এমন-কি ভারতবর্ষে ভারতীয়দের কাছেও ভারত-সংস্কৃতির অখণ্ড পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, ঐ mental দিকটিকেই আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সংস্কৃতির material দিকটি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য চরম হওয়ায় সংস্কৃতির পার্থিব, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দিকটিতে আমাদের কাজ ও অগ্রগতি ক্ষতিকরভাবে ব্যাহত হয়েছে।

মনে রাখা খুবই জরুরি যে, একটি সংস্কৃতির আদি-পর্যায়ের অগ্রগতি ও বিবর্তন তার পার্থিব বাস্তব দিকটিকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। ভারত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটার কথাও ছিল না। ভারত-সংস্কৃতির বাস্তব দিকটির সূচনাকাল নির্ণয় করা সুকঠিন, উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে, — এ কথা সত্য।

কিন্তু ঋগ্বেদ শুধু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়, ঋগ্বেদ মানবসভ্যতারই প্রথম লিখিত নিদর্শন। ঋগ্বেদ থেকেই এমন এক জাতির পরিচয় আমরা পাই, যাঁরা কৃষিবিদ্যা কুটিরশিল্প এবং গ্রামসংগঠনে রীতিমতো অগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কাব্যকবিতা ও রণবিদ্যা প্রভৃতির প্রতি সমপরিমাণেই তাঁদের আগ্রহের পরিচয় দিয়ে তাঁদের সামগ্রিক জীবননিষ্ঠাকেই অভ্রান্তভাবে তুলে ধরেছিলেন।

সিন্ধুসভ্যতা ঋগ্বেদ-পূর্ববর্তী কী-না তা' নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকবৃন্দ একমত নন। সিন্ধুসভ্যতা যদি প্রাচীনতর হয়, তা-হ'লে ভারতবর্ষ যে অধিকতর সুপ্রাচীন কালেই উচ্চাঙ্গের ও সুমার্জিত নাগরিক সভ্যতার অধিকারী ছিল, সেটাও প্রমাণিত হয়। আর, সিন্ধুসভ্যতার কাল যখনই নির্দিষ্ট হোক না কেন, ভারতবর্ষের সমাজ-প্রগতি যে সুপ্রাচীন কালেরই ঘটনা, তা' নিয়ে কোনো তর্ক নেই। সেইজন্যই, পার্থিব-বাস্তব পর্যায়ে ভারত-সংস্কৃতির সমুন্নতির ফলে ঋগ্বেদ-এর যুগের ভারতীয়গণ [Indo-Aryans] জীবনধারণের সমস্যা-সমাধানের পাশাপাশি মানুষের অন্তর্জীবনের উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম দিকগুলি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়ার অবকাশও পেয়েছিলেন। এই ভারতীয়গণ ছিলেন কর্মঠ ও ধীমান। আর তাঁদের ছিল সূক্ষ্মচিন্তার অবসর। তাঁরা সহজেই তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত সময় ও বুদ্ধিকে আত্মানুসন্ধানের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। নৃতত্ত্ব [Science of anthropology] থেকে জানতে পারি, অগ্রগতির কোন্ পর্যায়ে মানুষ, মানুষের অন্তর্জীবন

বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। বেশি কথা খরচ না করে বিষয়টি এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া যায়—



ঋগ্বেদ থেকেই আমরা জানতে পারি, অতি প্রাচীনকালেই আমরা মানুষের অন্তর্জীবনের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। কাব্যকবিতার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু শুধু সাহিত্যেই নয়, দর্শন-এর (Philosophy) ক্ষেত্রেও আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ এবং মানুষের অস্তিত্বের অর্থ নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল সুপ্রাচীনকালে, ঋগ্বেদ-এর সময় থেকেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারত-সংস্কৃতির অন্তর্মুখী স্বভাব জীবনের পার্থিব দিকটিকে অগ্রাহ্য করে তো নয়ই, পরন্তু আত্মস্থ ক'রে, পার্থিব ও বাস্তব প্রয়োজনকে যথোচিত স্বীকৃতি জানিয়েই, তাকে অতিক্রম ক'রে গড়ে উঠেছিল।

কথাগুলি আজ এইজন্য মনে রাখতে হবে যে, এই মুহূর্তে আমরা আমাদের Material Base-টাকে এড়িয়ে গিয়ে, আমাদের Agriculture ও Industry-কে অর্ধমনস্কভাবে মৌখিক স্বীকৃতি জানিয়ে, সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে বহুজনে মিলে মাতামাতি করছি। কিন্তু আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের Material Base-কে আরো অনেক বেশি মজবুত করতে না পারলে, আমাদের সাহিত্য ও দর্শনচর্চা শক্ত ভিত্তির অভাবে জীবন-বিমুখ ও জীবন-বিরোধী হয়ে পড়বে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা Mental Culture-এর ক্ষেত্রে যে অসামান্য অগ্রগতির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন তার কারণ Material Base সম্পর্কে

তাঁরা আদৌ উদাসীন ছিলেন না। আমরা Material Base সম্বন্ধে আজ অনেকেই অজ্ঞ ও উদাসীন।

এই অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য যথাসত্বর সামগ্রিকভাবে জাতি হিসেবেই আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। বস্তুত, কাটিয়ে উঠতে না পারলে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন হবে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, মানুষের অন্তর্জীবনের উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম দিকগুলির চর্চা আমি একেবারে শিকেয় তুলে রাখতে বলছি। কারণ শুধু তাতেই তো কোনো লাভ নেই। একটার চর্চা বাদ দিলেই যে আর একটার অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতির পার্থিব, প্রত্যক্ষ, বাস্তব দিকটির অনুশীলন হু-হু করে বেড়ে যাবে, তা-ও তো নয়।

আদর্শ অবস্থা বা ব্যবস্থাটা হচ্ছে: একটা দেশে ও সমাজে যখন সমান্তরাল গতিতে আমাদের জৈবিক ও আত্মিক তৃষ্ণাগুলি নিবারণের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। সমান্তরালভাবে দুটো চালাতে পারলেই মানবস্বভাবের তথা বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি ও বিকাশ সম্ভব হয়। একটি দেশ ও জাতির পক্ষেও সেটাই আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

খুব বস্তুনিষ্ঠভাবে বলতে গেলে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। প্রাচুর্যের মধ্যে বসেও বিজ্ঞানকে চাকরের মতো খাটিয়েও ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতি চাপা কান্নায় নিরন্তর ফোঁপাচ্ছে। ঐ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবসাদগ্রস্ত, নৈরাশ্যপীড়িত, মৃত্যুতাড়িত। স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার আগেই সে আত্মহত্যা করে বসতে পারে। বলাই বাহুল্য, আত্মহত্যা করলে করবে খুবই আধুনিক ও উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই। বেঁচে যাওয়ার একটিমাত্র পথ পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সামনে খোলা আছে। প্রখর কাণ্ডজ্ঞানের (Common sense) ফলে যদি পশ্চিম আজ উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির আত্মতত্ত্বের মধ্যেই তার মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত, তা হলে ওরাই শুধু বেঁচে যাবে না, বিশ্বসংস্কৃতিও পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণামের পথে পৌঁছবে। পশ্চিম বাঁচুক। কিন্তু আমাদের আত্মবিস্মরণ ও পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণস্পৃহা আমাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। আমরা কি বাঁচবো না?

আমরা Material Base-টাকে মজবুত করবো, কিন্তু Mental Culture এর বিনিময়ে কি? Material Base-টাকে মজবুত করার জন্য পাশ্চাত্ত্য

জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে, কিন্তু সেই সাহায্য গ্রহণ ও তার প্রয়োগের বেলায় আমার দেশের ধ্যানধারণা, ঐতিহ্য, প্রবণতা—এ সব কিছুই কি ভুলে থাকবো ?

গ্রহণ করা মানে কি এলোমেলোভাবে ভিখারির মন নিয়ে, লোভীর মন নিয়ে নেওয়া ? না কি আত্মস্থ করা ? কী আত্মস্থ করা সম্ভব ? যা আমার প্রবণতার সঙ্গে মেলে। কখন আত্মস্থ করা সম্ভব ? যখন আমি বুঝি, আমি কে এবং আমি কী।

আমার মতো অনেকেই হয়তো সংশয়গ্রস্ত, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি থেকে আমরা এলোপাতাড়ি গ্রহণ করছি, প্রয়োগের মধ্যেও মোহ যতটা সক্রিয়, দূরদৃষ্টি ততটা নয়। এর ফলভোগ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলছে। এমনি চলবে কতকাল ?

দেশের ভিত মজবুত করবার জন্য কৃষি ও শিল্প উভয়কেই একযোগে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে: ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভরসার কথা, সেই চেতনা পরিকল্পকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। শিল্পসাহিত্যের কথা আলাদাভাবে নয়, একই সঙ্গে বিবেচ্য। সেই কথাটাও বলি। শিল্পসাহিত্যের পণ্ডিত ও মাতব্বরেরা প্রায়ই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলে চিৎকার জুড়ে দেন। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এখানে অক্ষরপরিচয় নেই, এমন মানুষের সংখ্যা অকল্পনীয়। শিল্পসাহিত্যের ভোক্তার সংখ্যা সারা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয়। তথাকথিত আধুনিক শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টা ও ভোক্তার সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। এঁরা পণ্ডিত অর্থাৎ তত্ত্বগত (theoretical) বিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু এঁরা দেশকে পুরোপুরি জানেন না। দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো খবর রাখেন না। এঁরা চিন্তাশীল বলে পরিচিত, কিন্তু এঁদের চিন্তার গণ্ডী খুব সংকীর্ণ। এঁদের শিল্পবুদ্ধি, সাহিত্যবুদ্ধি এবং শিল্পসাহিত্যের বিচারবুদ্ধি শুধু হাস্যকর নয়, শোচনীয় এবং ভয়ংকরও ! সেইজন্যই, আমাদের দেশের শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য-অনুকরণজাত যৌনতা ও পাপবোধকেই সর্বস্ব করে তোলার কাজে যাঁরা সচেষ্ট, তাঁদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হলেও আমাদের ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ নেই।

শিল্পসাহিত্যের মান বজায় রেখেই তাকে জীবনের আরো কাছে নিয়ে যেতে হবে। এবং জনজীবন থেকে আহরণ করতে হবে শিল্পসাহিত্যের

উপকরণ। আর জনজীবন বলতে, অভিজাত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন নিশ্চয়ই নয়। প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্যাস আমাদের সহজ উত্তরাধিকার। এতো আমাদের ছাড়লে চলবেই না। উত্তরাধিকারের বিত্ত ও বৈভব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতো বিস্ময় যে 'অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে ক্ষীয়মান লোকসংস্কৃতির শীর্ণধারার দিকেছুটে গিয়েছেন, পাশ্চাত্ত্য আবেগ অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মতো যে তার বহিরঙ্গ রূপের কাছে আত্মবিক্রয় করেন নি, এখানেই তাঁর মহত্ত্ব'—মুলকরাজ আনন্দের রবীন্দ্র-প্রতিভার এই নির্ণয় থেকে আমরা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় মূল্যবান পরামর্শ পেতে পারি।

বুদ্ধদেব, তাঁর ধর্ম, দর্শন ঃ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে

'জীবনস্মৃতি'র 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন, 'ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত'। মেডিকেল কলেজে পাঠরত একজন ছাত্র এই সময়ে তাঁদের পড়াতেন। অঘোরবাবু, এই শিক্ষকমহাশয়, তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করতেন। একদিন হঠাৎ পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটি রহস্য বের করে তিনি বললেন, আজ আমি তোমাদের বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাব। 'এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনালী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল।'—লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তার পরে একদিন অঘোরবাবু তাঁর ছাত্রদের মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। টেবিলের উপর শায়িত একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ দেখে কিশোর রবীন্দ্রনাথ তেমন বিচলিত বোধ করেন নি। 'কিন্তু মেঝের উপরে একখণ্ড পা পড়িয়া ছিল, সে-দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর এমন অসংগত যে সেই মেঝের-উপর-পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।'

এই রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথের এই মানসপ্রকৃতি মনে না রেখে রবীন্দ্রসাহিত্য-সংস্কৃতির, এক কথায়, রবীন্দ্রচিন্তার কোনো দিক নিয়েই অর্থময় আলোচনা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমগ্রতা-বোধ, সামঞ্জস্য-ব্যাকুলতা, নিরন্তর ঐক্যসন্ধান ও সহিষ্ণুতাই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সারাৎসার। পরিতাপ-জনক, এই মৌল সত্যটি রবীন্দ্রভাবনার পর্যালোচনায় প্রায়শ বিস্মৃত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পর্যালোচনাসূত্রে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।' এই রচনাধারার অন্তর্গত ঐক্যসূত্রটি উদ্ধার করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু, সুকঠিন। কেননা 'সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত, সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।'

রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ভুলে গেলে আলোচ্য প্রসঙ্গেও প্রচলিত ধারণার পুনরাবৃত্তি ছাড়া বিকল্প নাস্তি। প্রথমেই স্মরণ করা যাক, রবীন্দ্র-প্রতিভার এই অনিবারণীয় স্বভাব যে, বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত কোনো উক্তি, মত বা ধারণাকে তা প্রশ্রয় দেয় নি। স্ব-ভাবের অনুকূল ছিল না, পরিপোষক নয়, বিস্তার, ভাষ্য বা সূত্র নয়, এমন কোনো চিন্তা বা বক্তব্যকে তিনি কোনো মূল্যেই তাঁর রচনায় ও জীবনে অনুমোদন করেন নি। বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেব সম্পর্কেও রবীন্দ্র-স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

বুদ্ধবাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার সাদৃশ্য অন্বেষণে ও প্রদর্শনে ব্যস্ত সমালোচক ভুলেই যান যে, বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন সত্যকেই। অন্তত সত্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে এঁদের সাদৃশ্য বিতর্কাতীত। সত্যই যদি প্রার্থিত হয়, তা হলে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে ব্যবধান মেরুপ্রমাণ বললেই সঠিক বলা হবে।

বস্তুত, এই ব্যবধান মৌলিক। বুদ্ধদেব শুধু কি একটি নির্দিষ্ট ধর্মেরই প্রবক্তা? সংকীর্ণ ধর্মভাবুকদের কাছে তিনি হয়তো সেইভাবেই প্রতিভাত। কিন্তু সেই কি তাঁর সমগ্র পরিচয়? সেই পরিচয়ই কি তাঁর সত্য পরিচয়? সেদিন তিনি তাঁর উপলব্ধ নবধর্মের যে-পরিচয় ব্যক্ত করেছিলেন, জানি তার কেন্দ্রীয় সত্য 'দুঃখ'-ই। দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিরোধ আছে। এবং দুঃখনিরোধের উপায়ও আছে: এই চতুর্মুখ আর্যসত্য বৌদ্ধদর্শনের প্রাথমিক ও প্রধান কথা। জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ মানবজীবনে অনিবার্য। এই দুঃখ পরিত্রাণের উপায় সন্ধানেই সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগ: সাধনা। বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনে দুঃখসত্যই তাই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর জীবনে বাণীতে দুঃখের নির্মমতাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

বিশ্বজোড়া দুঃখজ্বালায় নিয়তদগ্ধ মানবের হাসি ও আনন্দ নিরর্থক—'কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জালিতে সতি'।

বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ একটি ধর্মবিশেষের প্রবক্তারূপেই দেখেন নি, এই কথাটা বৌদ্ধধর্মের ও রবীন্দ্রভাবনার প্রাথমিক ধারণা থেকেই খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বুঝতেও চেষ্টা করেছেন, তাঁর কোনো কোনো রচনা থেকে তা স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ ধর্মেরই অর্থাৎ কোনো ধর্মসম্প্রদায়েরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ও জয়গানে মুখর হন নি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই ছিল স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের তাবৎ মহাপুরুষগণের উপলব্ধ জীবন ও জীবনাতীত সত্য নিয়ে কোনো-না-কোনো সময়ে ভেবেছেন, সেই চিন্তাসমূহ তাঁর বিভিন্ন ধরণের রচনায় প্রকাশও করে গেছেন। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, কবীর, দাদূ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ অনেকেই তাঁর মুক্ত হৃদয়ের উদার শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করেছেন। তবু, রবীন্দ্রনাথ না বৌদ্ধ, না খ্রীস্টান, না অন্য বিশেষ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মসংঘের সভ্য কিংবা পূজারী। প্রচলিত লৌকিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুও না, ব্রাহ্মও নন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ, গীতা, উপনিষদ—তাঁর কোনো কোনো রচনায় সর্বাগ্রগণ্যরূপে প্রতিভাত।

তবে কি, সর্বধর্মের সারাৎসার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় কোনো ধর্ম প্রকাশ বা প্রচার করে গেছেন—তাঁর জীবনে কিংবা রচনায়?

না, এই ধারণাও সত্য নয়। অন্তত খণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথকে ধর্মগুরু সাজানোর চেষ্টা আগেও হয়েছে, এখনো মাঝে মাঝে হয়। আশঙ্কা অকারণ নয়, ভবিষ্যতের কোনো এক শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রতিমাকে দেব-প্রতিমায় উন্নীত করা হবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে যাকে 'মুক্তি' বলে, বুদ্ধের কাছে যা যাবতীয় পার্থিব ও মানবিক তৃষ্ণার মূলোৎপাটন— সেদিকে রবীন্দ্রনাথের কোনো সায় ছিল না। 'চৈতালি'র 'বৈরাগ্য' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানিয়েছেন, সংসারবিরাগী গৃহত্যাগীকে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরানুগামী বলে মনে করেন না। যে সব স্নেহ মোহ মায়া ভালোবাসার বন্ধন সংসারে আমাদের আসক্ত করে রেখেছে, তা' ঈশ্বরেরই রচনা এবং বিভিন্ন মানবসম্বন্ধবন্ধনের মধ্যেই তিনি বিরাজমান, সেই তিনি। সুতরাং সংসারে বিরাগী ভক্ত যখন শিশু ও প্রেয়সীকে চিরতরে ত্যাগ করে চলে যান, তখন :

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় ?

মানবজীবনের সারাৎসার দুঃখ। এবং তাই একান্ত সত্য। দুঃখের আগার এই সংসার অতএব পরিত্যাজ্য। বুদ্ধদেবের এই দর্শন কিন্তু রবীন্দ্র-দর্শন নয়। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তপস্যা প্রভৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই 'ক্ষণিকা'র একটি কবিতায় লঘু ভঙ্গিতে লিখেছেন :

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস, নিশ্চয়, যদি
না মেলে তপস্বিনী।

তা হলে রবীন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি'—তখন কি বৌদ্ধধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক বুদ্ধমূর্তি আপন অন্তরলোকে তিনি রচনা করে নেন ?

বস্তুত, সে কথাও সত্য নয়। বৌদ্ধধর্মের সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেন নি, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ও বুদ্ধদেবের বহু বাণী, চিন্তার, ভাবের অনেকগুলি দিকই রবীন্দ্রচেতনায় অবিরোধে মিশ্রিত হয়ে গেছে! রবীন্দ্রসংস্কৃতি সমগ্রতাপন্থী ও সামঞ্জস্যধর্মী। আমরা অনুভব করেছি, বৌদ্ধধর্ম সর্বাংশে তাঁকে অভিভূত না করলেও বুদ্ধকে যে তিনি 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি' করেছিলেন, তার কারণ, বুদ্ধজীবনের ও সাধনার ভাবাত্মক দিকটি সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রজীবনদর্শনের প্রতিকূল নয়।

বুদ্ধভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রচেতনার সমন্বয়সূত্রটিকে এককথায় বলা যেতে পারে 'প্রেম'। এই প্রেমেরই দৌত্যে বাঁধা পড়ে যান একালের বিশ্বকবি 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বুদ্ধদেবের সঙ্গে। বৌদ্ধধর্ম তাই তাঁর দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্যে 'স্বকীয়' হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই লিখেছেন : 'যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম ?'

'তবে নির্বাণই চরম ?' —রবীন্দ্রনাথের এই স্বগত-প্রশ্নের ব্যাকুলতাটুকু লক্ষণীয়।

তারপরেই তিনি ভাবেন, 'তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?'

'সে কি শূন্যতা?' —বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই চরম জিজ্ঞাসার উত্তর রচনা করেছেন তিনি নিজেই : 'যদি শূন্যতাই হতো তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছনো যেত না। তবে কেবলই সব কিছুকে অস্বীকার করতে করতে, 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে, একটার-পর-একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। 'কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা ; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।'

আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কোনো ধর্ম যত মহৎ কথাই বলুক, তা যদি জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত হয় তবে তার উপযোগিতা কী মানুষের জীবনে? রবীন্দ্রনাথ জানতেন, 'ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে বৌদ্ধধর্মকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, জীবনের প্রসারিত ক্ষেত্রেও। বৌদ্ধধর্মের 'নঙর্থক' দিকটাকেই শাস্ত্রজীবী পণ্ডিতেরা প্রধান করে, অনেকে একমাত্র করে অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দুটো দিককেই দেখতে পেয়েছিলেন : '···বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।'

'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় জানিয়েছেন, 'বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে, একদিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবল মাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে। বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।'

বুদ্ধের আসল কথাটা বুঝতে হলে তাঁর শিক্ষার যে অংশটা নেগেটিভ সে

দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যে অংশ পজিটিভ, সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি চালিত করতে হবে, এই হলো রবীন্দ্রনাথের কথা। কারণ সেখানেই অর্থাৎ সেই পজিটিভ অংশেই বুদ্ধদেবের 'আসল পরিচয়'। বুদ্ধদেব কেবল বাসনালোপের কথা বলেন নি, মৈত্রীভাবনার কথা, ভালোবাসার কথা, দয়ার কথাও বলেছেন।

বুদ্ধবাণী কি মানুষকে নিষ্ক্রিয়তার পথে চালিত করে ? রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন না। বুদ্ধ বিষয়াসক্তির ধর্ম প্রচার করেন নি মানতেই হবে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাম্রাজ্যশক্তির যে প্রভূত বিস্তার হয়েছিল, এমন আর কোনো পর্বে হয় নি। বৌদ্ধসভ্যতার মর্মবাণীতে যে আধ্যাত্মিকতা, তা'-কি মানুষকে দুর্বল করে ? তা যে নয়, তার কারণ, 'আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত। কেননা তাহা আত্মারই শক্তি ; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব।'

বৌদ্ধধর্মকেও রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন নি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় তিনি বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব, গতিপ্রকৃতি ও ভূমিকা নির্ণয় করেছেন। বেদ-উপনিষদের মর্মবাণীকে তিনি বৌদ্ধধর্মের মূল কথার সঙ্গে অন্বিত করে দেখেছেন, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই—এ কথাও রবীন্দ্রনাথ ভাবাত্মক অর্থে অস্বীকার করেছেন। বিশেষ একজন মানুষকে অসীম করে দেখা বৌদ্ধধর্মেরই প্রবর্তনা এবং যিশুকে 'ত্রাণকর্তা অবতাররূপে' স্বীকার করে নেওয়াও যে বৌদ্ধমতেরই অনুসরণে, রবীন্দ্রনাথ এই রকমই অনুমান করেছেন। বৌদ্ধধর্ম যে বৌদ্ধধর্মেই সীমাবদ্ধ ও সমাপ্ত নয় অর্থাৎ তা যে নির্বীজ নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বৌদ্ধধর্মের এই অবতারবাদ, এই ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে, এইরূপ আমার বিশ্বাস।' ভারতবর্ষের চিত্তভূমি থেকেই আহরণ করে বুদ্ধ একদিন জ্ঞান ও প্রেমের দুটি ধারাকে মিলিত করেছেন। এই মহৎ মিলনের অসামান্য শক্তি বিশ্বপ্লাবী হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা একেবারে হারিয়ে যেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, বৌদ্ধযুগের পর থেকে দর্শনে পুরাণে সাহিত্যে বিভিন্ন বিচিত্র বিমিশ্ররূপে সেই ধারা আজ পর্যন্ত প্রবাহিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের আংশিক সাদৃশ্যের দিকটি ধরিয়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না, বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্মকে সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্মের পুষ্টি সাধন করেছে : এই হলো রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

সুফি ধর্ম ও পরে বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের গুরুবাদ ও অবতারবাদকে অনুভব করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি অতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের কোনো চিরস্থির চিরনির্দিষ্ট রূপ স্বীকার করে নিতে পারেন নি। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি আস্থা ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মের 'সচলতার' দিকটিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু 'সচলতা'র প্রতিই নয়, 'সমগ্রতা'র প্রতিও বটে। সেইজন্যই হীনযান ও মহাযান—এর একটিকেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে 'পূর্ণ' বৌদ্ধধর্মরূপে স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ব্যাপকভাবে প্রেরণালব্ধ উপাদানরূপে ব্যবহৃত এবং রবীন্দ্রসংস্কৃতিতেও যেভাবে গৃহীত ও অভিনন্দিত, তা গতানুগতিক নয়, তার মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তার মহিমা ও গভীরতা অনুভব করা যাবে না। বৌদ্ধসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্ররূপে বিরাজিত প্রধান যে নীতিগুলি অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লক্ষ্য করেছেন, সেগুলি হলো : অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বুদ্ধও চেয়েছিলেন, 'আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।' —কী সেই স্বরূপ ? রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সেটুকু জেনে নিতে পারলে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী ভাবে দেখেছিলেন, নিজের জীবনে লাভ করেছিলেন, তার হদিশ পাওয়া যাবে :

'শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

আগেই বলেছি, বুদ্ধদেব যে মুক্তির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা নঙর্থক নয়, সদর্থক। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যন্ত্রণার দিনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, মনুষ্যত্বের 'জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এলো : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

মনুষ্যত্বের বিশ্বব্যাপী লাঞ্ছনার অবসান আজও হয় নি, বরং ভিতরের ও বাইরের প্রতিদিনের প্রহারে মনুষ্যত্ব আজ সর্বাধিক বিপর্যস্ত। আজ যদি সত্যই এই উচ্চারণ সম্ভব হতো : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !

মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা

চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ও ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটির এক স্থানে প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিতেন। সেই-সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত পূর্বতন এণ্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিন ভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ও বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক রচনার মতোই তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটিও নানা দিক থেকে স্মরণীয়, সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের এই পর্যালোচনা বহুলাংশে তথ্যভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু, এই তথ্যটি বিস্মৃত হওয়াও অনুচিত যে, রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য বিশ্লেষণের প্রায় বত্রিশ বছর আগে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে প্রিয়তম সাহিত্যবন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৪১৮-১৯ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থে উদ্ধৃত পঞ্চত্রিংশ পত্র] Michael M. S. Dutt. লিখেছিলেন :

"You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality ; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read !"

সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে যে-মধুসূদনকে রবীন্দ্রনাথ যথোচিতভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, তাঁরই একটি স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ সাহিত্যচিন্তাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণসহ উত্তর-তিরিশ রবীন্দ্রনাথের রচনায় উপস্থাপিত হতে দেখছি। প্রভাব কি প্রেরণার কথা ঠিক এই প্রসঙ্গে অবান্তর। শুধু লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় আছে অতীতের বিশ্লেষণ, যা তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য; আর মধুসূদন সমকালীন সাহিত্যভাবনার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন বস্তুত একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে বিস্তৃত করতে পেরেছেন দীর্ঘায়তন প্রবন্ধে, মধুসূদন কয়েক ছত্রবিশিষ্ট একটি চিঠিতে বিষয়টিকে প্রসারিত করার সুযোগ পান নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বাঙালী পাঠকসাধারণের মধ্যে নানা কারণে সুপরিচিত, আর মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত চিঠিখানির বাক্যটি বাঙালী-সমালোচকের উদাসীনতায় বিস্মৃতপ্রায়।

তা' না-হ'লে কবি মধুসূদন, নাট্যকার মধুসূদন এবং মধুসূদনের জীবন-নাট্য নিয়ে নাটকীয় ও ভাবালু সমালোচনার পরিবর্তে আমরা এতদিনে মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা অথবা সাহিত্যতত্ত্বে মধুসূদন ধরনের কিছু বিশ্লেষণমূলক ও ভাবগম্ভীর রচনাও হয়তো পেতাম। মধুসূদন ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অবলম্বনে উল্লেখযোগ্য আলোচনা অবশ্যই হয়েছে। এবং সেই আলোচনাসূত্রে মধুসূদনের পত্রাবলীর অবধারিত ব্যবহার নিশ্চয়ই দেখা গেছে। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন, অন্তর্জীবন ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে তাঁর পত্রাবলীর গুরুত্ব বিশিষ্ট আচার্যবৃন্দ অবশ্যই বিস্মৃত হন নি। কিন্তু মধুসূদনেব সাহিত্যচিন্তা বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মধুসূদনের অক্লান্ত আগ্রহের পরিচয় আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পেরেছে কী-না, এই গভীর সংশয় থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির অবতারণা!

যাঁরা সাহিত্যস্রষ্টা, তাঁরা অনেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য-সমালোচনায়

অবতীর্ণ হন না। এটা ত্রুটি বা গুণের কথা অবশ্যই নয়, এ হ'লো যা' সাধারণত হয়ে থাকে, তারই বিবৃতিমাত্র।

কিন্তু হাতে-কলমে সমালোচনায় ব্রতী হ'ন বা না-হ'ন, সকল বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টাই প্রাথমিকভাবেই সাহিত্য-সমালোচকও! যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করেন অন্তরের তাগিদে, সাহিত্যের 'ফর্ম' ও 'কন্‌টেন্ট' অর্থাৎ প্রকরণ ও বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের ভাবতেই হয়। শুধু কি, তাই? সৃজন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও ক্রমশই তাঁদের হয়ে উঠতে হয় প্রশ্নমনস্ক, নিজের কাছেই তুলে ধরতে হয় নিজের জিজ্ঞাসা, নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয় সন্তোষজনক উত্তর, হাত লাগাতে হয় কাজে, সৃষ্টি করতে হয় ফসল।

নিছক পাঠক-সমালোচক ফসল নিয়েই ব্যস্ত, তার গুণাগুণ নিয়ে মতামত প্রকাশে উৎসুক, যোগ্যতা যার যেমনই থাক্! কিন্তু অভিজ্ঞতার কোন্ সূত্র উপলব্ধির কোন্ উদ্যানে শ্রম ও নিষ্ঠার কী প্রকৃতির সেচনে-বীজনে কোন্ প্রক্রিয়ায় সরস, সতেজ, পুষ্ট পরিণামে গিয়ে পৌঁছোয়, সেই বিচিত্র রহস্যের স্বরূপ-সংবাদ ক'জন আর জানতে চান, জানতে পারেন?

রস-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হ'য়ে আরো একটি বিষয়ের সন্ধান অনিবার্য হ'য়ে ওঠে রসজ্ঞ সমালোচকের কাছে। তা' হ'লো, স্রষ্টা তাঁর একটি বিশেষ সৃষ্টিকর্মে কী করতে চেয়েছিলেন, কী ভেবে ও কী ভাবে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, দেশ-কাল-পাঠকসমাজের গ্রহণের ক্ষমতা-অক্ষমতা তাঁকে কতখানি এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিল। এক কথায়, স্রষ্টার নৈপুণ্য বা ভাবনা-ধারণার অভাবই তো শুধু রচনার বিষয় ও প্রকরণকে ত্রুটিপূর্ণ ও পঙ্গু করে তোলে না, পরিবেশের দায়-দায়িত্বও যে অনেকখানি!

কিন্তু একটা তৈরি রচনা, প্রস্তুত সামগ্রী থেকে রচনাপ্রক্রিয়ার এ-সব সংবাদ কি পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব? কিছু ইঙ্গিত-ইশারা অবশ্যই থেকে যেতে পারে, থেকেও যায়, কিন্তু সব লেখাতেই সমানভাবে তা-ও প্রতিফলিত হতে পারে না, হয় না। তবে, সৃষ্টিরহস্যসন্ধানী কবি বা লেখক, যখন নিজেকে, নিজের সৃজনপ্রক্রিয়াকেই ক'রে তোলেন তাঁর রচনার বিষয়, সেই রচনার বিষয়ঃ যা' সমালোচনা নয়, সৃষ্টিই; তখন, সেই জাতের লেখায় কিছু স্পষ্টভাবেই গাঁথা হ'য়ে যায়, সাহিত্য আর সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে কবি বা লেখকের সংশয়, বিশ্বাস, বিচার, যন্ত্রণা, উচ্চাশা তথা কাব্য বা সাহিত্যাদর্শের বিবিধ সন্ধান ও সংবাদ।

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অর্থাৎ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ধ'রে আমাদের সৃজনমূলক সাহিত্যের মুখ্য পুরুষ তিন জন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র : এই দু'জনকেই নিঃসংশয়ে এই ত্রয়ীর প্রথম দু'জন রূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আবির্ভাবের পূর্বেই মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

মধুসূদনের সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তা আলোচনা করার সময় এই তথ্যটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে, মাতৃভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যকর্ম বা সাহিত্যিকের পক্ষে মধুসূদনকে তাঁর বৈপ্লবিক উদ্যমে কণামাত্র সাহায্য করা সম্ভবই ছিল না। কারণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ মধুসূদন স্বয়ং! বঙ্কিমচন্দ্রের রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম বাংলা গদ্যে সীমাবদ্ধ। আর সে-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ততঃ এটুকু সুযোগ ছিল যে, বিদ্যাসাগর-প্যারীচাঁদ-হুতোমের পরীক্ষা ও প্রয়াসকে তিনি ভালোভাবেই যাচাই-বাছাই ক'রে নিতে পেরেছিলেন। আর, রবীন্দ্রনাথ? তিনি কবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলালের কাছে ঋণের কথা সঙ্গতভাবেই স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু মধুসূদনের কাব্যসাধনা, অন্তত কাব্যশিল্পের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট প্রাণিত করেছে বলে এই লেখকের বিশ্বাস। তবে তা স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত বিশ্লেষণসাপেক্ষ, অন্য একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে। আখ্যান-রচনায় ও গদ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার কথা মুক্তকণ্ঠে লিখে গেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের বৈপ্লবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ কিছু সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেছেন বটে, কিন্তু সে-সব কথা ততটা প্রকাশ্যে ও বিস্তৃত-ভাবে বলেন নি। আর অন্যপক্ষে, পরিণত বয়সে কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথই কেন, জানি না, যথোচিত সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ করেন নি!

মোট কথা এই যে, নানা কারণে, সব দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন নিঃসঙ্গ; একক মহিমায় দীপ্যমান! সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রেও তা-ই!

এই প্রবন্ধের কোনো সতর্ক, তীক্ষ্ণধী পাঠকের প্রতিবাদস্পৃহা এই মুহূর্তেই জাগ্রত হ'তে পারে এই সুবাদে যে মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও সাহিত্য-পুরুষদের কাছে না-পেলেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার অবারিত ছিল এই কবির কাছে, মধুসূদনের কাছে। তা তো ছিলোই! কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দরোজা তাঁকে নিজের হাতে খুলে নিতে হয়েছিল, নিজেরই তাগিদে, নিজের অন্তর-পুরুষের নিয়ত-তর্জনী-সংকেতে!

মধুসূদনের কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক ভক্তিভরে বা উপেক্ষাভরে তাঁর সাহিত্যকর্মে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যত প্রভাবই নির্ণয় করুন না কেন, নিছক প্রভাব অর্থাৎ প্রেরণাহীন, অন্তঃসারশূন্য অনুকরণস্পৃহা থেকে কারো সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব প্রস্তুত হতে পারে না! পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসভাণ্ডার মধুসূদনের কাছে স্বয়ংবর সভার মতোই! লক্ষণীয়, তাঁর বরমাল্য বিন্যস্ত হয়েছে কোথায়? সংস্কৃতসাহিত্যেও মধুসূদনের ব্যুৎপত্তির কথা সকলেরই জানা। এদিকে বাল্মীকি, কালিদাস প্রমুখ ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষবৃন্দ আর ওদিকে হোমার-ভার্জিল-দান্তে-ট্যাসো-মিলটন-শেক্‌স্‌পীয়র, কেই-বা অপরিচিত ছিলেন মধুসূনের কাছে? কিন্তু এঁদের কারো সাহিত্যাদর্শই কি মধুসূদন নির্ভাবনায় অনুসরণ করেছেন ধারাবাহিকভাবে? নিশ্চয়ই নয়!

মধুসূদনের কাব্যে-নাটকে কথায়-কথায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকবৃন্দের প্রভাব ইত্যাদি অনুসন্ধানে আমরা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-গবেষক-শিক্ষকগণ অনেকেই অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাই। কিন্তু 'প্রভাব' থেকে তো সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব জাত ও প্রতিষ্ঠিত হয় না, প্রতিভার স্বরূপ-নির্ণয়ে যা অত্যাবশ্যক, তা-হলো প্রেরণা-অংশটুকু! আর-কিছুই নয়, অন্য-কিছুই নয়। মধুসূদনের সাহিত্যে বা সাহিত্যচিন্তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য কোনো প্রভাবই বিদ্যমান নয়, এ কথা কেউ বলবেন না। কিন্তু সেই 'প্রভাব'-অংশগুলি, যা' কবি আত্মস্থ করতে পারলেন না, অথচ ব্যবহার করলেন, তা' প্রকৃত সমালোচকের কাছে—'এহো বাহ্য: আগে কহ আর!'

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক আর তাঁদের প্রভাবে গড়ে-ওঠা সমালোচনার স্কুল মধুসূদনের 'ত্রিশঙ্কু'-দশা কল্পনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের কোনো পূর্বাপর ধারা তাঁরা খুঁজে পান না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে মধুসূদন এঁদের বিচারে একটি প্রক্ষিপ্ত ও এমন-কি উপেক্ষনীয় অধ্যায়! এই জাতীয় প্রস্তাব বিবেচনারও অযোগ্য আর এই সব ইতিহাস ও রসবোধবর্জিত মন্তব্য ও ধারণার প্রতিবাদও হয়েছে যথেষ্ট। এ-নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, মধুসূদনের নিঃসঙ্গতা তাঁর মহিমায়, বৈপ্লবিক স্বভাবে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে মধুসূদনের সম্যক পরিচয় ছিল, কিন্তু একটু আগেই যা বলা হয়েছে: 'মাতৃভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যকর্ম বা সাহিত্যিকের পক্ষে মধুসূদনকে তাঁর বৈপ্লবিক উদ্যমে কণামাত্র সাহায্য করা সম্ভবই ছিল না!' মধুসূদনের

সমগ্র সাহিত্যকর্ম, বিশেষত চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করলে স্বীকার করতেই হয় বাংলা সাহিত্যের কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি ও গ্রন্থকারগণ সম্বন্ধে তাঁর যথোচিত ধারণা ছিল।

নানাভাষায় সুপণ্ডিত ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পরিশ্রমী পাঠকরূপেই শুধু মধুসূদনকে দেখলে চলবে না, মনে রাখতেই হবে তাঁর অপরিমেয় অসামান্য সাহিত্যপ্রেমের কথা! রাজনারায়ণকে ১৪.৭.১৮৬০. তারিখে লেখা একটি চিঠিতে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬৭ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] লিখেছেন মরমী ভাষায়:

"There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghnad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto!"

স্থূল বিচারে মধুসূদনের সাহিত্যরচনার কাল স্বল্প হলেও তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব, গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা মনে রাখতে হবে। তাঁর সাধনায় কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল, এমন কল্পনা করাও বাংলা সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হবে।

মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তার পরিচয় তাঁর সাহিত্যে ও পত্রাবলীতে ইতস্তত: বিকীর্ণ হয়ে আছে। নিজের সাহিত্য-সাধনা বিষয়ে তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও দ্বিধার সহাবস্থান আমাদের বিস্মিত করতে পারে। কিন্তু নিজের সাধনার লক্ষ্য ও তার দুরূহতা সম্বন্ধে সচেতনতাই যুগপৎ এই প্রত্যয় ও দ্বিধার কারণ।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতেই তিনি 'a tremendous literary rebel' রূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন আর সেই সঙ্গেই জানিয়েছেন, তাঁর প্রয়োজন বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতি, উৎসাহ, শুশ্রূষা! মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে তাঁর এই চিঠিতে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬৭-৬৯ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] লিখেছেন—

"I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendons literary rebel, demands the

consolation and the encouraging sympathy of friendship."

মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তার, মাতৃভাষায় প্রতিষ্ঠিত পূর্বসূরীগণের কবিকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণার এবং নিজের কাব্যসাধনার লক্ষ্য সম্বন্ধে আরও কিছু ধারণা পাই ঐ চিঠিরই পরবর্তী অংশটিতে—

"I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as imposters, and unworthy of the honours heaped upon them ! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghnad destitute of merit, why ! I shall burn it without a sigh of regret."

কাজেই, মধুসূদন জানতেন সুদূর তাঁর লক্ষ্য, দুর্লভ তাঁর প্রার্থিত সাম্রাজ্য অথচ পূর্ববর্তী বাঙালী কবিদের কাছে এ-বিষয়ে সহায়তালাভের কোনো সম্ভাবনাই তাঁর নেই। প্রত্যেকটি রচনাই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ, রচনাই তো নয়, সোপান যেন, 'যশের মন্দির'-এ পৌছনো কি সহজ? পরবর্তী-কালে 'যশের মন্দির' সম্বন্ধে তাঁর যে-ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ঐ নামেরই একটি চতুর্দশপদী কবিতায়, তাতেই বুঝতে পারি, কাব্যরচনা মধুসূদনের কাছে সাধনারই নামান্তর ছিল—

'সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে !'

এই 'সুবর্ণ দেউল' যে 'অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে' অবস্থিত তা-ও যেমন কবির অজানা ছিল না, তেমনই কবি এ-কথাও জানতেন যে, কাব্যলক্ষ্মী ভারতীর প্রেরণা ছাড়া '…ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?' এবং ঐ মন্দিরে যে পৌছতে পারে, সুদুর্লভ অমরত্বই তার পুরস্কার !

মধুসূদন মানেই একটি মত্ত ব্যক্তি : এই রকমই আমাদের ধারণা। কল্পনার রাশ শিথিল করে ভাবতে হয়তো অনেকের ভালো লাগে, মদ্যপানরত কবি লিখে চলেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। কিন্তু কাব্যরচনা সম্বন্ধে মধুসূদনের মনোভাব ছিল পূজারীসুলভ! কবিখ্যাতি যেমন 'অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ-শির'-স্থ সোনার দেউল, তেমনই কবিকেও তো হতে হবে পূজারীর মতো একাগ্র! তাই কবি লেখেন [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬৯ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] মদ্যপানে তাঁর আসক্তি যতই থাক্‌, "…I never drink when engaged in writing

poetry ; for, if I do, I can never manage to put two ideas together !"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় মেঘদূত কাব্যখানির গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন কবিতায় ও নানা গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ বারবার মেঘদূত প্রসঙ্গ উত্থাপন ও এই কাব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেন। মেঘদূত কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু খুঁজে পেয়েছেন, তার কতটা মূল কাব্যে ছিল, কতখানিই বা রবীন্দ্র-কবিমানসে তা নিয়ে হয়তো বিতর্ক অসম্ভব নয়। মধুসূদন অবশ্য তাঁর বিভিন্ন রচনায় কালিদাস ও তাঁর অন্যান্য কাব্যের মতোই মেঘদূত-এর বিবিধ অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন বারবার। মধুসূদনের সাহিত্য-পাঠকের কাছে সে সব অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তা থেকেই অর্থাৎ এই পরোক্ষ সাক্ষ্য থেকেই মধুসূদনের কালিদাসপ্রীতি ও মেঘদূতপ্রীতির কথা জানা যায়, তবে সাহিত্যবন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একই চিঠিতে স্পষ্টই দেখছি, মেঘদূত তাঁর কতটা প্রিয় গ্রন্থ ছিল—

"I do not know your friend Debendra Nath Tagore personally. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta."

আর একটি চিঠি [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৭০ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] পড়লে প্রায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়, মূলত কালিদাসপ্রীতিই তাঁর সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার কারণ। মধুসূদন লিখেছেন : "...did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras ? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me."

সংস্কৃতসাহিত্য, বিশেষত, বাল্মীকি ও কালিদাস সম্বন্ধে মধুসূদনের সশ্রদ্ধ অনুরাগ ছিল অকুণ্ঠিত। সাহিত্যসৃষ্টির সূচনায় সংস্কৃতনবিশের সহযোগিতাও তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু সে সহযোগিতা শুধু ব্যাকরণনির্ভর! তার বাইরে তিনি সংস্কৃতনবিশদের অর্থাৎ "old school"-এর কিছুমাত্র দাপট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং রামনারায়ণের সহযোগিতা নিতে গিয়ে এই "old school' সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। তিনি নতুন কিছু,

মৌলিক কিছু করতে যাচ্ছিলেন, এ-বিষয়ে অর্থাৎ তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন, তাই কারো সাহিত্যিক খবরদারি মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। এই সূত্রে গৌরদাস বসাককে লেখা তাঁর একটি পত্রাংশ [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৯২ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] উল্লেখযোগ্য—

"Ram Narayan's 'version' as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayan to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any."

চিঠিটির পরবর্তী অংশ থেকেই মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বেরিয়ে আসে, যা চিরকালীন সাহিত্যাদর্শের মূল কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধুসূদন অতঃপর লিখেছেন—

"You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections."

সন্দেহ করি, মধুসূদনের নাটকে যে, "cold prose" রসসৃষ্টির পক্ষে মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা রচনা করেছে, তার মূলে রামনারায়ণের 'সংশোধন'-এর ভূমিকা বড়ো কম নয়। তাঁর নাটকে "cold prose"-এর অবতারণার জন্য এই চিঠিতেই মধুসূদন রামনারায়ণকে সরাসরি দায়ী করে গেছেন।

আর তাঁর সাহিত্যকর্মে পাশ্চাত্ত্য-আবহ যে অক্ষম অনুকারকের আরোপিত ভার নয়, তা যে মধুসূদনের স্বেচ্ছাকৃত, সুচিন্তিত সাহিত্যাদর্শপ্রসূত, এর সুবিধা-অসুবিধা অথচ নবযুগের বাংলা সাহিত্যসৃষ্টিতে এর উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি যে কত সচেতন, দেশ-বিদেশের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই পাশ্চাত্ত্য ধরন মাতৃভাষায় আনয়ন যে তিনি কর্তব্য বলেই মনে করেছিলেন, তা একই চিঠির অপর অংশ থেকে প্রতিভাত হয়। মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তার পরিচয় বিধৃত থাকায় দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে অপরিহার্য—

"I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama ;

but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism ? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forget for us by a servile admiration of everything Sanskrit......In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.......I promise you a play that will astonish the old rescals in the shape of Pandits.......I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the thing."

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের শেষার্ধে লেখা এই পত্রাংশের মূল বক্তব্যের সঙ্গে প্রায় পঁচাত্তর বছর পরে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এক স্মরণীয় পুরুষের লেখা একটি স্মরণীয় ও সুপরিচিত প্রবন্ধের [কালান্তর : কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ] অংশবিশেষ তুলনীয় —

'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্মবিচারে চুনে চুনে, অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে, আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত

করে নিপুণ ভঙ্গিতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে,উদবেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।'

বলাই বাহুল্য, লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধটি 'কালান্তর' গ্রন্থের নাম-রচনা! ভাষা আলাদা, ভঙ্গিও তাই, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনও যথেষ্ট পরিণত বয়সে, কিন্তু মর্মার্থ বিচারে, এমনকি ভাষাগত তীব্রতার দিক দিয়েও মধুসূদনের পত্রাংশ ও তার পঁচাত্তর বছর পরে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রচনাংশের সাদৃশ্য ও সাধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ! অথচ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক তথা নবযুগের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব-অন্বেষণে-ব্যস্ত কোনো-কোনো সমালোচকের যে 'খোঁটা' দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, সেই খোঁটা তো সবচেয়ে বেশি জুটেছিল মধুসূদনেরই ভাগ্যে, এতকাল পরেও তা থেকে মধুসূদন নিষ্কৃতি পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

যাই হোক্, পর-পর দুটি নির্বাচিত দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়েছে। আমি দেখাতে চেয়েছি, মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা পঁচাত্তর বছর পরেও রবীন্দ্র-রচনাতেও প্রতিফলিত হতে পেরেছে আর আজ, তারও চল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ যদি গ্রহণযোগ্য হয়; তা-হলে স্বীকার করতেই হবে মধুসূদনের, একশো যোল বছর আগের সাহিত্যচিন্তার মধ্যে চিরকালীন সাহিত্যাদর্শের একাধিক মূল সূত্র গ্রথিত হয়ে আছে এবং সে-দিকে দৃষ্টিপাত, বিলম্বে হলেও, আমাদের অবশ্যকর্তব্যরূপে বিবেচিত হওয়া দরকার। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই আধুনিক সাহিত্যচিন্তা দেশ-কাল-এর যে পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন করেছিলেন, তার মৌলিকতা বিস্ময়কর! ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে-স্পষ্টভাষণ করতে পারেন, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ব্যক্তিগত পত্রে হলেও সেই বৈপ্লবিক সাহিত্যচিন্তাকে নির্ভীকভাবে, দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করা, মধুসূদনের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহিত্যপুরুষের পক্ষেও খুবই উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে আমরা মনে করি।

কিন্তু মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা কেবল তীক্ষ্ণ, তীব্র, বিস্ফোরক উক্তি ও মন্তব্য

সমূহের মধ্যেই নিহিত নয়। এমন-কি বেপরোয়া দুঃসাহস রূপেই তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে দেখা ও দেখানো নিতান্তই ভুল হবে।

মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন-নাট্য তাঁর সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বিচারের পক্ষেও যেমন বাধা সৃষ্টি করে থাকে অর্থাৎ মধুসূদনের সাহিত্য সমালোচনা করতে বসেও বাষ্পাচ্ছন্ন বিহ্বলতায় আক্রান্ত হন অনেকে, ঠিক তেমনই মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তাকে কেবল 'বৈপ্লবিক'রূপে চিহ্নিত করলে মধুসূদনের বহিরঙ্গ জীবনের সঙ্গে তা বেশ মানানসই হলেও, মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ তাতে প্রতিভাত হবে না।

মধুসূদনের সাহিত্যসৃষ্টি যখন নিন্দিত হয়েছে, তা-ও যেমন অনেকাংশে ভুলভাবে, তেমনি স্রষ্টা মধুসূদন বারবার ভুলভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পক্ষে কোনোটাই স্বাস্থ্যকর হয় নি। 'বিদ্রোহী' 'বিপ্লবী' শব্দগুলি সম্বন্ধে পাঠকগণের একটা দূরত্বজনিত সম্ভ্রম মিশ্রিত আছে।

আমার ধারণা, এই জাতীয় বিশেষণ-ব্যবহারের দ্বারা মধুসূদনের সাহিত্য কীর্তি ও সাহিত্যচিন্তাকে সঠিকভাবে চেনানো যাবে না। এই প্রবন্ধের এক স্থলে আমি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মধুসূদনের "...I never drink when engaged in writing poetry..." উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি।

ব্যক্তিজীবনে মধুসূদন অনেক ঐতিহ্যবিরোধী কাজ করেছেন, অনেক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন; সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও তাই; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যিক মধুসূদনের মধ্যে কোনো যুক্তিহীন উদ্দামতা ছিল না। কোনো স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার অভ্যাস ও ভীরুতাও তাঁর ছিল না। মনে রাখতে হবে, একই সঙ্গে তিনি রচনা করেন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা'—'old school' এর বর্বরতা আর 'New school' এর উঞ্ছবৃত্তি — দুই'ই তাঁর শাণিত বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলরূপে নির্বাচিত হয়।

আর ঠিক সেই কারণেই 'foreign air' তাঁর রচনায় যেমন অনিমন্ত্রিত অতিথিমাত্র নয়, তেমনই স্বদেশ-স্বকালের পরিপ্রেক্ষিত ভুলে নূতনত্বের নামে কোনো উদ্ভট ভাবধারা তাঁর রচনায় প্রশ্রয় পায় না। তাঁর সাহিত্যিক মনের ভারসাম্য সহসা বিচলিত হয় না। যখন ঘোষণা করেন, "In matters literary...I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes." তখনই একই নিঃশ্বাসে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৯৩ : 'মাইকেল

মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] উচ্চারণ করেন, "I may borrow a neck-tie,or even a waist-coat, but not the whole suit !"

"borrow" শব্দটির অর্থ এই মুহূর্তে প্রসারিত করে দেখলে ক্ষতি নেই ! প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌ই হ'ন, আর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যভাণ্ডারই হোক্‌, কোনো সূত্র থেকেই 'whole suit' ধার করা মধুসূদনের মতো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের কাছে রুচিকর হওয়ার কথা নয়। মধুসূদনের স্রষ্টা-মানসের পক্ষে যা অনুকূল নয়, বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা মানায় না, তা' তিনি কোনো সূত্র থেকেই গ্রহণ করতে চান নি। যেমন তিনি দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬২ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] করেন :

"I am of opinion that our dramas should be in Blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre."

তেমনই তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা কৃষ্ণকুমারী নাটক-বিচার প্রসঙ্গে যখন আরো একটু শেকস্‌পীরীয় ধরন দাবি করে বসেন, এবং মনে রাখতে হবে, শেকস্‌পীয়রের প্রতি মধুসূদনের নিজেরই ছিল গভীর অনুরাগ ; তখন মধুসূদন খুব স্পষ্ট ভাষায় [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩৮০ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়ে দেন :

"I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by

the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will."

অর্থাৎ 'সাহিত্য-দর্পণ'-এর বিশ্বনাথ-প্রদত্ত বাঁধা বরাদ্দে যেমন মধুসূদন তৃপ্ত হতে পারেন না, তেমনই আবার পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যতই প্রগাঢ় হোক্ তাঁর প্রীতি, যতই গভীর হোক্ তাঁর শেকস্‌পীয়র প্রীতি : কোনো কিছুকেই তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চান না ; নিজের দেশ-কাল-সমাজের চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে মধুসূদন উদাসীন হতে পারেন না। স্বদেশের সামাজিক বিন্যাস ও নৈতিক বিশ্বাসকে পরিহার করে সাহিত্যে গড়ে তুলতে চান না কোনো কৃত্রিম আয়োজন।

এবং শেষ পর্যন্ত ফিরে আসেন অন্তরের কবি-পুরুষটির কাছে ! কেননা, মধুসূদন সাহিত্যে প্রেরণাবাদকেও অস্বীকার করেন না। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ এপ্রিলে রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬০ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] জানিয়েছেন, কিছুটা কৈফিয়তের সুরে—

"I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration."

মধুসূদনের সাহিত্যে, পত্রাবলীতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের তাৎক্ষণিক দাবি ও আকাঙ্ক্ষাপূরণের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন নি। তাঁর দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। নিজের প্রায় সব লেখা সম্বন্ধেই কোনো-না-কোনো চিঠিতে অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। প্রায় প্রত্যেকটি রচনা সম্বন্ধে শিক্ষানবিশের বিনয়ও দেখা গেছে। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রসঙ্গেই পূর্বোক্ত চিঠিতে জানিয়েছেন—

"Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You on doubt

excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius".

ঐ একই চিঠির পরবর্তী অংশে মধুসূদনের আত্মবিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্য-চিন্তাকেই পরিস্ফুট করে—

"The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I don't trouble my readers with vira ras বীররস. Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist".

পূর্বতন ও সমকালের কবি ও কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদনের ধারণার কিছু পরিচয় চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ও তাঁর পত্রাবলীতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মোহমুক্ত বিচারশক্তি উল্লেখযোগ্য :

'আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে' ;
[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : চতুর্দশপদী কবিতাবলী]

আবার,

'স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?
[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : চতুর্দশপদী কবিতাবলী]

ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন জনপ্রিয়তা ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই জনপ্রিয়তার

অবসান—দুটি সত্যই সমভাবে স্বীকৃত হয়েছে মধুসূদনের কবিতায়। সমকালীন কবির কবিতাকর্মের মূল্যায়ন করতে হলে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। কবিবন্ধু রঙ্গলালের বিষয়ে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই-এ রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬৬ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] প্রকাশিত মধুসূদনের অভিমতের সঙ্গে কোনো আধুনিক সমালোচক ভিন্নমত হবেন বলে মনে হয় না। রঙ্গলালের কবিশক্তির সীমাবদ্ধতা মধুসূদন সঠিকভাবেই নির্ণয় করেছিলেন—

"He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he could travel further. He would then find that "hills peep o'er hills—what 'Alps on' 'Alps arise' !"

এই চিঠিতেই মধুসূদনের আরাধ্য 'কবিকুলগুরু'গণের পরিচয় পাই। তাঁর কবিমানস ও কাব্যরুচিগঠনে এঁদের প্রেরণাই সর্বাধিক বলে মনে করা যায়—

"As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him."

মধুসূদনের সময় ছাড়িয়ে আমরা আজ সময়েরই বিচারে কত দূরবর্তী। তবু, আমাদের সাহিত্যবিচার আজো বিবিধ সংস্কারের দ্বারা ক্লিষ্ট, বিড়ম্বিত, বিভ্রান্ত। মধুসূদনের সময়ে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল, যা এখনও আছে, বোধ হয় সাম্প্রদায়িকতা। সব দিক থেকে আস্থাভাজন বন্ধু রাজনারায়ণকেও এ-দিক থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন মধুসূদন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ আগস্ট লেখা [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩৯১ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'] একটি চিঠিতে :

"I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man ! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias."

মধুসূদনের সংস্কারমুক্ত উদার কাব্যরুচির পরিচয় উদ্ধৃত অংশটিতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আরো অনেক কথা বলা যায়, মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা-প্রসঙ্গে। কিন্তু এই প্রবন্ধটিতে আমরা তথ্যচয়নে তেমন উৎসুক ছিলাম না, আগ্রহ ছিল না বহু-উদ্ধৃত উক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসে। যদিও বহু-উদ্ধৃত দু'একটি মন্তব্য অপরিহার্য বিবেচনায় ব্যবহার করতেই হয়েছে।

সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে মধুসূদনের দূরদৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কিছুমাত্র ন্যূন নয়। বরং কোনো কোনো দিক দিয়ে অধিকতর স্পষ্ট, ঋজু, নির্ভীক ও সংহত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনামূলক প্রবন্ধগুলি অতিপল্লবিত, অনেকাংশে অগোছালো, পুনরুক্তিমূলক।

আর কোনো কোনো দিক দিয়ে মধুসূদন যা' চেয়েছিলেন, যা' বলেছিলেন, এতদিন পরেও সেগুলি সমভাবে আমাদের নাড়া দেয়। 'Blank verse' সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা' আরও প্রসার লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেকালে নবসৃষ্ট এই ছন্দ পাঠকসমাজ সহজে গ্রহণ করতে পারেন নি, দীক্ষিত পাঠকরাও নন। মধুসূদন রাজনারায়ণকে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬৫-৬৬ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ] জানিয়েছেন—

"The fact is, my dear fellow, that the prevalence of blank-Verse in this country, is simply a question of time··· My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is."

কিন্তু Blank-verse-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে স্মরণীয় উক্তি [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩৭৪ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ] বোধ হয় এটাই যে, "Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Singh used to say, when looking at the map of India—"Sub lal ho jaga," I say "Sub Blank verse ho jaga".

কবি কে? —যে-কোনো কবি-কবিতাপাঠক ও কবিতা-সমালোচকের কাছে এ-প্রশ্ন সারাজীবনে অন্তত একবার দেখা দেয়। মধুসূদনের মতো কবি ও সাহিত্য-ভাবুকের কাছে এ-প্রশ্ন বার বার দেখা দিয়েছে বলে মনে করা যায়। তার উত্তর একটি চতুর্দশপদী কবিতায় ['কবি'] মধুসূদনই দিয়ে গেছেন :

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

কবির একখানি পত্র

বিহারীলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রচিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানালেন, '…বর্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল…' এবং পরবর্তী বাক্যেই বিহারীলালকে সরাসরি 'আমার সেই কাব্যগুরু' বলে অভিহিত করলেন। তার পর বিগত আশি বছর ধরে বিহারীলাল ও তাঁর কাব্য নিয়ে যিনি যখনই কিছু আলোচনা করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই সমগ্রত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি এবং বিশেষত 'আমার সেই কাব্যগুরু' প্রভৃতি অংশটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তা করেছেন।

বিহারীলাল যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর কাব্যকবিতা নিয়ে বিশেষ কোনো আলোড়ন-আলোচনা হয় নি। অবিশ্বাস্য হলেও এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেই উদ্‌ঘাটিত: 'আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল 'আর্যদর্শন' পত্রে এবং ষোলো বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদরসম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে 'সারদামঙ্গল' এই ষোড়শ বৎসর অনাদৃতভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে।' তাঁর মৃত্যুর পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বিহারীলাল' এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দেই 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'কবি বিহারীলাল' প্রবন্ধ দুটি নানা দিক থেকে বিহারীলাল সম্বন্ধে লেখা বেশ উঁচুদরের সমালোচনা সন্দেহ নেই। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে জানিয়েছেন, 'এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনা, রবীন্দ্রবাবুর সহিত সকল বিষয়ে একমতাবলম্বী না হইলেও, তাঁহার নিকট অঋণী নহে।'

পরবর্তীকালে বিহারীলাল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে প্রাসঙ্গিকভাবে বিহারীলালের আলোচনা অবশ্যই

হয়েছে। সেই সব আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির ছায়াপাত লক্ষণীয়। বিহারীলাল প্রসঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য আলোচনার প্রেরণা : বৈষয়িক। বিহারীলালের কোন-না-কোনো কাব্যগ্রন্থ সুদীর্ঘকাল যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত। বিষয়বুদ্ধিপ্রণোদিত সব আলোচনাই মূল্যহীন নয়। কোনো কোনো লেখায় বিহারীলালের কাব্যবিচারের আন্তরিক প্রয়াসও লক্ষণীয়। কিন্তু কথা হলো, রবীন্দ্রনাথের 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিকে ভুলে বা পাশ কাটিয়ে বিহারীলাল সম্বন্ধে কোনো আলোচনা সম্ভব হয় নি। বস্তুত তা সম্ভবও নয়।

বর্তমান প্রবন্ধে কবি বিহারীলালের সমগ্র কাব্যকবিতার আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগুরু' কী ভাবে কোন্ অর্থে কতখানি তাঁর কাব্যগুরু, সেই প্রসঙ্গটির বিচারবিবেচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আসলে, প্রসঙ্গটি তুচ্ছ নয়। আমাদের বিচারে তো রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখনকার বাঙালী কাব্যপাঠকের কাছে বিহারীলাল প্রসঙ্গে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সেই কাব্যগুরু' কথাগুলি ঠিক কোন্ অর্থ নিয়ে দেখা দিতে পারে?

কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথের মূল প্রবন্ধটিতে ফিরে যাই। বিহারীলালের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিক্ষা কোন্ কোন্ সূত্রে এবং কী কী কারণে তিনি বিহারীলালের কাছে 'ঋণী' বলে জানিয়েছেন, সূত্রাকারে সেগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া কঠিন নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি থেকে যথাসম্ভব তাঁর ভাষাতেই ঋণের সূত্রগুলি উল্লেখ করা যাক—

১. 'সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ'

২. 'ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক'

৩. বাল্মীকি-প্রতিভা 'নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত'

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ : দু'জনেরই সমগ্র কাব্যচেষ্টা আজ পাশাপাশি রেখে ভাবা যায়, বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু?

ভাবা যায় না। যদিও সকলেরই জানা আছে, শিষ্য গুরুকে অনেক সময়েই অতিক্রম করে যেতে পারেন, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন-কি সমগ্র জীবনকীর্তিতেও।

অবশ্য, কবিজীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের (কবিতার) কাছে 'সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ', 'ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বা শিক্ষাগুলি লাভ করেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কোনো হেতু নেই। আর, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথের পরিণত সৃষ্টি নয়। সুতরাং সেই 'নাটকের মূলভাব এবং স্থানে স্থানে তার ভাষা বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ থেকে গৃহীত' : এই সাময়িক ও সুনির্দিষ্ট প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রারম্ভে কোনো অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়।

সমস্যাটা হচ্ছে, সাম্প্রতিক বা পরবর্তী পাঠকদের কাছে। তাঁরা বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হতে গেলেই বিপন্ন হবেন।

সেইজন্যই, রবীন্দ্রনাথ যা'ই লিখুন, বাঙালী পাঠক-সমালোচকেরা, কখনও সর্বান্তঃকরণে বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু হিসেবে মেনে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, বিহারীলাল থেকে আধুনিক গীতি-কবিতার সূত্রপাত। সেই সুবাদে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বিহারীলালের কাছে প্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-কবিজীবনের নিতান্ত আদিপর্বে বিহারীলালের সেই প্রেরণা সক্রিয় ছিল। কয়েকটি খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত-কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বিহারীলাল সম্পর্কে কিছুটা অতিশয়োক্তি করেছেন বলে কারো কারো মনে হতে পারে—

১. সদ্য-প্রয়াত পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সূত্রে

২. ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে বিশেষত জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠানের সঙ্গে বিহারীলালের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্মরণে

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, মূলত বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের সূত্রে—যে-রচনা তাঁর পরিণত সৃষ্টি নয়। মানসী-সোনার তরী-চিত্রা পর্যায়ের কবিতাসমূহের জন্য বিহারীলালের প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার নয়।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে এতখানি ঋণ-স্বীকার-সূত্রে আর কখনও বিহারীলালকে কবি স্মরণ করেন নি।

সাম্প্রতিক বা পরবর্তী পাঠক-সমালোচকদের কথা দূরে থাক্, সমসাময়িক মনোভাবটিও সন্ধানযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, ঐ ১৩০১ বঙ্গাব্দেই 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি বিহারীলাল' প্রবন্ধে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'সর্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনুকরণ আবশ্যক। অতএব রবীন্দ্রবাবুও বিহারীলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য নহে। রবীন্দ্রনাথবাবু তাহাতে 'কতদূর কৃতকার্য' হইয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান ইহা নহে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল ইহাই বলিতে পারি যে অনুকরণে কৃতকার্য হওয়ার আবশ্যকতা রবীন্দ্রনাথবাবুর কিছুমাত্র নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রবাবু কাহারও অনুকারী কবি বলিয়া আমার মনে হয় না। তদীয় কবিপ্রতিভা নিজেই মৌলিক-ভাবাপন্ন।'

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় অধুনাবিস্মৃত হলেও 'কবি বিহারীলাল' প্রবন্ধটির লেখক হিশেবে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়েও তিনি সেই প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতার যুগেই যথেষ্ট সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রবাবু কাহারও অনুকারী কবি বলিয়া আমার মনে হয় না। তদীয় কবিপ্রতিভা নিজেই মৌলিক-ভাবাপন্ন'—রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য আজ আর কেউ অস্বীকার করবেন না।

রবীন্দ্রপ্রতিভার অসামান্য মৌলিকতা তাঁর প্রতিভা-বিকাশের প্রথম পর্বেই ঠাকুরদাস অনুভব করেছিলেন ও প্রকাশ করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর দুঃসাহসিক ভাবুকতার আমরা প্রশংসা করি। 'রবীন্দ্রবাবু কাহারও অনুকারী কবি' যেমন নন এবং 'তদীয় কবিপ্রতিভা নিজেই মৌলিক-ভাবাপন্ন' এই নির্ণয়ও যেমন অভ্রান্ত, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, 'মৌলিকতা' জিনিশটা ভুঁইফোঁড় নয় আদৌ। সেইজন্য, মৌলিকতা যাঁর আছে, তাঁর পরিণত সৃষ্টিতে 'অনুকরণ' বা 'প্রভাব' থাকতেই পারে না, কিন্তু 'প্রেরণা' জিনিশটা কাজ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অবলম্বনে ঠাকুরদাস লিখেছেন, 'সর্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনুকরণ আবশ্যক। অতএব রবীন্দ্রনাথবাবুও বিহারীলালের অনুকরণ করিযাছিলেন, ইহা আশ্চর্য নহে'।

সমসাময়িক সমালোচক ঠাকুরদাসের এই সিদ্ধান্তই সাম্প্রতিক পাঠক-সমালোচকেরও কথা। মনের কথাও। অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের অনুকরণ করেছিলেন।

আমাদের জিজ্ঞাস্য ও সমস্যাটা এই যে, যদি কবিজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বাল্মীকি-প্রতিভার যুগেই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের 'অনুকরণ' করে থাকেন, তবে সেই অনুকরণ প্রথমত একটা স্থূল অর্থাৎ উল্লেখের অযোগ্য ঘটনা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের এই অনুকরণ আদৌ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাই নয়।

তা-হলে দেখা যাচ্ছে, বিহারীলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সেই কাব্যগুরু' শব্দগুলির প্রয়োগ সৌজন্যমূলক মাত্র। সৌজন্য, পারিবারিক সূত্রে অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় পূর্বসূরীর মনঃপূত কাব্যচর্চাপ্রসঙ্গে।

তা-ই

'সর্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনুকরণ আবশ্যক। অতএব রবীন্দ্রনাথবাবুও বিহারীলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য নহে।'—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য, অর্থাৎ যুক্তিবিন্যাস এমনিতে নির্ভুল। আবার 'রবীন্দ্রবাবু কাহারও অনুকারী কবি' নন এবং 'তদীয় কবিপ্রতিভা নিজেই মৌলিক-ভাবাপন্ন'—রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশ্লেষণও সঠিক।

তবু, একটু আগেই যা বলেছি, অর্থাৎ মৌলিকতা জিনিশটা ভুঁইফোঁড় নয় এবং মৌলিকতা যাঁর আছে, তাঁর পরিণত সৃষ্টিতে 'অনুকরণ' বা প্রভাব থাকতেই পারে না, কিন্তু 'প্রেরণা' জিনিশটা কাজ করতেই পারে, কাজ করতেই থাকে—এই কথাগুলিও স্বীকার্য।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভে ব্যাপক অর্থে মাইকেল-হেমচন্দ্র স্কুলের দিকে ঝুঁকেছিলেন, বিহারীলালের কাব্য অবলম্বনে, সঠিকভাবে বলতে গেলে, বিহারীলালের কাব্যাদর্শ অবলম্বনে অগ্রসর হতে গিয়ে আত্ম-আবিষ্কার তাঁর পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল। কথাটা একটু ঘুরিয়েও ধরা যায়। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁরই কবি-স্বভাবের হদিশ পেলেন বিহারীলালের কাব্যে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের পথে যাত্রারম্ভ করলেন না-কি পথ চলতে গিয়ে বিহারীলালকে পেয়ে গেলেন মনঃপূত অগ্রজ কবিভ্রাতারূপে: এটাই নির্ণয় করা, নিশ্চিতভাবে বুঝে নেওয়া ভবিষ্যতে আর কখনই সম্ভব হবে কি-না, কে জানে।

আমার ধারণা, দুটো কথাই সত্যি। আসলে কথা একটাই। আর

সেই মূল্যবান কথাটা এই যে, বিহারীলাল যথার্থই রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। 'কাব্যগুরু' কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্যই এখানে স্বীকার করি।

অর্থাৎ, শুধু প্রথম পর্যায়ের, ঐ বাল্মীকি-প্রতিভাকালের অনুকরণাত্মক তথ্যটুকুই নয়, রবীন্দ্রপ্রতিভার পরবর্তী পরিণত পর্যায়ের প্রেরণাত্মক সত্যটুকুও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা উচিত। আমার এই বক্তব্য একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করা সম্ভব। কিন্তু আমার বক্তব্য উপস্থাপনার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধই যথেষ্ট। আগ্রহ থাকলে এই বিষয়টি অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ রচনায় যে-কোনো উদ্যমী লেখক হাত দিতে পারেন। কৌতূহল জাগিয়ে দিতে পারলে এবং আলোচনায় প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি জুগিয়ে দিতে পারলেই আমি তৃপ্ত।

এর জন্য আমি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্ম, এমন-কি সমগ্র কবিকর্মেরও দ্বারস্থ হব না। বস্তুত আমি বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল-এরও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের সুযোগ গ্রহণ করব না।

এতক্ষণ যা বলতে চেষ্টা করেছি, তা প্রতিষ্ঠার জন্য বিহারীলালের একটিমাত্র চিঠিই আমি অবলম্বন করবো। চিঠিখানি বিশ্লেষণের সূত্রে বিবিধ প্রাসঙ্গিক কথা আসবে। আর তাতেই প্রবন্ধের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

চিঠিখানির কথা বিহারীলালের কাব্যপাঠকমাত্রই জানেন। সারদামঙ্গল কাব্যের পাঠকেরা তো সকলেই জানেন। তবু চিঠিখানির পরিচয় এইভাবে সংক্ষেপে দেওয়া যায়: ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কবি বিহারীলালের পুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে সারদামঙ্গল কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে লেখা কবির এই চিঠিখানি সংযোজিত হয়। বিহারীলালের এই চিঠিখানির তারিখ ৪ কার্তিক, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। চিঠিখানি বিহারীলালের কাব্যপাঠকেরা সকলেই পড়েছেন। একসঙ্গে সম্পূর্ণ চিঠিখানি উদ্ধৃত করার তাই প্রয়োজন নেই। কিন্তু চিঠিটি যেভাবে পাই, সেই ভাবেই প্রথম পংক্তিটি থেকে বিশ্লেষণকালে অংশে অংশে উদ্ধৃত করবো। তাতে চিঠির পাঠ ও বিশ্লেষণ এককালে নিষ্পন্ন হবে।

চিঠিখানির প্রারম্ভ বাক্যটি এই:

'মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধবিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।'

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে 'বিরহ' শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কেন হলো? 'বিরহ' শব্দটির প্রতি কবির এই আসক্তির কারণ কী? পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদের প্রভাব ও প্রেরণা খুঁজে তেমন লাভ নেই। যদিও বিহারীলাল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবির রচনাদি একদা পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়, তবু 'বিরহ' শব্দটির প্রতি কবির আসক্তির কারণ-নির্ণয়ে ঐ তথ্য কোনো ইশারা দেয় না। বস্তুত সন্ধান মেলে সারদামঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে। সারদামঙ্গল কাব্যের সব পাঠকই ঐ সংস্কৃত শ্লোকটির সঙ্গে পরিচিত। শ্লোকটি এই:

সঙ্গমবিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই যে ভালো এবং কবির অধিকতর কাঙ্ক্ষিত তা বেশ বুঝতে পারি। সমগ্র সারদামঙ্গল কাব্য জুড়েই এই বিরহ-বেদনারই ছড়াছড়ি এবং জয়জয়কার। তার সঙ্গে মিলনের চেয়ে বিরহই কাঙ্ক্ষিত। হবেই তো। কেননা, মিলনের মধ্যেই তাকে পাওয়ার মানে খুব সীমিতভাবে, সাময়িকভাবে তাকে পাওয়া, বিরহ-অনুভূতিতে সে যে বিশ্বব্যাপিনী। ত্রিভুবনই তন্ময় তার বিরহে। ত্রিভুবন ব্যাপ্ত বিরহের মধ্যে তাকে পাওয়া মানে তো তাকে অসীমের মধ্যে পাওয়া, নিরন্তর পাওয়া।

তা' হলে কি বুঝতে হবে, এই একটি সংস্কৃত শ্লোক সম্বল করেই বিহারীলাল বিরহের স্বর্গলোকের ঠিকানা করতলগত করে ফেলেছিলেন? ব্যাপারটা অত স্থূল নিশ্চয়ই নয়। বিহারীলালের বিরহ-অনুভূতি অতটা তত্ত্বঘেঁসা নয়। বিহারীলালের বিরহ-অনুভূতি অতটা রোমান্টিক অর্থাৎ অ-কারণ নয়। বিহারীলালের বিরহ-অনুভূতি বড়ো বেশিমাত্রায় জীবনভিত্তিক।

এই সূত্রে বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ কাব্যটির কথা সকলেরই মনে পড়বে। এই কাব্যের কথা সকলেই বলেন। একটু বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। কাব্যটির চারটি সর্গ। প্রথম সর্গটি পূর্ণ-বিজয় নামাঙ্কিত। কৈলাস নামে দ্বিতীয় সর্গ চিহ্নিত। তৃতীয় সর্গে প্রথমা পত্নী সরলার প্রসঙ্গ। চতুর্থ সর্গ রামচন্দ্র নামে চিহ্নিত। প্রথমা পত্নী ও চারজন বন্ধুর অকালমৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বেদনা বিহারীলালকে যৌবনেই বিষাদক্লিষ্ট করে তুলেছিল। বন্ধু-বিয়োগ

কাব্যটির চতুর্থ সর্গের শেষাংশ থেকে জানা যাচ্ছে: কবির 'প্রিয়গণ' তাঁকে 'অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে' তারপর 'যৌবন-উদয়ে সবে হ'লে অদর্শন !'

কিন্তু শুধু বন্ধু-বিয়োগ কাব্যেই কেন, সারদামঙ্গল কাব্য যে মৈত্রীবিরহ ও প্রীতিবিরহের দ্বারা স্পন্দিত, তার বীজ বিহারীলালের 'গান-কবিতার বই' (যথোচিত ও চমৎকার এই আখ্যাটি ব্যবহার করেছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন, তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে) সঙ্গীত-শতক থেকে আরম্ভ করে নিসর্গ সন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী, প্রেমপ্রবাহিনী প্রতিটি কাব্যেই ইতস্তত বিকীর্ণ। আর শুধু মৈত্রীবিরহ ও প্রীতিবিরহ কেন, অপেক্ষাকৃত গূঢ় রহস্যময় ঐ সরস্বতীবিরহবোধও উল্লিখিত রচনাগুলিতে স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান: এই আমাদের বিশ্বাস। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বিহারীলাল সারাজীবন ধরেই 'যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহ'-কেই তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছেন। সারদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থেই তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনা ও জীবনদর্শনের সারাৎসার নিহিত। পূর্ববর্তী সব রচনাই তাঁর সারদামঙ্গল কাব্যসৃষ্টির প্রস্তুতি বললে অসংগত হবে না।

'সরস্বতীবিরহ' বলতে কবি ঠিক কী বুঝেছেন, তার বিশ্লেষণ পরে করা যেতে পারে। মৈত্রীবিরহ ও প্রীতিবিরহের বিষয়টি আগেই পরিস্ফুট হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, 'যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে' কবি ক্লিষ্ট ছিলেন।

কবি আলোচ্য পত্রে লিখেছেন, 'যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া' তিনি সারদামঙ্গল রচনা করেন। 'উন্মত্তবৎ হইয়া' কথাগুলি আমাদের সচকিত করে। এ কি কথার কথা ? এ কি কবিসুলভ অতিশয়োক্তি ? না কি এর কোনো প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব ? কথার কথা মনে হয় না। কবিসুলভ অতিশয়োক্তি হতে পারে না। কারণ, এ কাব্য নয়, ব্যক্তিগত চিঠি। ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি নয়। স্পষ্ট ঋজু বক্তব্যসমন্বিত চিঠি। কাজেই, এই বক্তব্যের বিশ্লেষণ অসম্ভব না-ও হতে পারে।

বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যেই দেখেছি মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ প্রভৃতি তাঁকে কী ভাবে 'উন্মত্তবৎ' করে তুলেছিল। এই প্রাথমিক অর্থ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এটুকুই সব নয়। '…ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি'—অংশে যে ঋজু ও তীব্র ভাষাভঙ্গি লক্ষণীয়, তার মূলে বাংলা কাব্যের তদানীন্তন ঝোঁক সম্পর্কিত কবি বিহারীলালের প্রতিক্রিয়াও থাকা সম্ভব। সম্ভব।আমার ধারণা: তা-ই। কেননা, বাংলা কাব্যের তদানীন্তন

ঝোঁক, যেটা ব্যাপক ছিল, বিহারীলালের আদৌ পছন্দ ছিল না। এই অনন্থমোদন বিহারীলালের কাব্যের একাধিক স্থলে উচ্চারিত। কাব্যে যে-মনোভাব স্পষ্ট-উচ্চারিত, মনস্তত্ত্বের জটিল নিয়মে এই চিঠির সংহত গদ্যে তার হঠাৎ-অনুভব পাঠককে শিহরিত করে।

এখানেই বলি, পাঠক-সমালোচকদের মধ্যে অনেক প্রচলিত ভুল অভ্যাসের মতো এটাও বহুলাংশে প্রশ্রয়-প্রাপ্ত যে, বিহারীলালকে দেখতে হবে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতেই। বিহারীলাল ও তাঁর কাব্যকে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে দেখা তো যায়ই। কিন্তু শুধু সেইভাবেই তা' করতে হবে কেন? রবীন্দ্রভাবনায় অনুরঞ্জিত করে বিহারীলাল ও তাঁর কাব্যকে সবসময়ে দেখা সঙ্গত হবেনা, সত্যেরই খাতিরে। রবীন্দ্রভাবনায় অনুরঞ্জিত করে কালিদাসকে দেখার অভ্যাস আমাদের তৈরি। বিহারীলাল সম্বন্ধেও একই অভ্যাস দাঁড়িয়েছে! অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও সত্য: বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথে আসা। ঐতিহাসিক সত্যটাও তো তা-ই।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিতার ভুবন যতখানি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কাব্যপ্রেরণায় নির্মিত, বিহারীলালের কবিচেতনা তার দশমাংশও পাশ্চাত্ত্য কাব্যের কাছে ঋণী নয়। বিহারীলাল তাঁর বন্ধু পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে এক সময় বায়রন প্রমুখ কবির রচনার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে খুব বেশি কিছু প্রমাণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিহারীলাল প্রবন্ধে সারদার স্বরূপ-নির্ণয়সূত্রে ঐ যে শেলীর কাব্যাংশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন, তা থেকে এমন ধারণা বদ্ধমূল হওয়া ঠিক হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণে শেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অনুবর্তী, বিহারীলালও তাঁদের ততটাই সমীপবর্তী ছিলেন।

বস্তুত, এটা ভুললে চলবেই না যে, বিহারীলালের প্রাণ বাঁধা পড়েছিল, দেশীয় কবিতার ঐতিহ্যসূত্রে। সেই দেশী কবিতা আবার কেবল ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রভাবজাত নয়, শুধু লোকসংস্কৃতিরই প্রভাবসঞ্জাত নয়: বলতে পারি সেই মিশ্র, মোটামুটি সামঞ্জস্যে স্থিত সংস্কৃতির প্রসাদপুষ্ট—যার মধ্যে Matter of Sanskrit আর Matter of Bengal: উভয় সূত্র থেকেই লব্ধ উপাদান বিদ্যমান।

বিহারীলাল সংস্কৃত কাব্যকবিতার অনুরাগী ছিলেন: তাঁর কাব্য-সংগ্রহের অমনোযোগী পাঠকেরও সেটা চোখে পড়ার কথা। কিন্তু আর্যসংস্কৃতি ও

বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির টানাপোড়েনে নির্মিত মধ্যযুগের বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ চরিত্র বিহারীলালের কবিমানসগঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এই কথাটা সর্বপ্রথম আমরা বলছি। তথ্য হিশেবে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গীতশতক গ্রন্থটির কথা, তাঁর আবাল্য কবিগান-প্রীতির কথা, তাঁর রচনায় নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ও কবিগান যে বিবিধ চিহ্ন ফেলে গেছে, তারও কথা। এবং অন্তরঙ্গ সাক্ষ্যপ্রমাণ হিশেবে, বিহারীলালের অত্যন্ত মৌলিক, বৈপ্লবিক কাব্যভাষার কথা। বাংলা কাব্যের লোকসংস্কৃতিপুষ্ট ধারাটির দিকেই তাঁর ছিল ঝোঁক। তাঁর ভাষা পরবর্তী রবীন্দ্রগীতিকাব্যের প্রেরণাস্থল (রবীন্দ্রনাথেরই স্বীকৃতি) হতে পেরেছিল স্বচ্ছতা ও গভীরতার গুণে। ভাষায় এই দুই বৈশিষ্ট্যের জন্য বিহারীলালের ঋণ কোনো পাশ্চাত্ত্য কবির কাছে বা পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাসম্ভূত কোনো বাঙালী কবির কাছে অথবা এককভাবে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে দীক্ষিত কোনো বাঙালী কবির কাছে হতে পারে না।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য কয়েক শতাব্দী ধরে Matter of Sanskrit ও Matter of Bengal অর্থাৎ 'সাধু' উপাদান ও লৌকিক উপাদানের মধ্যে, সামঞ্জস্যসন্ধানে ব্যস্ত ছিল (বাংলা কাব্যেই বললাম, কারণ কোনো কবি কি এ জিনিশ তখন সচেতনভাবে করেছিলেন? জাতীয় প্রবণতা ও সংস্কৃতির অনির্দিষ্ট অথচ অমোঘ দাবি ও টানে এ জিনিশ হয়ে উঠছিল !)। বিহারীলাল বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে কোনো বন্ধুর প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,/ এঁকেছেন যে সকল মনোহর ছবি,/ সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে ;/ বাণী যেন বিহরেন কমল-কাননে।/ সাগরসম্ভূত রত্ন, অক্ষয় ভাণ্ডার,/ কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার,/ কিন্তু তুমি কর নাই কভু অযতন ;/ বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।/ বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,/দুর্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।/ ধূলা ঝেড়ে, কোলে ক'রে হ'তে হরষিত,/ ছেলে কোলে ক'রে যেন পিতা প্রফুল্লিত।'

বন্ধুর প্রসঙ্গে লিখিত বিহারীলালের এই সব কথাই তাঁর নিজের সম্পর্কেই সর্বাধিক প্রযোজ্য। এই উদ্ধৃতির ভাষা-ভঙ্গির প্রতিও পাঠক-সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এখানে ব্যবহৃত ভাষাভঙ্গি থেকে লৌকিক শব্দ-ভাণ্ডারের সঙ্গে কবির আত্মীয়তা ধরা পড়ে। বিহারীলালের কাব্যভাষা এখনও দানা বাঁধে নি। কিন্তু একটি নতুন কাব্যভাষার জন্ম হচ্ছে : সেই জন্মযন্ত্রণার পরিচয় এই কাব্যভাষার অসম্পূর্ণতার মধ্যে ধরা পড়েছে।

'উন্মত্তবৎ হইয়া'—শব্দযুগলের অন্য তাৎপর্যসন্ধানের সূচনায় প্রাসঙ্গিক কিছু জরুরি কথা সেরে নেওয়া গেল। প্রাসঙ্গিকতা : সামগ্রিকভাবে বিহারীলাল ও তাঁর কাব্যবিশ্লেষণ সুবাদেও।

কৃত্তিবাস কাশীরাম মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিদের ভাষা সংস্কৃত ও লোকভাষার মধ্যে সমন্বয়চেষ্টাপ্রসূত এমন এক ভাষা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পাশ্চাত্ত্য পরিবেশে জাত ও লালিত হয়েই যা থেকে কিছুটা সরে আসছিলেন। পুরোনো বাংলা কাব্যভাষার শ্রেষ্ঠ রূপ ঈশ্বর গুপ্ত না করলেন আত্মস্থ, না করলেন অতিক্রম। তিনি পুরোনো কাব্যভাষার অতি পরিচিত, অভ্যস্ত একটা সাধারণ (general) রূপ;—যে জন্য কষ্ট করতে হলো না, যা শিখতে হলো না, যা হাওয়ায় ছিল—সেই রূপটিকে নিয়েই রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতা লেখার খাতিরে ইংরেজি শব্দের কিছু মিশল দিয়ে কাজ চালিয়ে গেলেন। বাংলা কাব্যের বস্তুবৈচিত্র্য তাঁর হাতে ঘটলো, কিন্তু ক বি তা র 'ভাব' ও 'ভাষার' জগতে প্রবেশের কোনো চেষ্টাই তিনি করলেন না। তাঁর আরো অনেক কাজ ছিল। সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা এখানে নয়। কিন্তু না, ক বি তা র ভাষা নিয়ে তাঁর এমন কোন পরীক্ষা নেই, যে জন্যে তাঁর কাব্যচেষ্টাকে বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতিতে কোনা বিচার্য পর্ব বা অধ্যায় বলতে পারি।

কাব্যভাবনার স্বাতন্ত্র্যের জন্য মধুসূদনকে খুঁজে নিতে হলো, বলা উচিত তোলপাড় করে ফেলতে হলো সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার। তাঁর কাব্যভাবনার অনুগামী অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার তাঁর ভাষাকেও মর্যাদামণ্ডিত করে রাখলো। আর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রায় সর্বতোভাবে মধুসূদনকে অনুসরণ করলেন। যাঁরা গদ্যে ভালো উপন্যাস বা প্রবন্ধ লিখতে পারতেন, সাহিত্যকে সমযোপযোগী অর্থাৎ দেশের প্রত্যক্ষ উন্নতির কাজে লাগাতে পারতেন, তাঁরা কাব্যছন্দে যা রচনা করলেন : সেগুলির কাব্যগুণ বিতর্কাধীন রয়ে গেল এবং কবিতাকারে বিন্যস্ত হওয়ায় প্রাত্যহিক প্রয়োজনেও ততটা ব্যবহার্য হলো না। তবু যে হেম-নবীনের কাব্যকবিতায় স্বদেশচিন্তা তাঁদের জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, তাতেই প্রমাণ হয়, তাঁদের কবিতা নয় তাঁদের কবিতার বিষয়-মাহাত্ম্যই এর জন্য দায়ী।

ফল কথা, বিহারীলালের প্রাক্-কালের ও সমকালের কবিতা ও কাব্যভাষা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, ভদ্র, হিশেবি, যুক্তিপূর্ণ, অভিজাত, স্বয়ংসম্পূর্ণ। কাব্য ও কাব্য-

ভাষা এই রকম হতেই পারে না, বলি না। রোমান্টিক কবিতা ও কাব্যভাষা এই রকম নয়। বিহারীলাল এই রকম কবিতা চাইছিলেন না। তিনি এই রকম কাব্যভাষায় প্রাণের সায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

বিহারীলালের প্রাক-কালের ও সমকালের কবিতার ভাব ও ভাষা একটু বেশি যুক্তিশৃঙ্খলবদ্ধ। কবির অনুভূতি ওধ্যান অতখানি 'লজিক' বা যুক্তির শৃঙ্খল মানে না। অনুভূতি, আবেগ—এ সবের কি পূর্বনির্ধারিত অতিনিশ্চিত কোনো গতিপথ আছে? ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেল-হেমচন্দ্রের স্কুলের কাব্য-কবিত্ব কোথায় যেন একটা লজিক-এর দাসত্ব করে এসেছে। তা কতকাংশে কৃত্রিম। গদ্যাত্মক। যুক্তিধর্মী।

বিহারীলালের স্পষ্ট প্রতিবাদ এখানেই। এই তাঁর স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতা, দান, যাই বলি,—বাংলা কবিতায়। এই সূত্রে তিনি ষোল আনাই এবং শেষ পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। পরে পাশ্চাত্ত্য কাব্যগুরুদের পেলেও বিহারীলাল তাঁর আদিগুরু।

না, 'গদ্যের' কৃত্রিমতা, আবেগহীনতা ও যুক্তিপ্রখরতা নয়। কবিতাকে একটু প্রাণ-ময় হতে হবে। হৃদয়ের তোলপাড় কবিতার অভ্যস্ত চালচলনকে যেন একটু ক্ষতবিক্ষত করে। কবিকে যেন একটু বেহিশেবি করে। অত বেশি Sanity-র দরকার কী?—বিহারীলাল তাই 'উন্মত্তবৎ হইয়া' 'সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা' করলেন।

আলোচ্য চিঠিখানির প্রথম বাক্যটির শেষাংশে দেখছি, বিহারীলাল সারদামঙ্গল কাব্য নয়, 'সারদামঙ্গল সঙ্গীত' রচনা করেছিলেন। আমরা জানি, সারদামঙ্গল কাব্য হিশেবেই পরিচিত। আমরাও কাব্য হিশেবেই 'সারদামঙ্গল'-এর আলোচনা করছি। কবি কিন্তু তাঁর বন্ধুকে লেখা চিঠিতে সারদামঙ্গল-প্রসঙ্গে সঙ্গীত শব্দটিকেই বেছে নিলেন।

বিহারীলাল তদানীন্তন বাংলা কাব্যপ্রবাহে, ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই যে নতুন সুরটি যুক্ত করে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে আধুনিক ধরনের গীতিকবিতা। বিহারীলালকে অনেকে অ-সচেতন ভাবভোলা কবি হিশেবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যেমন একজন স্রষ্টাকে পাই, তেমনই একজন ভালো ক্রিটিককেও পাই: এই কথাটা আমরাই সর্বাগ্রে বলছি। বিহারীলাল গদ্যের বিশেষ চর্চা করেন নি। সাহিত্যচিন্তামূলক গদ্যরচনা তাঁর নেই

বললেই চলে। কিন্তু এই একটি মাত্র চিঠিতে তাঁর যে বিস্ময়কর কাব্যবিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাই, তাতে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়। প্রথমত, তিনি সত্যিই নিছক ভাবুক বা আত্মভোলা কবিই ছিলেন না; কবিতার প্রকরণ তথা কাব্যশিল্প সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বিতর্কাতীত। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, সারদামঙ্গল বেশ স্বতন্ত্র ও নতুন রীতির কাব্য। তাঁর চিঠি থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে, তাঁর কাব্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাসা-ভাসা ছিল না। প্রতিটি শব্দ মেপে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন তিনি।

আর সেই জন্যেই, সারদামঙ্গল কাব্যের সাংগীতিক দিকটির বিষয়ে তিনি নিজে খুবই অবহিত ছিলেন। পাঠক-সমালোচকদেরও তাঁর কাব্যের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন করে দিয়েছেন। কবি-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্যের প্রাথমিক পর্বে চিত্ররীতি ও সঙ্গীতরীতির টানাপোড়েন এবং অবশেষে 'মানসী' থেকে সঙ্গীতরীতির প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আমার ধারণা, রবীন্দ্রকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রনাথের বিহারীলাল-অনুবর্তনকে পরিস্ফুট করে।

বিহারীলালের কাব্যকবিতাও সারদামঙ্গল-পূর্ববর্তী পর্যায়ে কখনও চিত্ররীতি, কখনও সঙ্গীতরীতির প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। সঙ্গীত-শতকের কথা ও বৈশিষ্ট্য একটু স্বতন্ত্র। প্রথম দিকেই তা বলেছি। সারদামঙ্গল-এ এসে দেখছি, কবি যেন চোখে আঙুল দিয়ে এই কাব্যের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিয়ে দিতে চান। তা' না হলে, সারদামঙ্গল কাব্যে উপহার গীত ও সমাপ্তি (শান্তি) সঙ্গীত ছাড়াও পাঁচটি সর্গের প্রত্যেকটির সূচনায় একটি করে গান, অর্থাৎ মোট সাতটি গান কেন থাকবে?

সারদামঙ্গল কাব্যের একেবারে প্রথমে 'উপহার গীত'-এর যে প্রবর্তনা দেখি, তারই অনুবর্তন অনেকগুলি রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থেও লক্ষণীয়। মানসী ও মহুয়ার প্রথমেই এই জাতীয় উপহার গীত চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক কাব্যেই এই ধরনের উপহার-কবিতা আছে। মানসী ও মহুয়ার উপহার (উৎসর্গ) কবিতাদুটি নানাকারণে আমার খুব প্রিয় বলে এই দুটির কথা প্রথমেই মনে পড়ে যায়।

সাত-সাতটি গান! তা' ছাড়াও সারদামঙ্গল-এর কাব্যাংশ রাগ-রাগিণী যোগে গেয়। আলোচ্য চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি এই:

'সর্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম ; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর।'

এই বাক্যটির গুরুত্ব আগেই অনুভব করেছি। এখন শুধু নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রদত্ত বিবরণ (প্রয়াস : ফেব্রয়ারি ১৯০০) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করবো—'বিহারীলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন।...ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বাটিতে আসিয়া সেগুলিকে সুরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোনো অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন।'

আলোচ্য চিঠির পরবর্তী বাক্য : 'গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের।'

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী কবি বিহারীলালের পক্ষে এই-ই ছিল স্বাভাবিক। সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গেই বিহারীলাল এই 'ত্রিকালের' অনবদ্য ভাষাচিত্র রচনা করেছেন। রচনা করেছেন 'ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি'। প্রসঙ্গত বাল্মীকির কবিত্বলাভের রূপক কাহিনীও চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছেন বিহারীলাল। বিহারীলালের কাব্যশিষ্য রবীন্দ্রনাথও 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় পরবর্তীকালেও বাল্মীকির কবিত্বলাভের কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। সেই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দও অতুলনীয়।

সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গের ২৩-২৭ স্তবকগুলি বাংলা কাব্যপ্রবাহে বিহারীলালের অসামান্য দান। 'ফটিকের নিকেতন/দশদিকে দরপণ,/বিমল সলিল যেন করে তক্‌তক্‌;/সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়/হাসিয়ে যে দিকে চায়,/সেইদিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া/নয়নের সঙ্গে সঙ্গে/ঘুরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,/অবাক্‌ দেখিলে, হয় অমনি অবাক্‌ ; চক্ষে পড়ে না পলক/তেমনি মানস-সরে/লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে/দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া।'

'ষোড়শী রূপসী বামা' সরস্বতীর আবির্ভাব এবং বিশ্বের দর্পণে নিজের

বিচিত্র রূপকে প্রতিফলিত হতে দেখে আত্ম-আবিষ্কারের হর্ষ-বিহ্বল যে ছবি বিহারীলাল এখানে এঁকেছেন, 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক কবির সেই হর্ষ-বিহ্বল মুহূর্তকে অহল্যার বিস্ময়াবেগের মাধ্যমে চমৎকার তুলে ধরেছেন। বিহারীলাল লিখেছিলেন,

এস মা উষার সনে
বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দু-খানি রাখ হৃদয়-কমলে!

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

বিস্মৃতিসাগরনীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

চিঠির পরবর্তী বাক্যটি এইরকম: 'এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি রচনানন্তর আমার চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।'

বাক্যটির প্রথমাংশ 'এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি' পূর্ববর্তী বাক্যের বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে বহুলাংশে ব্যাখ্যাত। সরস্বতী কবির কাছে শুধু বাগ্দেবী নন। প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য প্রভৃতির সারাৎসার কি কবির সারদা? এবং, তাঁর কাব্যলক্ষ্মীও? প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের ধারাবাহিকতায় কখনও কোনো ছেদ কি কল্পনাও করা যায়? কবির কাব্যলক্ষ্মীও কি অনন্তপ্রসারিতা নন? তাঁর কি 'আদি' ছিল? তাঁর কি 'অন্ত' সম্ভব?

তাই 'ত্রিকাল'। বাল্মীকিরও আগে কাব্যলক্ষ্মী ছিলেন। বাল্মীকির কালেও। এবং কালিদাসের কালে। এই ত্রিকালকে, ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীকে ধ্যানযোগে উপলব্ধি করতে হবে। এবং তার পরেই শুধু ত্রিকালবাহিত ঐ সরস্বতী সমস্ত কাব্য-ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে কবির, সরস্বতী নয়,—সারদারূপে আবির্ভূত হতে পারেন। প্রত্যেক কবিরই সরস্বতী আছেন। কিন্তু সেই সরস্বতী একদিকে নির্বিশেষ, অন্যদিকে বিশেষ।

পূর্বতন কাব্যধারায় বাহিত সরস্বতী নির্বিশেষ। প্রধান প্রধান কবি ও কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি যুক্ত। তাই বাল্মীকির পূর্ববর্তীকাল, বাল্মীকির কাল, কালিদাসের কাল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কালের নামে চিহ্নিত বিভিন্ন সরস্বতীমূর্তির কথা বলা হলো। কিন্তু কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে আমার কাব্যের যোগ যতই অন্তরঙ্গ হোক, আমার কবিতা যে স্বতন্ত্র একটা কিছু। তাই আমার কাব্যলক্ষ্মীর কথা বলা হয় না, ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীর কথা অর্থাৎ বিভিন্ন কাব্য-ঐতিহ্যের কথা বলার পরেও।

সেইজন্য 'আমার…সারদা'।

সারদা কেমন ?

বিহারীলাল বলেছেন, 'আমার চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা'।

সারদা চির-আনন্দময়ী কিংবা চির-বিষাদিনী বললে সারদা যে কেমন, সহজেই বোঝা যেত। কিন্তু বিহারীলাল বলেছেন, তাঁর সারদা চির-আনন্দময়ী ও চির-বিষাদিনী! একযোগে তিনি আনন্দ ও বিষাদের চির-উৎস। একযোগে। কী করে হয় ?

সারদার ভাববৈচিত্র্য নিয়ে সংশয়ের অবসর নেই। বিচিত্ররূপিনী শব্দটির আদলে বিচিত্রভাবিনী শব্দটির কথাও ভাবা যেতে পারে। কিন্তু একই কালে যিনি আনন্দময়ী ও বিষাদিনী—এবং যিনি চির-আনন্দময়ী ও চির-বিষাদিনী—তাঁর স্বরূপ বুঝে নিতে হবে।

সারদামঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটির আলোচনার সময় দেখেছি, বিহারীলাল মিলনের তুলনায় বিরহকেই পছন্দ করেন। একে কিন্তু রোমান্টিক কবিসুলভ নিছক দুঃখবিলাস বলে মনে করা ভুল। বিরহ বিরহের জন্যই বাঞ্ছিত নয়। বিরহ মিলনের তুলনায় বাঞ্ছিতকে অনেক গভীর করে কাছে এনে দেয়, বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের বোধ ও উপলব্ধিকে বি র হ অসীম ও নি র ন্ত র করে। এই জন্যই বিরহই ভালো। বিহারীলালের কাব্যশিষ্য রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যগুরুর এই উপলব্ধিকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। অসংখ্য কবিতায় ও অন্যান্য রচনায় তার পরিচয় আছে। মানসী কাব্যটিতে, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তা ও কাব্যশৈলী বিশিষ্টতা অর্জন করে পরিণতশক্তির দিকে অগ্রসর, রবীন্দ্রনাথেরও এই বিরহপ্রীতি খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। অনেক কবিতা আছে। আমি মানসী-র 'বিরহানন্দ' কবিতাটির নামকরণ থেকে শুরু করে প্রথম দুটি ছত্রের দিকে কাব্যভাবুকদের

তাকাতে বলি। 'বিরহ' আর 'আনন্দ': শব্দযুগলের আপাত-বৈপরীত্য 'আনন্দ' আর 'বিষাদ'-এরই সমতুল্য। 'বিরহানন্দ' কবিতার সূচনায় এই স্পষ্ট উচ্চারণ :

বিরহ সুমধুর কেন দূর হলো রে
মিলন-দাবানলে জলে যেন গেল রে···

আমাদের সচকিত করে। মনে করিয়ে দেয়,বিহারীলালের প্রিয় ও মূল ভাবনাভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যের কথা।

বিহারীলালের সারদার স্বরূপ-আস্বাদন প্রসঙ্গে আনন্দ ও বিষাদের সহাবস্থানের তত্ত্বটি বুঝে নিতে চাই বিহারীলালেরই কাব্যশিষ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের সহায়তায়। কারণ, বিহারীলাল সৃষ্টি করেছেন কিন্তু নিজের সৃষ্টির বিশদ ভাষ্যরচনা করে যেতে পারেন নি বা করেন নি কিংবা করতে চানও নি। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। তিনি বুঝেছিলেন, শুধু সৃষ্টি করলেই হবে না, তার ভাষ্যও রচনা করতে হবে। নতুন কবিতার দিকে পাঠককে টেনে আনতে হবে, পাঠককে বোঝাতে হবে নতুন কবির ভাবনাবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য। তাই আনন্দ ও বিষাদের সহাবস্থানের যে তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালেরই কাছে দীক্ষিত, সেই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনায় বিকীর্ণ। আমাকে যেটা নাড়া দেয়, আমি সেটাই উদ্ধৃত করবো: 'আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরে কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এই জন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এই জন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য।'—পাগল, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী : পঞ্চম খণ্ড (বিশ্বভারতী : ফাল্গুন ১৩৭৩), পৃষ্ঠা ৪৪৬। একই প্রবন্ধের একই অনুচ্ছেদে 'দুঃখ' কথাটিও সঙ্গত কারণেই এসেছে—'সুখ, সুবিধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে।'

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের দুটি উদ্ধৃতিতে তিনটি শব্দের ব্যবহার ও তাৎপর্য লক্ষণীয়—সুখ, আনন্দ, দুঃখ। তিনটি শব্দই সর্বশেষ উদ্ধৃত বাক্যটিতে আছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে সুখ ও আনন্দের মধ্যে পার্থক্যটিকে নির্ণয় করেছেন।

প্রচলিত অর্থে সুখ ও আনন্দ সমার্থক হলেও কবির চোখে এদের প্রভেদ একেবারে মৌলিক : সুখ এই জন্যে শস্তা যে তা 'প্রতিদিনের সামগ্রী', তাকে পেতেও যতক্ষণ, হারাতেও ততক্ষণ, এ বস্তু কবির, ভাবুকের কাঙ্ক্ষিত নয়'। আনন্দ 'প্রত্যহের অতীত'। তা প্রাত্যহিক অর্জন ও ক্ষতির ঊর্ধ্বে। প্রতিদিন পাওয়াও যায় না। একবার পেলে হারায়ও না। এই ভাবে দেখলে সুখ ও আনন্দ আপাতসমার্থক হলেও মূলত বিভিন্ন। ঠিক তেমনি সুখ দুঃখকে সহ্য করতে পারে না। এদের প্রভেদও মৌলিক। এইভাবেই, দুঃখই আনন্দ হয়ে ওঠে।

একইভাবে চির-আনন্দময়ী সারদাই একই কালে চির-বিষাদিনী হয়ে ওঠেন। আনন্দ ও বিষাদের লৌকিক ভেদ ঘুচে যায়। আনন্দ ও বিষাদই বস্তুত সমার্থক হয়ে ওঠে। যদি তাই হয়, সারদাকে শুধু 'বিষাদময়ী মূর্তি' রূপে অনুভব করলেই বা ক্ষতি কী? বিষাদময়ী তো আনন্দময়ীও! বিহারীলাল তাঁর চিঠির পরবর্তী ছত্রেই লিখেছেন : 'বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্তির সহিত বিরহিতমৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।'

এতক্ষণে অনুভব করা গেল, বিহারীলালের বিরহ-অনুভূতি বড়ো বেশি-মাত্রায় জীবনভিত্তিক! এর আগেই বিরহিতমৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্তি বন্ধুবিয়োগ প্রভৃতি কাব্য অবলম্বনে অনুভব করা গেছে। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হলো বিষাদময়ী মূর্তি। শুধু যুক্ত হয় নি। 'মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—'

বিরহিতমৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্তি = সীমার জগতের, রূপের জগতের অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

বিষাদময়ী মূর্তি = অসীমের, অরূপের উপলব্ধিসঞ্জাত।

এইভাবে বিহারীলালের কাব্যেই সীমা-অসীমের, রূপ-অরূপের তত্ত্বটি সর্বাগ্রে পরিস্ফুট হতে পেরেছিল।

আলোচ্য চিঠির পরবর্তী বাক্যটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ : 'এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।'

পাঠক-সমালোচকেরা অন্তত এই বাক্যটি থেকে বুঝতে পারেন যে, বিহারীলাল তাঁর কাব্যভাবনা ও শিল্পরীতি সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন।

সারদামঙ্গল কাব্য বিচারের পথনির্দেশ বিহারীলালই দিয়ে গেছেন। এবং তাঁর সুযোগ্য কাব্যশিষ্য তাঁর মৃত্যুর পরেই লেখা 'বিহারীলাল' প্রবন্ধের কোথাও গুরুর নির্দেশ বিস্মৃত হন নি। বিহারীলাল যে 'কোনো উদ্দেশ্যেই' সারদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন নি, বস্তুত তাঁর কাব্যসাধনাই যে লৌকিক কোনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই স্পষ্টভাবে বলে নিয়েছেন: 'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় দীর্ঘ বর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না!'—কাজেই 'আমি কোনো উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই' বিহারীলালের এই ঘোষণা শিরোধার্য করতেই হয়। বিহারীলালের চিঠির 'এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন' অংশটি বুঝতে হলে এর পূর্ববর্তী অংশের বিশ্লেষণটি বুঝে নিতে হয়।

বিহারীলালের চিঠির সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয় নানাকারণে। কবি লিখেছেন: 'মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদিসম্মত কথা কহিতে হয়···।'

'মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে' কবি জানিয়েছেন, তাঁর 'সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত' লেখা আবশ্যক। আমরা আগেই বলেছি, বিহারীলালের বিরহ-অনুভূতি বড়ো বেশিমাত্রায় জীবনভিত্তিক। বস্তুত বলা উচিত, তাঁর কাব্যসাধনাও তাঁর সমস্ত জীবনাভিজ্ঞতার সারাৎসার। সীমা বা রূপের জগতকে বাদ দিয়ে বিহারীলাল কাব্যচর্চা করেন নি বলেই বিহারীলালই রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। অবশ্য, বিহারীলালের 'সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত' না হলেও বহির্জীবনের অনেক কথাই তাঁর বিভিন্ন কাব্যে প্রতিফলিত। আর সরস্বতীর সঙ্গে 'প্রেম, বিরহ ও মিলন'-এর রহস্য অর্থাৎ তাঁর অন্তর্জীবনের কথাও তাঁর কাব্যকবিতা থেকেই আমাদের খুঁজে নিতে হবে। সেইজন্যই মনে হয়, বিহারীলালের কাব্যগুলিই যথেষ্ট। তাঁর সৃষ্টিতেই তাঁর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের পরিচয় গ্রথিত আছে।

'আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা'—রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ে জানিয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের কেন, বোধ হয় সব বড়ো স্রষ্টারই প্রতিমা-রচনার এই একটিমাত্র পালাই : আমার তা-ই মনে হয়। আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই তত্ত্বটিকে এই ভাষায় সুবিন্যস্ত করলেন। কিন্তু, বিহারীলালের কাব্যসাধনায়, আলোচ্য চিঠিতেও এই তত্ত্বেরই প্রস্তাবনা। আমি মনে করি : প্রতিষ্ঠাও।

আর এই সামগ্রিক অর্থে ও তাৎপর্যে, বিহারীলালই রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা : তাঁর উপন্যাসের প্লট

১

মাধবাচার্য কহিলেন, "মূর্খ তিনজন, যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ।"—মৃণালিনী, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে অর্থাৎ জ্যোতিষ সম্বন্ধে কোনো নূতন বা পুরাতন তত্ত্ব বা সূত্রের ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অতিশয় সূক্ষ্ম, জটিল ও গভীর। তদুপরি বহুলাংশে বিতর্কাধীন। জ্যোতিষিগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতপার্থক্যও লক্ষণীয়। সুতরাং এইরকম একটি বিষয়ে পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তারাজির বিচার অথবা নূতন চিন্তার অবতারণা প্রবীণ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত শৌখিন অনুরাগিগণের সাধ্যাতীত। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও, যিনি অসামান্য মনীষার অধিকারী, ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুখ্য চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিক কর্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মানবরূপে পরিকীর্তিত, জ্যোতিষ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র, বিস্তৃত একটিও প্রবন্ধ রচনা করেন নি। জ্ঞান ও রসবোধের বিচিত্র ক্ষেত্রসমূহে যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ ও আত্মবিশ্বাসী সঞ্চরণ, তিনিও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসার পরিচয়টুকু উপস্থাপিত করেই নিরস্ত হয়েছেন, সে সম্বন্ধে মৌলিক পর্যালোচনার অবতারণা করেন নি। 'আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয়' বঙ্কিমচন্দ্র করতেন না, সে স্বভাব ঐতিহ্যের শিকড়হীন পল্লবগ্রাহী তথাকথিত অত্যাধুনিকতার।

কোনো কোনো প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় ইতস্তত কিছু কিঞ্চিৎ উল্লেখ ব্যতীত জ্যোতিষ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় ভাবনাভঙ্গির পরিচয় তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যেই প্রাপ্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে এতদ্‌বিষয়ক অনুসন্ধানের প্রারম্ভে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরদান কর্তব্য। জ্যোতিষ সম্বন্ধে কৌতূহল

কার নেই ? প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদিগণের প্রায় সকলেই জ্যোতিষ সম্বন্ধে কৌতূহলী, অনেকেই বিশ্বাসী। বরং যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যেই অনেকে মাঝে-মধ্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতে বাধ্য হন। এখন প্রশ্ন এই, প্রায় সকলেই যদি জ্যোতিষ বিষয়ে কৌতূহলী, সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেই বিশেষভাবে এতদ্‌বিষয়ক অনুসন্ধানের তাৎপর্য কী ?

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'যোগাযোগ উপন্যাসে ব্যবসায়ী মধুসূদন ঘোষালের চরিত্রচিত্রণে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যদিও জ্যোতিষে অবিশ্বাসী ছিলেন না, তবু এই উপন্যাসে জ্যোতিষ প্রসঙ্গের উপস্থাপনা ব্যঙ্গাত্মক। মধুসূদন বিচক্ষণ হলেও ব্যবসায়ী যে ! তাই সহজেই তার ভ্রাতা, সুরসিক ও সহৃদয় নবীন জ্যোতিষীর সহায়তায় জাঁদরেল দাদাকে ঘায়েল করার কথা ভেবেছিল ; মধুসূদন-কুমুদিনীর ফাটল-ধরা দাম্পত্য সম্বন্ধকে মেরামত করার আর কোনো পথ বেচারী নবীনের জানা ছিল না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মুখ্য, অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ আকস্মিক, স্বল্প বা তাৎপর্যহীন নয়।

একটি সার্থক উপন্যাসের কাছে আমাদের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা তাতে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের পরিচয় থাকবে। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। গল্পরসের সহায়তায় জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় প্রদানের জন্য উপন্যাসে একটি প্লটের প্রয়োজন। গল্পরস কম-বেশি হতে পারে, এমন কি আধুনিককালে তথাকথিত 'প্লট'-বিহীন কথাসাহিত্য রচনার অত্যুৎসাহের কথা মনে রেখেও বলা যায়, 'প্লট'কে উপেক্ষা করার জন্যও আধুনিক ঔপন্যাসিকের একটি নিজস্ব 'ছাঁদ' [প্লট ?] বানিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ বাইরের খোলসটা অতিব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে বলে রুচিবদলের জন্য সেটার পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠেছে। জীবনের বহিঃপ্রাঙ্গণ থেকে জীবনরহস্যের অন্তঃপুর যাত্রার ইতিহাসই উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাস। অথচ তরল পদার্থ যেমন বিশিষ্ট আধারহীন অবস্থায় যথার্থ পর্যবেক্ষণ এবং আস্বাদনের যোগ্যই নয়, তেমনই জীবনের সূক্ষ্মতম, গভীরতম, মহত্তম বাণীটিকেও উপন্যাসশিল্পের আধারে পরিবেশন না করলে সে-বস্তু 'নীরব কবিত্বের' মতোই একটা অর্থহীন কল্পনামাত্র। যে কাঠ জ্বলে নি, তাকে

যেমন আগুন বলা যায় না ; তেমনই যে-রচনা কাহিনী-ছাঁদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল না, তাকে নিশ্চয়ই উপন্যাস বলা যাবে না। বস্তুতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীতে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে উপন্যাসের ফর্ম, তাই প্লটের গুরুত্ব নিয়ে নানা মতও দেখা দিয়েছে। কিন্তু উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে, সব ভাষার ক্ষেত্রেই সমস্যা হয় 'প্লট' নিয়ে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আর কেউ যে সার্থক উপন্যাস-রচয়িতারূপে গৌরব দাবি করতে পারেন না, তার প্রথম ও প্রধান কারণই কি এই নয় যে প্লট-রচনার নৈপুণ্য ছিল সেই লেখকের আয়ত্তের অতীত?

মনে রাখা ভালো যে, প্লট কেবল 'কৌশল'জাত নয়, প্রথম শ্রেণীর রসোত্তীর্ণ উপন্যাসের প্লট লেখকের সৃজনপ্রতিভাসম্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক, তার প্রধান কারণ, তাঁর হাতেই প্রথম, বাংলা উপন্যাসের প্লট দেখা দিয়েছিল।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্যা তাঁর পরবর্তী ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের পাঠক-সমালোচকদের পক্ষে অনুভব করাও শক্ত। কারণ, দ্বিবিধ। প্রথমত, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির সঙ্গে একালের অধিকাংশ পাঠকের প্রত্যক্ষ ও ধারাবাহিক সম্বন্ধের অভাব ; দ্বিতীয়ত, ইতিহাসবোধবর্জিত আবেগপ্রবণ বাঙালিস্বভাব। বিদ্যায়তনসমূহের বাইরে বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের সম্বন্ধ যেমন নিবিড় নয়, তেমনই আবার দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে এ কালের পটভূমিতে একশো বছর আগের লেখা ও লেখককে প্রতিপদে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা বর্তমান। তা-ও আবার স্বকালের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের মোহ ও অতীত সম্বন্ধে বিচারহীন অশ্রদ্ধাসহ।

তাই যদি না হতো, তা হলে আজ বাঙালি লেখক ও পাঠকদের একটি বড়ো অংশ [বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে এঁদের অনেকেরই কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ] প্লট-প্রধান উপন্যাস রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নির্বিচার ঔদাসীন্যের লক্ষ্যরূপে নির্বাচন করতেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেকালে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনও বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস দেখা দেয় নি এবং উপন্যাস রচনার প্রাথমিক ও অনিবার্য শর্তই হলো 'প্লট'-ভাবনা।

বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই সর্বপ্রথম প্লট-রচনার দিকেই মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। প্লট সৃষ্টি করতে গেলে অনন্ত জীবন প্রবাহের একটি নির্দিষ্ট অংশকে

সুনিয়ন্ত্রিতভাবে, পরিমিতভাবে নির্বাচন ও পরিবেষণ করতে হয়। সেইজন্যই জীবনসম্পর্কিত একটি দর্শন, অনতিসচেতনভাবে হলেও, লেখকের গড়ে ওঠা প্রয়োজন। জীবনটা এলোমেলো, বহুধাখণ্ডিত, বহুবিচিত্র হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে তথা উপন্যাসে যখন জীবনের একটি রূপনির্মিতির প্রয়োজন হয়, তখন নির্বাচন ও বর্জনের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

ঔপন্যাসিক তাই জীবন-ভাবুক, জীবনের রূপকার। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই জীবনজিজ্ঞাসা অতি তরুণ বয়স থেকেই দেখা দিয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় :

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী, বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।"—ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি।

উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে স্বীকার করতে হবে, তাঁর জীবন-ভাবনায় ছিল 'high seriousness'—নিষ্ঠা, সততা ও গভীরতায় তা' ছিল পূর্ণ, কোনো ফাঁক, ফাঁকি, ভাবালুতা ও জনচিত্তজয়ী সাময়িক কলাকৌশলের স্থান সেখানে ছিল না। জীবনের রূপকার হিসাবে 'চলতি হাওয়ার পন্থী' তিনি ছিলেন না আদৌ। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে জ্যোতিষসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা তাঁর অতি গভীর জীবন-জিজ্ঞাসারই একটি অপরিহার্য দিক।

উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলির জীবনের প্রধান অংশের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার কথা বিবৃত ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচ্য জীবনপরিধির একটা নির্দিষ্টতা প্রয়োজন। জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তায় মানুষের আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটি সমগ্র জীবনের মূল 'ছক' বা 'প্যাটার্ন'টিকেই আমরা জানতে পারি। জ্যোতিষগণনার সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। সংশয় ও বিতর্কের অবকাশকেও নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। তবু জন্মপত্রিকা বা ঠিকুজি-কোষ্ঠী তৈরির প্রচলন এবং তার বিচার-আলোচনা আধুনিক যুগেরও অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

ব্যক্তিবিশেষের জন্মকুণ্ডলী দেখে একজন মোটামুটি দক্ষ জ্যোতিষীও, তাঁর জীবনের অনেক কথাই সঠিকভাবে বলে দিতে পারেন। মানুষ তার তনু, ধন, আয়ু, বন্ধু [বিদ্যা, জননী], পুত্র, শত্রু, জায়া, নিধন, ভাগ্য [পিতা, ধর্ম], কর্ম, আয় [লাভ] ও ব্যয়, এই বারোটি বিষয়ের কথা জানতে পারলেই তার সমগ্র জীবনের কথাই জানা হয়ে যায়। আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে তথা চারিপাশের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ও তার স্বরূপ জানার জন্যও এই জন্মকুণ্ডলী বিচার্য। আর, যে কোনো উপন্যাস, হোক সে পূর্ববর্তী কালের, হোক সে আধুনিক জীবনের আলেখ্য—মানুষের সঙ্গে মানুষের দেহ ও মনের সম্বন্ধকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব জটিল জীবনালেখ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এককথায়, জীবন জ্যোতিষনির্ভর—এ কথাটা যাঁরা মানেন না তাঁরাও বস্তুগতভাবে স্বীকার করবেন : জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু জীবননির্ভর।

মানুষের জীবনকে নিয়েই জ্যোতিষের কারবার। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, কর্মোন্নতি—এই সব সূত্রেই সাধারণত মানুষ জ্যোতিষের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বমোট বারোটি ভাব বা দিক থেকে জ্যোতিষ মানুষের জীবনকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট।

সেইজন্য একজন নিষ্ঠাবান ও তত্ত্বজ্ঞ জ্যোতিষী মানবজীবনেরই ভাষ্যকার। একজন ঔপন্যাসিকও কি মূলত তাই নন? জ্যোতিষীর মানবজীবনভাষ্য তত্ত্বদৃষ্টিপ্রসূত। ঔপন্যাসিকের মানবজীবনভাষ্য রসদৃষ্টিপ্রসূত। এই ব্যবধানটুকু জানি এবং মানিও, কিন্তু মহৎ ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য কি তত্ত্বদৃষ্টি ও রসদৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্যসৃষ্টির প্রয়াস নয়? জীবন কি তত্ত্বসর্বস্ব? অথবা রসসর্বস্ব? দু'ই নিয়েই জীবন। দুটি দিক থেকেই অর্থাৎ সামগ্রিকভাবেই ঔপন্যাসিক জীবনের পাঠগ্রহণ ও বিশ্লেষণে নিমগ্নচিত্ত।

বলাই বাহুল্য, এসব কথার অর্থ নয়, ঔপন্যাসিককে হ'তে হবে দক্ষ জ্যোতিষী অথবা জ্যোতিষীকে লিখতে হবে সার্থক একটি উপন্যাস। আলোচিত অংশের তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, ঔপন্যাসিক ও জ্যোতিষী উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে মানবজীবনের দ্বন্দ্বরহস্যেরই ভাষ্যকার। সমগ্র মানবজীবনের গভীর অধ্যয়নই তাঁদের লক্ষ্য।

পদ্ধতি যতই স্বতন্ত্র হোক, দু'জনকেই মেনে চলতে হয় নিজের নিজের যুক্তিশাস্ত্র। মেনে চলতে হয়, ভিতর মহলেই বেশি ক'রে। বিতর্কের অধীন দু'পক্ষই। কারণ, দু'পক্ষের সামনেই প্রসারিত একাধিক মত ও পথ। কিন্তু

লজিকের অ্যাকসিয়মের মতো ঔপন্যাসিক ও জ্যোতিষীকেও অনুসৃত পথের ঠিকানা ধরেই চলতে হবে। না হলে দাঁড়াবে গোঁজামিল। সে গোঁজামিল জ্যোতিষগণনাতেও দুর্লক্ষ্য নয়, উপন্যাসেও পর্যাপ্ত।

২

কৃত্রিম মনে হ'চ্ছে—এই বিশ্লেষণ? অথবা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অটুট নিবিড় প্লট-বন্ধনের অসামান্যতায় স্বস্তিহীন অতি আধুনিক পাঠক-সমালোচক ভাবছেন: জ্যোতিষ-উৎসাহী না হ'লে ক্ষতি কী হ'তো বঙ্কিম-উপন্যাসের? জ্যোতিষকে মেলাতে গিয়েই তো তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে কতকাংশে যান্ত্রিক? তা-ই মনে হবে তাঁদের, জ্যোতিষকে যাঁরা জীবনবহির্ভূত, কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পছন্দ করবেন। কুসংস্কার অথবা জীবনবহির্ভূত নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনভাবনা জ্যোতিষভাবনায় সমুজ্জ্বল।

কেবল উপন্যাসাশ্রয়ী জীবনভাবনা নয়, বিশ্বজীবনের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল যুক্তিবিজ্ঞানীসুলভ। অর্থাৎ পরিপূর্ণমাত্রায় আধুনিক। তার প্রমাণও বঙ্কিমসাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যসৃষ্টির মূলেও বঙ্কিমচন্দ্র কোনো আকস্মিকতাকে স্বীকার করেন নি। কারণ, তাঁর মতে বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। আকস্মিকতা বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা রহস্য হয়েই আছে। তবু, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক প্রখ্যাত প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সুনির্দিষ্ট অভিমত : 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।...সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।' বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন, সেই সব নিয়ম জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। তবু, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র।

অতএব, জ্যোতিষপ্রসঙ্গও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনিমন্ত্রিত অতিথির মতো আকস্মিক নয় আদৌ। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশকাল ও প্রাসঙ্গিক জীবন-ভাবনার সূত্রেই তাঁর উপন্যাসে জ্যোতিষভাবনার অবতারণা।

উপন্যাস নামক সাহিত্যশিল্পরূপটি সর্বাধিক বাস্তবচেতনাসমৃদ্ধ। প্রত্যাহের অতীত কল্পনার বৈদ্যুতিক লীলা উপন্যাসের প্রাত্যহিক রঙ্গশালাখণ্ডটিকে

প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিত করে বটে, কিন্তু উপন্যাসে বস্তুভার সর্বতোভাবেই অনুভবগম্য। 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'—এই সূত্র গীতিকবিতা এবং সমধর্মী ছোট গল্পের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অবাধ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব কল্পনায় সমৃদ্ধ হলেও, তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপ এতই নিখুঁত যে, তা যেন দেবশিল্পীর ঈর্ষাস্থল। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁর উপন্যাসের প্লট 'নির্মাণ' করেন নি, যেন তা সৃষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত: অথচ মুহূর্তের জন্য আমাদের 'বাস্তববোধ'-কে তা আঘাত করে না। সেই শিল্পরূপই তত অসমান্য, যার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যত অনমুভূত।

তখনও বাংলায় একটিও সার্থক উপন্যাস লিখিত হয় নি, উপন্যাসরূপে চিহ্নিত গ্রন্থগুলি শিল্পসুষমাবর্জিত: কলম ধরেই প্রথম প্রয়াসেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ফেলতে পারলেন উপন্যাস: অর্থাৎ 'রচনা' করতে পারলেন 'প্লট'। বাংলা সাহিত্যে যেহেতু প্রথম, তাই 'রচনা' না ব'লে বলা উচিত: সৃষ্টি। যা ছিল না, তাই হলো। যদিও ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে বলেছিলেন: তবু অ্যারিস্টটলের সেই অতিপরিচিত মন্তব্য এই প্রসঙ্গেও স্মরণ করা যায়। ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের তুলনায় প্লটের গুরুত্ব ও প্রাধান্যের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি—"We maintain, therefore, that the first essential, the life and soul, so to speak of Tragedy is the Plot; and that the Characters come second...' সার্থক প্লট রচনার নৈপুণ্যও শক্তিমান ও পরিণত লেখকের পক্ষেই সম্ভব, এই সূত্রটিও স্পষ্ট করেছিলেন: "A further proof is in the fact that beginners succeed earlier with the Diction and Characters than with the construction of a story...'

এই মন্তব্য দুটির পরিপ্রেক্ষিতে, লেখনী ধারণমাত্র প্লটসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য সিদ্ধিলাভ আমাদের চূড়ান্ত বিস্ময় উৎপাদন করে। প্রতিভায় কী না সম্ভব?—এই সম্ভাব্য উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নিশ্চয়ই গ্রহণ করতেন না। কেন না, তাঁর নিজস্ব সূত্রানুসারে: 'সকলই নিয়মের ফল।' আমাদের ধারণা, প্লটসৃষ্টিতে এই চমকপ্রদ সাফল্যের কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকার এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে লব্ধ সমগ্র মানবজীবনের 'ছাঁদ' বা 'প্যাটার্ন'টিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস। সহজ কথায়, মানবজীবনের অংশবিশেষ উপন্যাসে তুলে

ধরতে গিয়ে, জ্যোতিষ অনুশীলনকালে লব্ধ মানবজীবনভাগ্য সম্বন্ধে তাঁর যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা—তাকেই তিনি যথোচিত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। সমগ্র জীবনের মধ্যে সাধারণ নরনারীর অজ্ঞাত একটি 'প্যাটার্ন' বা 'ছাঁদ'কে যিনি ধরতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে উপন্যাসের 'মূল ছক'টিকে অনুভব করা অর্থাৎ সুষম প্লট রচনা করা খুব কঠিন নয়। জীবনের কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে কিনা এই তর্ক এখানে অবান্তর। জীবনের প্যাটার্ন থাক্ বা না থাক্, উপন্যাসে চিত্রিত জীবনকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনে ধরতেই হবে আর সেইজন্যই অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উপন্যাস প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য অর্থাৎ প্লটই হলো উপন্যাসের 'the first essential, the life and soul.'

৩

জ্যোতিষপ্রসঙ্গ বঙ্কিম-উপন্যাসে স্বল্প তো নয়ই, পরন্তু বিস্ময়করভাবে পর্যাপ্ত। প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান নিম্নোক্তরূপে বিশ্লেষণযোগ্য। ইংরেজিতে লেখা 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' এবং অসম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস 'রাজমোহনের স্ত্রী' ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দখানি। ক্ষুদ্রায়তন 'ইন্দিরা' [১৮৭৩] 'রাধারাণী' [১৮৭৭] ও 'রাজসিংহ' [১৮৮২] এর পরিবর্তে বৃহত্তর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের 'রাধারাণী' [১৮০৩], 'ইন্দিরা' [১৮৯৩] ও রাজসিংহ [১৮৯৩] ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালানুক্রমিক বিন্যাস এই রকম—১। দুর্গেশনন্দিনী [১৮৬৫], ২। কপালকুণ্ডলা [১৮৬৬], ৩। মৃণালিনী [১৮৬৯], ৪। বিষবৃক্ষ [১৮৭৩], ৫। যুগলাঙ্গুরীয [১৮৭৪], ৬। চন্দ্রশেখর [১৮৭৫], ৭। রজনী [১৮৭৭], ৮। কৃষ্ণকান্তের উইল [১৮৭৮], ৯। আনন্দমঠ [১৮৮৪], ১০। দেবী চৌধুরাণী [১৮৮৪], ১১। সীতারাম [১৮৮৭], ১২। রাধারাণী [১৮৯৩], ১৩। ইন্দিরা [১৮৯৩], ১৪। রাজসিংহ [১৮৯৩]।

এই চৌদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে আটটিতে প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। বাকি ছ'খানি গ্রন্থের দু'টিতে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ সরাসরি উত্থাপিত না হলেও জ্যোতিষের পরোক্ষ প্রণোদন স্পষ্টগ্রাহ্য। বঙ্কিমের উপন্যাসে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ আকস্মিক নয়, স্বল্পও নয়, এবং এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মনে করি, এই কথাগুলি এতক্ষণে

পরিস্ফুট হয়েছে আশা করা যায়। কিন্তু জ্যোতিষপ্রসঙ্গ কী ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্লটভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের প্লটকে অসামান্যতা দান করেছে, সেই বিষয়ে আরো কিছু আলোকপাত অনাবশ্যক নয়।

বঙ্কিম-পূর্ববর্তী উপন্যাস নামে চিহ্নিত গ্রন্থগুলি ঘটনা-চরিত্র, সংলাপ-বর্ণনা এবং রচয়িতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। সমস্ত জড়িয়ে গল্পরস দানা-বাঁধার মতো বস্তু-কাঠামো খুঁজে পায় নি, জীবনের টুকরো টুকরো ছবি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বিশেষভাবেই লভ্য, কিন্তু একটি জীবনপরিধির সামগ্রিক রসাবেদন সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বাংলায় লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র ত্রুটি অন্বেষণের জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের প্রযোজন হয় না। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সেকালে এ-গ্রন্থের এত জয়-জয়কার—দুটোই বাস্তব সত্য, অস্বীকার করার উপায় নেই, পরবর্তীকালে বিষবৃক্ষ থেকে অন্য একটি পর্বের সূচনা বাংলা উপন্যাসের ধারায়। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে ছিল না এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পূর্ণ হলো উপন্যাসের একটি অবশ্যপূরণীয় শর্ত, আগেই বলেছি—'দুর্গেশনন্দিনী'তে প্লট এল। আর এইজন্য, ইতিহাসের কঙ্কাল ছাড়া আরো যে উপাদানগুলি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করলেন, তার মধ্যে সন্ন্যাসী, স্বপ্ন, চিঠি এবং সর্বোপরি জ্যোতিষের প্রসঙ্গ। স্বপ্ন ও চিঠির ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, আমাদের মনে হয়, মনোবিশ্লেষণের বিকল্প হিসাবেও কাজে এসেছে। প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রেও চিঠির উল্লেখযোগ্য ব্যবহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসে লক্ষণীয়, স্বপ্নের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবহার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্লটনির্মাণে।

জ্যোতিষ ও সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ দু'টি পরস্পরের হাত-ধরাধরি ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বারবার দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে যেমন 'রাজা', বঙ্কিম-সাহিত্যে তেমনই সন্ন্যাসী। 'রাজা'র বিবর্তনের বিষয়টি 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়' নামে আমার গবেষণাগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমসাহিত্যে সন্ন্যাসী চরিত্রেরও ধারাবাহিক একটি বিবর্তন ইতিহাস গবেষণার বিষয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্রের এক কোটিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র [illegible]রাম স্বামী—যাঁর প্রথম জীবন কলঙ্কিত, পরবর্তীকালে সেই চরিত্রের

ঊর্ধ্বায়ন ঘটেছে ; অপর কোটিতে 'আনন্দমঠ'-এর মহাপুরুষ। মধ্যবর্তী পথের ইতিহাসই সন্ন্যাসীজাতীয় চরিত্রের বিবর্তন-ইতিহাস।

যে মানব-নিয়তিকে গ্রীক নাট্যকারগণ থেকে শেক্‌স্‌পীয়র এবং পরবর্তীকাল পর্যন্ত অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাঁরা কতদূর প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল, আধুনিক বা অনাধুনিক, রসজ্ঞ সাহিত্যপাঠকের কাছে সে প্রশ্ন অবান্তর। তাঁরা সর্বজনের ও সর্বকালের। বাংলা সাহিত্যের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রও তাই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড: তৃতীয় পরিচ্ছেদে জ্যোতিষী চন্দ্রশেখরের স্বগতোক্তি :

'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে। যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।'—বিশেষ পরিস্থিতিতে উপন্যাসের একটি চরিত্র চন্দ্রশেখরের উক্তি হ'লেও এই ক্ষুদ্র উদ্ধৃতির সহাযতায় বঙ্কিমমানসের কিঞ্চিৎ পরিচয় অলভ্য নয়। ভবিতব্য ও পুরুষকারের মধ্যে সামঞ্জস্য-সন্ধানের অপর নামই বঙ্কিম-সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কালে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত থাকলে এবং বঙ্কিম-মানসের পরিচয় গ্রহণ করলে, বঙ্কিমচন্দ্র কেন ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য উতলা হয়েছিলেন, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপন্যাসে কেন প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এসব প্রশ্নের যেমন উত্তর পাওয়া যায়, তেমনই নিখুঁত প্লট রচনায় তাঁর আত্যন্তিক যত্নের কারণও উপলব্ধ হয়।

উপন্যাসে বর্ণনীয় জীবনের প্লট বা বৃত্ত রচনা করতে গিয়ে জ্যোতিষ-জিজ্ঞাসু বঙ্কিমচন্দ্র জন্মপত্রিকার বৃত্তটিকে অন্ধবিশ্বাসের বশে নয়, জীবনশিল্পীর অসামান্য নিপুণতায় কাজে লাগিয়েছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর বিশ্বাস পুরুষকারে বিশ্বাসের অভাবপ্রসূত নয়, এলোমেলো আপাত-অসংলগ্ন জীবনের মধ্যে একটি লজিকের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের পথেই উদ্ভূত।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বনে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন করতে পারি। প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই শুরু করা যেতে পারে। উপন্যাসটির প্রথমদিকে অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষগণনার সূত্র ধরেই বীরেন্দ্রসিংহ পাঠান সেনাপতির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হলেন। তারপর

উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনা জটিলতার সূত্রপাত। করিম বক্স নামে যে সৈন্যটির তৎপরতায় তিলোত্তমা ও বিমলা ধরা পড়েছিল, তাকে ঠাট্টা করেই 'মোগল-সেনাপতি' বলা হতো। বস্তুত, অভিরাম স্বামী গণনা করে দেখেছিলেন, মোগল-সেনাপতির মাধ্যমে তিলোত্তমার অমঙ্গল। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে মোগল-সেনাপতি হলেন জগৎসিংহ। তিলোত্তমার সাক্ষাৎ অভিলাষী জগৎসিংহকে দুর্গমধ্যে আনতে গিয়েই বিমলার অসতর্কতায় বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রান্ত হয় এবং তিলোত্তমাসহ দুর্গের সকলেরই অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু পরিণামে তিলোত্তমার যে সুখসৌভাগ্য দেখা গেল, তার মূলেও ঐ মোগল সেনাপতি অর্থাৎ জগৎসিংহ।—এক্ষেত্রে জ্যোতিষগণনা অংশত ফলেছে। অভিরাম স্বামীর অসম্পূর্ণ গণনাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু জ্যোতিষের সত্যাসত্য যাচাই না করেও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রথম বাংলা উপন্যাসেই প্লটভাবনার সূত্রে জ্যোতিষের প্রসঙ্গটিকে কাজে লাগিয়েছেন। বিমলার সুদীর্ঘ চিঠিতেও অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষগণনায় নিপুণতার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন লেখক। অভিরাম স্বামীর নির্দেশ অমান্য করে বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর অভিপ্রায় মতো যদি পাঠানপক্ষেই যোগ দিতেন, তা হলে উপন্যাসের ঘটনার গতিপ্রকৃতি অন্যরূপ হতে পারতো। কিন্তু রাজায় রাজায় লড়াই হ'লে বীরেন্দ্রসিংহের ন্যায় ভূস্বামীদের পরিণতির বড়ো ইতরবিশেষ হতো না। অর্থাৎ জ্যোতিষগণনা উপন্যাসের বৃত্ত-রচনায় সহায়ক হয়েও জীবনসত্যকে লঙ্ঘন করলো না।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড-এর প্রথম পরিচ্ছেদেই মাধবাচার্য বলিতে লাগিলেন, 'কয় মাস পর্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি, গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।' আমরা সকলেই জানি, মাধবাচার্যের ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর অভিপ্রেত আক্ষরিক অর্থে ফলে নি, ফলতে পারেও না, কেননা তাহলে তা হতো ইতিহাস অর্থাৎ বাস্তব সত্যবিরোধী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষগণনার প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করলেন কেন? জ্যোতিষগণনা যে মাঝে মাঝে ভুল হয়, হ'তে পারে, এই কি তাঁর আনুষঙ্গিক প্রতিপাদ্য? 'সীতারাম' উপন্যাসে দেখি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' শ্রীর প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপভাবে জ্যোতিষবচনকে আক্ষরিক ও অভিপ্রেত অর্থে ফলবান হতে দেন নি। বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্রই জ্যোতিষবচনকে চূড়ান্ত নির্ণায়ক রূপেই দেখিয়েছেন কিন্তু জ্যোতিষবচনের

ব্যাখ্যা ও ভাষ্য করতে গিয়ে জ্যোতিষীরাও যে বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণে উপন্যাসের চরিত্রসমূহ জ্যোতিষবচনের আক্ষরিক অর্থ ও অভিপ্রেত ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে জীবন-বিড়ম্বনা ভোগ করেন ; এই বাস্তব সত্যটিকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। এতে লাভ কী হয়েছে ? লাভ হয়েছে উপন্যাসের, অর্থাৎ প্লটটা দাঁড়িয়ে গেছে, দানা বেঁধেছে। কাহিনী ত্বরিত গতিতে পরিণামমুখী হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয়, জ্যোতিষশাস্ত্রের খাতিরে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষের অবতারণা করেন নি, প্লট রচনার সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, তাঁর জ্যোতিষ-সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে। 'মৃণালিনী'তেই দেখি, মনোরমা-পশুপতি উপাখ্যানের ক্ষেত্রে জ্যোতিষবচন বর্ণে বর্ণে ফলেছিল। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের শেষাংশে মাধবাচার্যের গণনা-ভাষ্য যখন আক্ষরিক ও তাঁর অভিপ্রেত অর্থে সত্য বলে প্রমাণিত হলো না, তখনও 'মাধবাচার্য কহিলেন, 'বৎস ! দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে।'—চতুর্থ খণ্ড : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পরামর্শ। এবং 'মাধবাচার্য কহিলেন, 'জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে ; অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে···।'

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতেও 'জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে' ভাষ্য রচনায় 'ভ্রম' হতেই পারে।—এইভাবে উপন্যাসের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিচিত্র ঘটনারাজি জ্যোতিষ-গণনা ও তার ভাষ্যসূত্রে গ্রথিত। ঠাসবুনানি এর প্লট। জীবনসত্যকে লঙ্ঘন না করেও প্লটগঠনে জ্যোতিষকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আরো বিস্ময়কর এই যে, এরই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য দেশাত্মবোধের সার্থক্ সূচনা হয়েছে।

সমগ্র 'যুগলাঙ্গুরীয়' দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষচক্রের ভিত্তিতে তথা একটি চিঠিকে অবলম্বন করে। লিখেছিলেন আনন্দস্বামী : হিরণ্ময়ীর পিতাকে—'জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্তব্য নহে। হিরণ্ময়ীতুল্য সোনার পুত্তলিকে কখনও চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ। তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর পর্যন্ত পরস্পরে যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে তাহার বিধান আমি করিতে পারি।'

উপন্যাস হিসাবে 'যুগলাঙ্গুরীয়'-এর মূল্য এমন কিছুই নয় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

জ্যোতিষভাবনা ও তাঁর উপন্যাসের প্লট, এই উভয়ের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ উপলব্ধির জন্য উপন্যাসটির উল্লেখ করতে হলো।

ইতিহাসের তথ্য ও মানবজীবনের সত্যকে মিলিয়ে দিয়ে প্লট ও চরিত্র-সৃষ্টিকে বিশ্বাসযোগ্য ও সার্থক করে তোলায় বঙ্কিমচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। 'সুবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ' ও তাঁর প্রিয়তমা দলনীবেগমের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে মুরশিদাবাদের অনতিদূরের বেদগ্রামের চন্দ্রশেখর ও তাঁর পত্নী শৈবলিনীর জীবনসমস্যা একসূত্রে গ্রথিত করার জন্যও বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষকে অবিশ্বাস্য কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। একাধিক উপাখ্যানকে উপন্যাসে ব্যবহার করতে গেলে প্লটগঠনে যথার্থ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। সে নৈপুণ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমের প্লটগঠনশক্তির অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তস্থল। স্বল্পপরিসরে অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে উদ্ধৃতির সাহায্যে এবার বিষয়টি বহুলাংশে পরিস্ফুট হ'তে পারে :

'দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন ; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব ?'

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, 'তবে কলমদান দাও।'

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখিলেন ?'

মীরকাসেম বলিলেন, 'যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।'

এই পর্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। বড়ো জোর তৈরি হলো : সাসপেন্স। এর পরেই কুশলী কথাকার, অসামান্য প্লটরচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। পাঠক এতক্ষণ গল্পরসেই মগ্ন ছিলেন। দলনী-মীরকাসেম বৃত্তান্তে পাঠক যখন মগ্নচিত্ত, সেই অবকাশে গল্প ছড়িয়ে যাবে এবার ভিন্ন দিগন্তে : মিলেমিশে একস্রোতে অতঃপর বাহিত হবে দুটি আপাত-বিচ্ছিন্ন উপাখ্যানধারা—

'নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্‌সিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, 'মুর্‌শিদাবাদে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে ?'

মীরমুন্‌সি তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।'

চন্দ্রশেখর কী করলেন ?

'চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্মচারীকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।'

রাজকর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন মহাশয় ?' চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।'

চন্দ্রশেখরের কথাগুলি সত্যও নয়, অসত্যও নয়। জ্যোতিষে তিনি পারদর্শী কিন্তু মনুষ্য সর্বজ্ঞ নয়। জ্যোতিষ গণনার জন্য মীরকাসেমের আহ্বানে তিনি বেদগ্রাম ত্যাগ না করলে হয়তো শৈবলিনীকে এত দ্রুত হারাতেন না। আবার অন্যদিকে কাহিনীতে জটিলতাসৃষ্টির জন্য শৈবলিনীর বেদগ্রাম পরিত্যাগ প্রয়োজন ছিল। আর সে জন্য আবশ্যক ছিল চন্দ্রশেখরের সাময়িক অনুপস্থিতির। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ গণনার উপলক্ষ্যে চন্দ্রশেখরকে বেদগ্রাম থেকে সরিয়ে এনে একযোগে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।

এইভাবে 'রজনী', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসেও জ্যোতিষ প্রসঙ্গের অবতারণা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্লটভাবনা যে সমসূত্রে বিধৃত, সেকথা উল্লিখিত প্রত্যেকটি উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক অংশসমূহের উদ্ধৃতি ও সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি উপন্যাস অবলম্বনে এই বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধহয় আর নেই। অতঃপর আমরা কেবল 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম' থেকে দু' একটি সূত্রের উল্লেখ ও আলোচনা করেই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করতে চাই।

'রাজসিংহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনামই হলো :

'অদৃষ্ট গণনা'। সেই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম জানিয়েছেন, দিল্লির চাঁদনী চকে জনতার সবচেয়ে বেশি ভিড় জ্যোতিষীদের কাছে। দরিয়ার চাপে প'ড়ে মবারক জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্যগণনা করিয়ে যা জেনেছিল, ঘটনাচক্রে তা যেমন সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল তেমনই আবার এই ভাগ্যগণনারই সূত্র ধরে উপন্যাসের অপর উপাখ্যানটিকেও ক্রমাগ্রসর হতে দেখি। আবার, পঞ্চম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে জ্যোতিষী গণনাপূর্বক নির্মলকুমারীকে যা জানিয়েছিল, তারই সূত্র ধরে উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাসমূহের বিস্তার।

আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য: 'সীতারাম'। এই উপন্যাসেরও প্লট সম্পূর্ণত জ্যোতিষনির্ভর। পরিত্যক্তা পত্নী শ্রী যখন ভ্রাতার প্রাণবধের আশঙ্কায় বিপন্ন হয়ে সীতারামের সাহায্যপ্রার্থিনী হলো, 'তখন শ্রী মুখের ঘোমটা খুলিল'—সীতারাম দেখিলেন, 'অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্য-সুন্দরমুখী। বলিলেন, 'তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!'—এই রূপজমোহ থেকেই সীতারামের সাময়িক উত্থান এবং পরবর্তীকালে চূড়ান্ত পতন। বরাবর একসঙ্গে বাস করা সম্ভব হলে রূপজমোহ কেটে গিয়ে একদিন সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারতো শ্রীর সঙ্গে। বিবাহকালে শ্রীর কোষ্ঠী পাওয়া যায় নি। তবু বিবাহ হয়েছিল সীতারামের মায়ের ইচ্ছায়, শ্রী পরমাসুন্দরী ব'লে। বিবাহের মাসখানেক পরে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ শ্রীর নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী পরিত্যক্তা হয়েছিল। শ্রীর প্রশ্নের উত্তরে সীতারাম জানিয়েছে—'তোমার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।'—প্রথম খণ্ড: সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের এই অংশে প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সীতারামের মাধ্যমে শ্রী ও পাঠক জানতে পারে—'যাহার এরূপ হয়, সে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে, স্ত্রীলোকের 'প্রিয়' বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা।' —প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পুনরায় প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি এবং শ্রীর হস্তরেখার পাঠ ও ভাগ্য গণনার সূত্রে জ্যোতিষসম্পর্কিত নানা কথার উল্লেখ পাই। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রের এই একটি প্রধান উপন্যাসের অংশবিশেষের পাঠ ও রসগ্রহণের জন্য, জ্যোতিষ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অংশটি দীর্ঘ বলে উদ্ধৃতি দিলাম না। তৃতীয় খণ্ডের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে 'শ্রী বলিল, 'মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা

করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।'

বিধিলিপি যাই হোক, যেভাবেই তা' ফলবতী হোক্‌, জ্যোতিষগণনাকে নির্ভর করেই এই বিশিষ্ট উপন্যাসখানিতে আখ্যানের অবতারণা, জ্যোতিষ গণনার সূত্রেই কাহিনীর বিকাশ ও অগ্রগতি এবং পরিশেষে একই সূত্রে মূল কাহিনীর উপসংহার। অর্থাৎ 'সীতারাম' উপন্যাসের প্লট জীবনসমুখ হয়েও জ্যোতিষকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করে তাই আমাদের সিদ্ধান্ত : তাঁর উপন্যাসে প্লট নির্মাণের যে অসামান্যতা দেখা যায়, তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত। এর ফলে প্লট যে কোথাও যান্ত্রিক হ'য়ে ওঠে নি, তা নয়। এই জাতীয় যান্ত্রিক প্লটের নিদর্শন হিসাবে 'যুগলাঙ্গুরীয়' গ্রন্থটির নাম করা চলে। এই তুচ্ছ ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, জ্যোতিষভাবনা যেমন প্লটরচনার সূত্রে তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবন ও শিল্পচেতনারও অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকার্য।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা ও জীবনদর্শন

অভিরাম স্বামী উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, 'শ্রবণ কর, আমি কয়েক দিবস পর্যন্ত জ্যোতিষী-গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ, স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।'

বীরেন্দ্রসিংহের মুখ বিশুষ্ক হইল, আগ্রহ সহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গণনায় কি দেখিলেন ?'

পরমহংস কহিলেন, 'দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।'

বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল।

অভিরাম স্বামী কহিতে লাগিলেন, 'মোগলেরা বিপক্ষ হইলেই তৎকর্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে, স্বপক্ষ হইলে সম্ভবে না, এজন্যই আমি তোমাকে মোগল পক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছিলাম। এই কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মনঃপীড়া, দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, মনুষ্যযত্ন বিফল, বুঝি ললাটলিপি অবশ্য ঘটিবে, নহিলে তুমি এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে কেন ?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা। প্রথম খণ্ড : দুর্গেশনন্দিনী।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) উপরে-উদ্ধৃত অংশটি পাঠক যদি মন দিয়ে পড়েন, তা-হলেই তিনি নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা প্রথম থেকেই কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। জ্যোতিষ সম্বন্ধে সাধারণ কৌতূহল সাধারণ মানুষের চিরকালই ছিল। তখনও ছিল। আজও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও জ্যোতিষ সম্বন্ধে কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। উপরে-উদ্ধৃত অংশটিকে এই ভাবেই আমরা গ্রহণ করতে পারতাম যদি।

দেখা যেত, দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেই,এইটুকুই, জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল।

কিন্তু না। জ্যোতিষপ্রসঙ্গের এই অবতারণাই শেষ কথা নয়। এবং দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেও জ্যোতিষপ্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত নয়। এবং, তাছাড়া, উদ্ধৃত অংশটিতে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ যে ভাবে উপস্থাপিত, তাকে সাধারণ কৌতূহল হিসেবে গণ্য করা যায় না। এই অংশেও জ্যোতিষপ্রসঙ্গের তাৎপর্য গভীর। শুধু জ্যোতিষের দিক থেকে নয়। সমগ্র উপন্যাসের বিকাশ ও পরিণতির বিচারেও।

দুর্গেশনন্দিনীর গল্পাংশ শিক্ষিত বাঙালী পাঠকমাত্রেরই জানা। সকলেই জানেন, অভিরাম স্বামীর সঙ্গে বীরেন্দ্রসিংহ যখন কথা বলছিলেন, পাঠান কতলু খাঁর দূত তখন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান এবং অন্তরালে থেকে বিমলা সব কথাই শুনছিল। পাঠক এ-ও জানেন, অভিরাম স্বামীর গণনাসূত্রেই পরবর্তী কাহিনীর বিস্তার। বীরেন্দ্রসিংহ পাঠান কতলু খাঁরই বিরুদ্ধতা করলেন অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণাক্রমে। আর ঘটনাচক্রে কতলু খাঁর সেনাপতি ওসমান বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ অবরোধ করে অন্য সকলের সঙ্গে তিলোত্তমাকেও বন্দিনী করলো।

যে-সৈন্যটির হাতে তিলোত্তমা ও বিমলা শেষ পর্যন্ত বন্দিনী হলো, সে যখন ওসমানের কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করলো, ওসমান তার নাম জিজ্ঞাসা করায়:

"সে কহিল, 'গোলামের নাম করিম বক্স, কিন্তু করিম বক্স বলিলে কেহ চেনে না। আমি পূর্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম, এজন্য সকলে রহস্যে আমাকে মোগল-সেনাপতি বলিয়া ডাকে।'

বিমলা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অভিরাম স্বামীর জ্যোতির্গণনা তাঁহার স্মরণ হইল।"

অভিরাম স্বামীর গণনা কি কেবল বিমলারই মনে পড়লো? আমাদের, উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকাদের নয়?

অর্থাৎ, অভিরাম স্বামীর গণনা পুরোপুরি ফলে গেল? মোগল সেনাপতি থেকেই তিলোত্তমার অমঙ্গল ঘটলো?

সঙ্গত কারণেই পাঠকের মনে হবে, এ যেন জোর করে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ-বচন অক্ষরে-অক্ষরে ফলাতে চেষ্টা করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, মোগল সেনাপতি বলতে অভিরাম স্বামী যাঁকে বুঝেছিলেন (এবং বীরেন্দ্রসিংহও

এই বুঝেছিলেন) তিনি হলেন মানসিংহ, জগৎসিংহ হলেও জ্যোতিষবিচার অভ্রান্ত হয়। কিন্তু অব্যবহিত বা সরাসরি অমঙ্গল ঘটলো মোগল-সেনাপতি বলে পরিহাস করে যাকে ডাকা হয়, তেমন একজন সাধারণ পাঠান-সৈন্যের দ্বারা।

আবার ভেবে দেখতে গেলে, বিপদের সূত্রপাত তো জগৎসিংহ তথা প্রকৃত মোগল সেনাপতিকে কেন্দ্র করেই। জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার সাক্ষাৎ থেকেই বিপদের সূচনা। আবার জগৎসিংহ-তিলোত্তমার সাক্ষাৎকারকে উপলক্ষ করেই তিলোত্তমার, তার পিতার, সকলেরই সর্বনাশ। সুতরাং জ্যোতিষবচন অক্ষরে-অক্ষরে ফললো।

তবু কি ফললো ?

ঐ যে মোগল-সেনাপতি জগৎসিংহ, যার জন্য তিলোত্তমার বিপদ, যার জন্য সে পিতা ও পিতৃরাজ্য সমস্তই হারালো, সেই জগৎসিংহই তিলোত্তমার নারীজীবনের চরিতার্থতা ঘটালেন ! তাহলে কী ক'রে বলবো, মোগল-সেনাপতি থেকে তিলোত্তমার অমঙ্গল : অভিরাম স্বামীর এই গণনা নির্ভুল ? অথচ দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা জেনেছি, শশিশেখর (অভিরাম স্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম) অন্যান্য সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ তো করেইছিলেন, তৎসহ 'জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন।' তা-হলে ?

আসল কথা হলো, এই ধরনের বিশেষ একটি গণনার আলোকে সামগ্রিকভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের বা জ্যোতিষগণনার যাথার্থ্য ও সত্যাসত্য নির্ণয় করাই যাবে না। জ্যোতিষশাস্ত্র ঠিকই আছে। মুশকিল হলো জ্যোতিষগণনা নিয়ে, সঠিক অর্থে বলতে গেলে তার ভাষ্য এবং তার সমগ্রতার প্রশ্ন নিযে।

অভিরাম স্বামী জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিশ্চয়ই। না-হলে পাঠান-মোগলের মধ্যে শত্রু কে, এটা গণনা থেকে বুঝতে পারা তাঁর পক্ষে সহজ হতো না। তিনি কয়েক দিন যাবত গণনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন, দেখেছি আমরা। কিন্তু তিলোত্তমাকে তিনি এত বেশি ভালোবাসতেন যে খুব নিরাসক্তভাবে তিনি গণনাকার্য সম্পন্ন করতে পারেন নি এবং/অথবা 'মহৎ অমঙ্গল' দেখেই স্নায়ুর চাপে গণনায় অগ্রসর হয়ে সামগ্রিক বিচার ও ভাষ্য রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

যদি অভিরাম স্বামী নিরাসক্তভাবে বিচার করতে পারতেন এবং অমঙ্গলের আশঙ্কায় অধীর হয়ে না পড়তেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, তিনি এই সিদ্ধান্তে

পৌঁছতেন যে, যে-মোগল সেনাপতির দ্বারা তাঁর পরম স্নেহের তিলোত্তমার প্রাথমিক অমঙ্গল, সেই মোগল সেনাপতির দ্বারাই তিলোত্তমার পরিণামী মঙ্গল অনিবার্য। আমি জানি না, জ্যোতিষবিদ্যায় মহামহোপাধ্যায় নই, কিন্তু তিলোত্তমার ষষ্ঠ স্থান (সাধারণভাবে শত্রু ভাব) ও নবম স্থানের (সাধারণ-ভাবে ভাগ্য ভাব) অধিপতি কি একই গ্রহ ছিল ? অথবা ভাগ্যাধিপতি নীচস্থ ? অথবা, তুঙ্গী কিন্তু দুঃস্থানগত ? মনে রাখতে হবে, নবম থেকে পিতৃভাবও বিচার্য ! আবার, পিতৃ ও ভাগ্যস্থান অশুভগ্রহ দৃষ্ট ছিল ? যুগপৎ শুভ ও অশুভ গ্রহ দ্বারা বেষ্টিত ছিল ? অথবা মহাদশা-অন্তর্দশার টানাপোড়েনের সময় তার প্রথমে ভাগ্যবিপর্যয় পরে ভাগ্যোন্নতিযোগ ছিল ? কত কিছুই না হতে পারে ! শনির সাড়ে-সাতী ছিল ? আমি দেখেছি, এ সময়ে অনেক মন্দ-এর ভিতর দিয়েও শেষ পর্যন্ত ভালোও হয় ! অবশ্য, পুরো রাশিচক্র ছাড়া বেশি দূর অনুমান সম্ভবই নয়। সপ্তমভাব অর্থাৎ দাম্পত্য স্থানের শুভাশুভ বলাবলও তো দেখতে হবে ?

আমার অন্তত সন্দেহ নেই, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও জ্যোতিষ-বিচারপূর্বক নির্ভুল ফলাদেশ—এ দুটির শুভযোগ সব সময়ে ঘটে না। এর জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনুচিত। বঙ্কিমচন্দ্রও কি তাই মনে করতেন ?—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত জ্যোতিষভাবনা বিশ্লেষণ করে আমার তো এই ধারণাই হয়েছে।

মাধবাচার্য বলিতে লাগিলেন, 'কয়মাস পর্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি, গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।'

হে। কি প্রকার ?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবন সাম্রাজ্য ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কত কালেই বা তাহা হইবে ? আর কাহা কর্তৃক ?

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক।

হে। তবে আমার জয়লাভের কোথা সম্ভাবনা ? আমি তো বণিক্ নহি।

মা। তুমিই বণিক্। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে?

হে। আমি তখন বণিক্ বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক্। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আচার্য। প্রথম খণ্ড : মৃণালিনী।

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস না-হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। এ বই তাঁর পরিণত শক্তিকে ততটা প্রকাশ করে নি। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থে তাঁর বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় পেয়েছি। কতগুলি কথা বারবার কারণে-অকারণে ব্যবহার করার ফলে ক্রমশই সেগুলির জোর অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। 'জ্বলন্ত দেশপ্রেম' শব্দদুটিও তেমনি বহুব্যবহারের অত্যাচার সহ্য করে এখন অনেকটা দুর্বল। তবু যদি শব্দ দুটির প্রাথমিক জোর মনে করতে চেষ্টা করি, তা হলে যথার্থভাবেই বলা চলে, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও তাঁর 'জ্বলন্ত দেশপ্রেম' বিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ধ্রুবপদ কী, মাঝে মাঝে তা ভেবেছি। প্রেম, মানবতা, ঈশ্বরচেতনা, দেশপ্রেম : অনেক বৈশিষ্ট্যের কথাই এ-প্রসঙ্গে মনে হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত, অনেক সময়েই মনে হয়েছে, বঙ্কিমসাহিত্যের ধ্রুবপদ বুঝি এই দেশপ্রেমই!

আমার এই বক্তব্যটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এখানেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না, কিন্তু তবু বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, বিভিন্ন উপন্যাস, কমলাকান্ত চিহ্নিত রচনাবলীর ধ্রুবপদ, আমার মনে হয় ঐ একটিই, দেশপ্রেম। স্বভাবকবি ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন, 'ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ'। ভাওয়ালের জায়গায় 'বাংলা'-দেশ বসিয়ে দিলেই এই ছত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে চিহ্নিত করা চলে অনায়াসেই। এ-দেশকে, বাংলাকে, এমন প্রচণ্ড ও অতুলনীয় আবেগের সঙ্গে, আর কোনো বাঙালী কখনও ভালোবেসেছেন বলে জানি না। ভারতপ্রেমিক (বঙ্কিমসহ) অনেক পেয়েছি, বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের সবচেয়ে বড়ো গর্বের ধন, কিন্তু এমন তীব্র, বঙ্গপ্রেমিক আর দ্বিতীয় নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অতুলনীয় দেশপ্রেমের প্রথম বাধাবন্ধহীন প্রকাশ এই 'মৃণালিনী' উপন্যাসে। সেইজন্য, মৃণালিনী তাঁর শ্রেষ্ঠ বা সর্বাধিক পরিণত উপন্যাস না-হলেও এ বই যে তাঁর বিশিষ্ট সৃষ্টি, এ বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই। আমাদের উদ্ধৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, মাধবাচার্য সমগ্র বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎগণনায় কালাতিপাত করেছেন। হেমচন্দ্র, তাঁর শিষ্য, তাঁকে যখন দেশোদ্ধার-চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন' তখন 'যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয় লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মৃণালিনী পাখী আমি তোমারই জন্যে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার পরম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছু দিনের জন্য মনঃপীড়া দিতেছে।'

তা-হ'লে পাঠক, লক্ষ্য করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের প্রথমতম পরিচ্ছেদেই যে-আচার্যকে (পরিচ্ছেদটির নামও 'আচার্য') আপনি পেলেন, উপন্যাসের সমগ্র বিকাশ ও পরিণামকে তিনি বেঁধে দিলেন তাঁর জ্যোতিষগণনা ও ফলাদেশ দ্বারা। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও জ্যোতিষগণনা বিষয়ে গবেষণা করতে বসে অভিপ্রেত অর্থে বঙ্কিমসাহিত্যকে ব্যবহার করছি না। বঙ্কিমসাহিত্য আদ্যন্ত জ্যোতিষভাবনায় স্পন্দিত। এ সত্য কেন যে আর কেউ এর আগে লক্ষ্য করেন নি, তাই ভেবেই আমি বিস্মিত। মৃণালিনী উপন্যাসেই দেখুন, প্রবল তপ্ত প্রেমের অসহ্য জ্বালা আর অসহ্য সুখের কথা আছে, মানবতার জয়গাথা আছে, গভীর অধ্যাত্মচেতনাও আছে, দেশপ্রেম যে এর ধ্রুবপদ—তা-ও জানিয়েছি, কিন্তু এ সব কিছুকেই উপন্যাসের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রথিত করে রেখেছে লেখকের জ্যোতিষভাবনা। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপন্যাসের শেষাংশ থেকে (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: পরামর্শ: চতুর্থ খণ্ড) উদ্ধৃত করছি···সমস্ত আশাই তখন ধূলিসাৎ হয়েছে···দেশোদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হেমচন্দ্র গুরুসন্নিধানে এসেছেন উপদেশগ্রহণের জন্য···গৌড় তখন যবনের অধিকারে—

'মাধবাচার্য কহিলেন, 'বৎস! দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দেশ কখনও

বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে।...'

হেমচন্দ্র কহিলেন, 'তাহার অল্পই সম্ভাবনা।'

মাধবাচার্য কহিলেন, 'জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে। পূর্বদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়রাজ্য তো প্রকৃত পূর্ব নহে—কামরূপই পূর্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।'

উপন্যাসের সূচনা-অংশ ও প্রায়-শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত করে দেখালাম, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা কী ভাবে সম্পূর্ণ উপন্যাসের কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে। মধ্যবর্তী কাহিনী এই দুই প্রান্তিক বচনেরই গুরুত্ব প্রতিপাদন করছে।

মৃণালিনী উপন্যাসে আরো একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীসূত্র আছে। পশুপতি-মনোরমার কাহিনী। প্রবৃত্তির প্রবলতায় পশুপতির কর্তব্যবুদ্ধি, দেশপ্রীতি সব ভেসে গেছে। মনোরমার চরিত্র-বিশ্লেষণ বঙ্কিমসাহিত্যে তথা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম বৈপ্লবিক প্রয়াস। মনোরমার মনোবিশ্লেষণে লেখকের সাফল্য বিস্ময়কর, দেশকালের বিচারে। পশুপতি-মনোরমার কাহিনী উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ বলা যেতে পারে: অন্তত গল্পরস ও চরিত্রবিশ্লেষণের দিক থেকে। কিন্তু পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই অবাক্ হবেন, এই কাহিনী-অংশও দানা বেঁধেছে একটি অত্যন্ত সঙ্গত ও সম্ভাব্য জ্যোতিষবচনকেই কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রায় শেষাংশে এসে এই জ্যোতিষবচনটি পাঠক জানতে পারেন। তার আগে পশুপতি-মনোরমার জটিল কাহিনী ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে। মনোরমার প্রতি পশুপতির প্রচণ্ড জৈবিক আকর্ষণ, পশুপতির সম্পর্কে মনোরমার দুর্বোধ্য রহস্যময় ব্যবহার, অনুরাগ-বিরাগ, সান্নিধ্যকামনা ও দূরত্বরচনা, সমস্ত জড়িয়ে বিচিত্র মানব-ভাগ্যনিয়তি সমগ্র দেশের ভাগ্যের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সম্পর্ক রচনা করে ... কাহিনীর শেষ পর্যায়ে পশুপতি যখন মনোরমাকে আলিঙ্গনের জন্য উদ্যতবাহু এবং তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, তখন মনোরমা তীব্র কটাক্ষের সঙ্গে পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করলো 'পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?'

এত তীব্র নাটকীয় সংরাগে উপন্যাসের এই অংশটি পাঠকের চিত্তকে মথিত

করে মুহূর্তে লুঠ করে নেয়। পশুপতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাকেও স্তব্ধ বিস্ময়ে যে তীব্র নাটকীয় চমকের সম্মুখীন হতে হয়—তারও প্রাণ ও প্রেরণা জ্যোতিষবচন। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য জ্যোতিষবোধের ও জীবনবোধের আলোকে বঙ্কিমসাহিত্য দীপ্যমান। আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন ও জ্যোতিষভাবনার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই। জ্যোতিষভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত। এই সম্বন্ধ যান্ত্রিক নয়। এর প্রকৃতি ভাসা-ভাসা বা আল্‌গাও নয়। এ যোগ জৈবিক।

পশুপতি মনোরমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পাঠক-পাঠিকাও। 'মনোরমা বলিতে লাগিল : একজন জ্যোতির্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায় অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন্‌কালে না পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল। এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে কেশব আচার্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি, কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।

আচার্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।'

প। 'এখন সে কন্যা কোথায় ?'

মতিবিবি ওরফে লুৎফউন্নিসা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমারের 'তুমি কে ?' প্রশ্নের উত্তরে '…যবনীর নয়নতারা আরও বিস্তারিত হইল। কহিলেন, 'আমি পদ্মাবতী।' নবকুমারের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলতে হয়েছিল—'আমি পদ্মাবতী।'

পশুপতি যখন মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এখন সে কন্যা কোথায়?' অর্থাৎ তার স্ত্রী কোথায়?—তখন

ম। আমিই কেশবের মেয়ে—জনার্দন শর্মা তাঁহার আচার্য।

তার পরে উভয়ের বিস্তারিত কথোপকথন আছে। পশুপতি জিজ্ঞাসা করেছে, মনোরমা তাকে সব কথা আগে বলে নি কেন। মনোরমা অনেক যুক্তি দিয়েছে, তার চরম ও শেষ কথাটা :

মনোরমা।...জ্যোতির্বিদের গণনা?

পশুপতি। আমি গ্রহশান্তি করাইতাম।......

কিন্তু আমরা জানি, জ্যোতিষগণনা নির্ভুল হলে জ্যোতিষবচন ফলবেই। তাই, 'মৃণালিনী' উপন্যাসের শেষতম পরিচ্ছেদ 'অন্তিমকালে' মনোরমা নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহন করিলেন।'—অর্থাৎ মনোরমা 'সতী' হলেন।

নব্যভাবের যে সব ভাবুক নারীস্বাধীনতার বোরখায় ঢেকে নিজের স্ত্রী-সহ সমগ্র নারীজাতিকে বিবিধ প্রকার বৈষয়িক আত্মোন্নতির কাজে লাগান, তাঁরা যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলবেন না! 'মৃণালিনী' উপন্যাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত—মূলত কাহিনীমাত্র! বিশেষ কালের দেশাচারের ছাপ সেই কাহিনীতে না থাকলেই অস্বাভাবিক হতো।

জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলি।
বীহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সব মুখ পরস্পরে।
হইতে পারে

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস। উপন্যাস হিসেবে এর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গুণ নেই। একটি মিলনান্ত মধুর আখ্যানমাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে হলে, তাঁর মানসিকতা, তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনে জ্যোতিষ যে কী গভীর ও ধারাবাহিকভাবে মিশে ছিল, সেটা বুঝবার জন্য যুগলাঙ্গুরীয় আখ্যানটির প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব আছে। উদ্ধৃত পাঁচটি ছত্র যুগলাঙ্গুরীয়-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত। বলাই বাহুল্য, এটি ছিন্নপত্র। একটি

চিঠির এই ছিন্ন অংশ হিরণ্ময়ীর হাতে পড়েছিল। এর মানে হিরণ্ময়ী বোঝে নি। কিন্তু শঙ্কিত হয়েছিল সে। কাউকে কিছু না বলে তুলে রেখেছিল। নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, চিঠির বাকি অংশটি হিরণ্ময়ী পেল। দুটি অংশ মিলিয়ে নবম পরিচ্ছেদে যে পাঠ পাওয়া গেল, তা পড়ে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে পাঠককেও চমৎকৃত হতে হয়—

"(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর (পর্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।'

হ্যাঁ, যুগলাঙ্গুরীয় গ্রন্থে জ্যোতিষশাস্ত্রের সেই বিধানও জানা যায়। সেটুকু জানার এবং তৃপ্তিকর গল্পের রসগ্রহণের জন্য পাঠক এই ক্ষুদ্র আখ্যানটি পড়ে নেবেন, এই ভরসায় আমরা যুগলাঙ্গুরীয় প্রসঙ্গ দীর্ঘ করবো না। মেয়ের সঙ্গে পাত্রের কোষ্ঠীও বিচারপূর্বক বিবাহ দিলে এবং নিয়মবিধি পালন করে চলতে পারলে কত দাম্পত্যজীবনই রক্ষা পেতে পারতো। কিন্তু হায়রে! আনন্দস্বামীর মতো বিবেকবুদ্ধিসমন্বিত মহাপণ্ডিত সহৃদয় জ্যোতিষী কি এখন আছেন? পসার জমতে না জমতেই এখনকার জ্যোতিষীরা অনেক ডাক্তার উকিলের মতো দুর্মুখ হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই-উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতে থাকেন! জ্যোতিষীরা প্রায়ই ভুলে যান, ডাক্তার ও উকিলের মতোই তাঁদের কাছেও মানুষ ছুটে যায়, কিছুটা মানসিক শুশ্রূষার জন্যও। স্তোকবাক্য দিতে বলছি না, কিন্তু হে পণ্ডিত জ্যোতিষীগণ, যে প্রচুর সময়, নিষ্ঠা ও জ্ঞান নিয়ে নানা স্তরের বিচারবিবেচনা করে আপনার পক্ষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব, ততটা সময়, নিষ্ঠা দিয়ে গভীর জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা একটি রাশিচক্রের অসংখ্য দিক বিচারবিবেচনা করেই কি আপনি বলেন, 'সর্বনাশ! শনির সাড়ে-সাতী! শোক-দুঃখ, ঝঞ্ঝাট, আশা-ভঙ্গ ইত্যাদি?' সর্বনাশ, তাতে আর সন্দেহ কী? সর্বনাশ না-হলে, সাড়ে-সাতীর কুপ্রভাব শুরু না-হয়ে থাকলে, চিন্তাপীড়িত অসহায় মানুষটি আজ আপনারই কাছে গণনার জন্যে নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন না? আপনার ত্বরিত সিদ্ধান্তের পাল্লায় পড়ে তাঁর তো জানাই হলো না, চন্দ্রের উপর বৃহস্পতির শুভদৃষ্টি

তাঁকে এ বছরটা বহুলাংশে দুঃখবিপদ থেকে ত্রাণও করবে! এবং তাঁর মহাদশা অন্তর্দশাও অনুকূল বলে এই সময়ে ভাগ্যোন্নতিও সুনিশ্চিত। তবে হ্যাঁ, সেটা হয়তো উদ্বেগের মধ্য দিয়েই ঘটবে। তাতে ক্ষতি কী?

আপনি যথার্থ জ্যোতিষীই যদি হন, আপনি একজন দার্শনিকও। আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলুন, মূল্য না দিয়ে জীবনে কিছুই লাভ করা যায় না। তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলুন, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট একজন মহান্ জ্যোতিষীর জ্যোতিষজ্ঞান ও জীবনবোধের সমন্বয়প্রসূত গভীর জ্ঞান থেকে বলুন ··

'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে। যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।'—দলনীর কি হইল। তৃতীয় পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় খণ্ড। চন্দ্রশেখর।

জ্যোতিষীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে, পাঠক, আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চন্দ্রশেখর-এ চলে এসেছি। সত্যি বলতে কী, শুধু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর জ্যোতিষজ্ঞান ও জীবনদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করা সম্ভব। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আরো দুটি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের আছে: সীতারাম ও রাজসিংহ।

উপরের উদ্ধৃত অংশটি ব্রহ্মচারীরূপী মহাজ্যোতিষী চন্দ্রশেখরের স্বগতোক্তি। বিপন্ন দলনীবেগমের সমস্যা শুনে কথাগুলি ব্রহ্মচারীরূপী চন্দ্রশেখর 'মনে মনে ভাবিলেন!'

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ তো ভস্ম হয় না।'—আমি বারবার বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন তত্ত্বসর্বস্ব জ্যোতিষকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর জ্যোতিষানুরাগ তাঁর জীবনানুরাগকে গভীর করেছে, তাঁর জ্যোতিষজ্ঞান তাঁর জীবনদর্শনকে সমগ্রতা দান করেছে।

চন্দ্রশেখর জানেন, দলনীর শূন্যময় পরিণাম, তবু তিনি ভাবলেন,' ·· · পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে। যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।' —এই হলো প্রকৃত জ্যোতিষীর কাজ! জ্যোতিষজ্ঞান থাকলেই হয় না। মানবপ্রীতি থাকা দরকার। চন্দ্রশেখরের তা পূর্ণমাত্রায় ছিল।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'য় শৈবলিনী-প্রতাপের বাল্যপ্রণয় থেকে শুরু করে সংক্ষেপে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের বিবাহ পর্যন্ত বর্ণিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি এখানেই পাই: 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।'

প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদেই গল্পের ইতিহাস-অংশের জটিলতার সূচনা ও বিস্তার। ইংরেজের সঙ্গে মীরকাসেমের সংঘর্ষ আসন্ন। তাঁর প্রিয়তমা বেগম দলনী আবদার ধরলো, যুদ্ধের সময় সে মীরকাসেমের সঙ্গেই রণক্ষেত্রে থাকবে। মীরকাসেম এতে সম্মত হলেন না।

"দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন, বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, তবে কলমদান দাও।......মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিলেন?

মীরকাসেম বলিলেন, যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্সিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?

মীরমুনসি তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।"

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে এই যে ক'টি ছত্র উদ্ধৃত করলাম, এগুলির গুরুত্ব বঙ্কিমসাহিত্যের সমালোচকদের, উপন্যাসটির পাঠক ও সমালোচকদের তো বটেই, উপলব্ধি করতেই হবে। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যদিও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গুরগণ খাঁকে লেখা দলনীর চিঠি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন' তবু আমার উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য-

সূত্রেই দলনী-শৈবলিনীর অদৃষ্ট এবং সমগ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসের অদৃষ্ট চিরতরে নির্ধারিত হয়েছে।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য সূত্রাকারে সাজাচ্ছি :

১. দলনী-মীরকাসেম আখ্যানাংশ ও শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর (-প্রতাপ) আখ্যানাংশ অর্থাৎ চন্দ্রশেখর গ্রন্থের ইতিহাস-অংশ ও উপন্যাস-অংশ উদ্ধৃত ছত্রগুলির সুবাদেই অবিরোধে মিশে গেল।

২. চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে নিয়ে আসার জন্য নবাবের লোক গেল। এই একটি ঘটনায় উপন্যাসের অনেকগুলি দিক লেখক তৈরি করে ফেললেন।

(ক) চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর জীবনতৃষ্ণা মেটানোর সংকল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গ্রাম ছেড়ে সাময়িকভাবে চলে যেতে হলো। চন্দ্রশেখরের সংকল্প কার্যকর হলে, চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন গড়ে উঠলে গ্রন্থের উপন্যাস-অংশের জটিলতা সৃষ্টি হতো না। শৈবলিনী প্রতাপ বা চন্দ্রশেখর নয়। শৈবলিনীর পক্ষে সুখ দুর্লভ হতো না।

(খ) চন্দ্রশেখর গ্রামে থাকলে শৈবলিনী হরণ সহজ হতো না। তিনি চলে যাওয়ায় তা' সম্ভব ও সহজ হলো।

৩. জানা গেল বাংলার নবাব মীরকাসেম জ্যোতিষগণনায় সুদক্ষ ছিলেন। যুদ্ধের মুখেই এই গণনা কি তাঁকে নিস্তেজ করলো ?

৪. দলনী-মীরকাসেম সম্পর্কের গভীরতা বোঝানো হলো। পরে তাদের ট্র্যাজেডির তীব্রতা, এর ফলে, স্পষ্ট হবে।

৫. জানা গেল, সেকালেও এদেশে জ্যোতিষগণনায় সাধারণ-অসাধারণ সর্বশ্রেণীর লোকদের বিশ্বাস কতটা গভীর ছিল।

৬. শেষ কথা ও মোট কথা, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট-রচনার কৌশল ও অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য এই অংশটি থেকেই স্পষ্ট হয়। জ্যোতিষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ যে মাত্র ভাসা-ভাসা নয় এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ যে নিতান্ত সাধারণভাবে উত্থাপন করতেন না, আর সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের মূলে তাঁর জ্যোতিষভাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যে অসামান্য,—এ সবই আমার উদ্ধৃত অংশটি থেকে প্রতিপন্ন হয়।

প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ :

'চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্মচারীকে বলিলেন,

মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না। রাজকর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন মহাশয়?

চন্দ্রশেখর বলিলেন, সকল কথা—গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।'

চন্দ্রশেখরের কথা শুনে সুচতুর রাজকর্মচারী তার যা বুঝবার বুঝে নিয়েছিল। অর্থাৎ বুঝেছিল, চন্দ্রশেখর গণনানিপুণ। কিন্তু, গণনাফল নবাবের পক্ষে প্রীতিকর হবে না জেনেই চন্দ্রশেখর তা প্রকাশ করছেন না।

চন্দ্রশেখর রাজপুরুষের মন্তব্যের উত্তরে কিছু বলেন নি। এই ছত্রগুলি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনার পরিচয়ই শুধু পাই না, চন্দ্রশেখরের তিনটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বঙ্কিমের জীবনদর্শনের গূঢ় সমাচারও নিহিত আছে।

'সকল কথা গণনায় স্থির হয় না'—কথাটা অতি বড় জ্যোতিষীও স্বীকার করবেন। কিন্তু কোন্ অর্থে? এতে কি শাস্ত্র হিশেবে জ্যোতিষের সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয়? না, তা-ও নয়। আসলে, দলনীর সঙ্গে নবাবের বিচ্ছেদ ও দলনীর শোচনীয় পরিণাম (নবাবেরই সক্রিয়তায়) জ্যোতিষবিচারে অনিবার্য বলে দেখা গিয়েছিল। গণনাকালে এটা এতই অসম্ভব ও অকল্পনীয় বলে প্রতিভাত যে, মীরকাসেম নিজ গণনায় আস্থা রাখতে না পেরে অনেক বড়ো জ্যোতিষী বলে চন্দ্রশেখরকে দিয়ে 'গণাইতে' চেয়েছিলেন আর চন্দ্রশেখর তাঁর নির্ভুল বিচারে যা দেখতে পেলেন, তার শোচনীয়তা অনুভব করে আন্তরিকভাবে চাইছিলেন তাঁর জ্যোতিষবিচার না ফলে ঈশ্বরের দয়ায় একটা অন্য কিছু ঘটুক। তা ছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত্র যতই নির্ভুল হোক্ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও করুণাও তো অশেষ। আর জ্যোতিষী তো মানুষ। জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভুল হলেও জ্যোতিষগণনায় তো ভুল থেকে যেতে পারে। চন্দ্রশেখর জানতেন, তাঁর ভুল হয় নি। কিন্তু তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন, তাঁর এই গণনা ভুল প্রতিপন্ন হোক্।

জ্যোতিষী তো মানুষ! মানুষ কি মানুষের অভাবনীয় শোচনীয়তা সহ্য করতে পারে? তাই সে নীরব থাকে কখনো-সখনো।

চন্দ্রশেখর প্রকৃত জ্ঞানীপুরুষ। অল্পবিদ্যাই ভয়ঙ্করী। তাই, কত কম জেনে, জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে যাঁরা নুড়ি মাত্র সংগ্রহ করেছেন, তাঁরাই পলকে কোষ্ঠী বিচার করে জিজ্ঞাসু সাধারণকে কখনো

হর্ষবিহ্বল করে তোলেন, কখনো বা মুহূর্তে দেন নিভিয়ে! অথচ ঐ সব আপ্তবাক্যের কতটুকুই বা মূল্য?

সব কথা গণনায় স্থির হয় না। 'যদি হইত তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত'—ঠিক কথা। মানুষ সর্বজ্ঞ নয়। এই সঙ্গত বিনয়টুকু পরম জ্ঞানী ব্যক্তিরও থাকা উচিত। কারণ, জ্ঞানমাত্রেরই সীমা আছে। সর্বশাস্ত্র পাঠ করলেও শাস্ত্রাতিরিক্ত জগৎ ও জীবনবোধের অনেক কিছুই অজ্ঞাত থেকে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আশ্চর্য মনীষার দ্বারা বিচিত্র বিষয়ের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তার পরিচয় পাই তাঁর বিবিধ প্রবন্ধাবলীতে। এ্যাসট্রনমিও তাঁর জিজ্ঞাসার অন্যতম বিষয়। তবু বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, জীবনের অতল রহস্যের কোনো ঠিকানা পাওয়া সহজ নয়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেই জীবন রহস্য সন্ধানের পরিচয় আছে। কিন্তু হায়, মানুষ যে সর্বজ্ঞ নয়। জগতের ও জীবনের রহস্যভাণ্ডারের চাবিকাঠি তার নাগালের বাইরে।

তবু, বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে সে-রহস্য উদ্‌ঘাটনের অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। জ্যোতিষভাবনার মাধ্যমে জীবনকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জ্যোতিষের সাহায্যেই কি জীবনের সকল রহস্য ভেদ করা সম্ভব?

জ্যোতিষভাবনার গভীর পর্যায়ে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশয়মুক্ত হতে পারেন নি। বরং এই সংশয়মুক্তি লক্ষণীয় যে, না, গণনায় সকল কথা স্থির হয় না। মনুষ্য সর্বজ্ঞ নয়।

চন্দ্রশেখর বলেছেন, 'বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।' —এই উক্তির ব্যাখ্যা একেবারে অবান্তর নয়। চন্দ্রশেখর দলনী-মীরকাসেমের শোচনীয়-ভবিষ্যৎ, গণনাদ্বারা যা পেলেন, প্রকাশ করতে চান না। তাই এহেন উক্তি করেছেন। কিন্তু জ্যোতিষেই শুধু নয়। মূল কথাটা, আমি 'অপারদর্শী'। আমি পারি না। জীবনের সব কথা জানি না। জানতে পারি না। কী করে বলবো? আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। জ্যোতিষ একটি বিশেষ শাস্ত্র। কিন্তু জ্যোতিষ যা নিয়ে কাজ করে, সেই সমগ্র মানবজীবন, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং নির্ভুল গণনা কি মানুষের সাধ্য? সত্যি বলতে কি, ঐ যে 'জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী' কথাটার যে-অর্থ রাজকর্মচারী বুঝেছিল, সেটাই শেষ কথা নয়। চন্দ্রশেখর কোনো মন্তব্য করেন নি তার উত্তরে। তিনি

অনেক জেনেও, গণনানিপুণ হয়েও জানতেন, জ্যোতিষে পারদর্শিতা দাবি করা আর নিজেকে সর্বজ্ঞ বলে জাহির করা একই কথা।

দলনীর শোচনীয় ভবিতব্য খণ্ডন করা অসম্ভব বুঝেও ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, 'যাহা কর্তব্য তাহা অবশ্য করিব'। এই হলো বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন। এখানেই অদৃষ্টবাদী বঙ্কিমচন্দ্র নিছক অদৃষ্টবাদী না হয়ে জীবনবাদী। জীবনবাদী : এই হলো বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ পরিচয়।

চন্দ্রশেখরকে বড়ো জ্যোতিষী ও জ্ঞানীপুরুষরূপে অঙ্কিত করলেও মানুষ হিশেবে তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা অর্থাৎ তাঁর ভাগ্যের পরিহাস বঙ্কিমচন্দ্র কখনই গোপন করেন নি। নিদ্রিতা শৈবলিনীর দিকে তাকিয়ে-আত্মগ্লানি-জর্জর চন্দ্রশেখরের চিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন। শুধু তাই নয়। বিপন্ন দলনীর আত্মপরিচয় পেয়ে চন্দ্রশেখর যখন ভাবছিলেন 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে…' ইত্যাদি, তখন লেখকের মন্তব্যটিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ: 'হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ তো ভস্ম হয় না।'

'সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ তো ভস্ম হয় না'—এই বোধ, জীবনের কাছে এই অঙ্গীকার থেকেই জ্যোতিষভাবনার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় উক্তি ও মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবোধ কী গভীর ছিল।

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরকে রমানন্দ স্বামী যে মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন, তার মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যাবে। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের সারাৎসার বোধ হয় এই পরিচ্ছেদেই মন্ত্রবৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কী সেই মন্ত্র? বড়ো জ্যোতিষী ও জ্ঞানী হয়েও চন্দ্রশেখরকে এই মন্ত্র গ্রহণ করতে হলো কেন? চন্দ্রশেখর চরিত্রটি কি বদলে গেল এই অংশে এসে? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার রচনা করার ইচ্ছা। কিন্তু তার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনার আরো কিছু পরিচয় গ্রহণ করার জন্য, স্থান সংক্ষেপ বলে রজনী উপন্যাসটি বাদ দিলেও, আমাদের প্রথমে দিল্লি, পরে পূর্ববাংলার ভূষণা নগরীতে যেতে হবে। এই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমাও সংক্ষেপে সারতে হবে।

প্রথমে দিল্লি।

'নগরের মধ্যে বড় গুল্‌জার চাঁদনী-চৌক।

সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে, গায়িতেছে, কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে, প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা 'জ্যোতিষী'দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্বিদগণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে তাঁহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অতিশয় বশীভূত ছিলেন, তাঁহাদের গণনা না জানিয়া অনেক সময়ে অতি গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।······

'দিল্লির চাঁদনী-চৌকে, জ্যোতিষীগণ রাজপথে আসন পাতিয়া, পুথি পাঁজি লইয়া, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন,-শত শত স্ত্রীপুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে, পরদানশীন বিবিরাও মুড়িসুড়ি দিয়া যাইতে সংকোচ করেন না।

'একজন জ্যোতিষীর আসনের চারি পাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে একজন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—ইতস্তত দেখিতেছে। এমন সময়ে সেই স্থান দিয়া, একজন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল। অশ্বারোহী যুবা পুরুষ·········'

প্রথম পরিচ্ছেদ। অদৃষ্টগণনা। নন্দনে নরক: দ্বিতীয় খণ্ড। রাজসিংহ।

রাজসিংহ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অদৃষ্টগণনা নামের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত এই অংশে ঐতিহাসিক উপন্যাসটির রবীন্দ্রনাথকথিত উপন্যাস-অংশের যথার্থ সূচনা। দরিয়া—প্রতিনায়িকা, পরে মবারক—নায়কের প্রবেশ এই দৃশ্যে। রাজসিংহ গ্রন্থটিকে বহিরঙ্গ লক্ষণবিচারে উপন্যাসই বলতে হয়, কিন্তু মেজাজের দিক থেকে 'রাজসিংহ' নাট্যগুণসম্পন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসই নাট্যগুণসম্পন্ন। রাজসিংহ প্রায়-নাট্যোপন্যাস।

দরিয়া মবারককে ঘোড়া থেকে নামাল। এবং বললো: 'এই ভিড়ের

ভিতর একজন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন। ইহার মত জ্যোতির্বিদ্ কখন নাকি আসে নাই। ইহার কাছে তোমাকে তোমার কেসমৎ গণাইতে হইবে।'

লেখক এখনও পর্যন্ত দরিয়া-মবারকের সম্পর্ক প্রকাশ করেন নি। মবারক একজন সম্ভ্রান্ত পদস্থ মোগল। তাকে সবাই পথ ছেড়ে দিল। দরিয়া সঙ্গে গেল।

"জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, 'আপনি গিয়া বিবাহ করুন।' পশ্চাৎ হইতে, ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, 'করিয়াছে'।

জ্যোতিষী বলিল, 'কে ও কথা বলিল ?'

মবারক বলিলেন, 'ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কী রকম বিবাহ হইবে ?'

জ্যোতিষী বলিল, 'আপনি কোনো রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।'

মবারক বলিল, 'তাহা হইলে কী হইবে ?'

জ্যোতিষী উত্তর করিল, 'তাহা হইলে, আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, 'আর মৃত্যু'।

জ্যোতিষী বলিল, 'কে ও ?'

মবা। সেই পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি উপক্রমণিকার মতো। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য এই প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই বস্তুত কাহিনীর আরম্ভ।

মবারক-দরিয়া ও জ্যোতিষী-কথিত রাজপুত্রীর (এ ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীব কন্যা জেবউন্নীসা) উপন্যাস-অংশ এখান থেকেই শুরু হলো। পরিচ্ছেদের নাম অদৃষ্টগণনা। মবারকের অদৃষ্টগণনা হলো। আসলে এই সূত্রে অদৃষ্টগণনা হয়ে গেল মবারক-দরিয়া ও এখনও নেপথ্যচারিনী জেবউন্নীসারও। রাজপুত্রীকে বিবাহ করতে হলে জেবউন্নীসার সঙ্গে মবারকের বিবাহ হবে ধরে নিতে হয়। পদবৃদ্ধি তাহলে নিশ্চিত। এবং দরিয়ার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে মবারকের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। দু'টি আপাত-অসম্ভব ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস-অংশের সূত্রপাত হলো। মবারকের পক্ষে ঔরঙ্গজীব কন্যা

জেবউন্নীসাকে বিবাহ করা এবং মবারকের মৃত্যু : এই মুহূর্তে এর কোনোটারই বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আর একটা টেনশন্ বা আততির বিস্তার হলো : রাজপুত্রীকে বিয়ে করলে যদি পদবৃদ্ধিই হয়, তাহলে মবারকের মৃত্যু কী করে হবে ?

রাজপুত্রীকে বিয়ে করা ও পদবৃদ্ধির কথা জ্যোতিষী বলেছে। দরিয়া বলেছে, মবারকের মৃত্যুর কথা। মবারক বলেছে, দরিয়া পাগলী। জ্যোতিষী বলেছে, পাগলী নয়। বোধ হয় মানুষ নয়। আসলে, জ্যোতিষী গণনার ভালো দিকটার কথাই মবারককে বলেছিল, ট্র্যাজেডির দিকটা নয়। কিন্তু দরিয়া যা বললো, জ্যোতিষীও তার বিচারে তাই পেয়েছে, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। এখন প্রশ্ন, জ্যোতিষী হস্তরেখা গণনা করতে পারে, সে না-হয় মবারকের কেস্‌মৎ জানতে পারে, কিন্তু দরিয়া কী করে জানলো ?

মবারক যে বিয়ে করেছে এর আগেই, সেটা দরিয়া জানতেই পারে, কেননা দরিয়াই মবারকের প্রথমা বিবি। কিন্তু দরিয়া কী করে জানলো, জেবউন্নীসাকে বিয়ে করলে মবারকের পদোন্নতি হলেও সেই সঙ্গে মবারকের মৃত্যুও হবে ?

মনে হতে পারে, ঔরঙ্গজীবের পদ্ধতিই তো তাই। মবারক বাদশাজাদীকে বিয়ে করলে নিজেরই প্রেস্টিজের খাতিরে জামাতাকে প্রমোশন দিতেই হবে আর ক্রোধ নিবারণের জন্য জামাতাকে হত্যাও করতে হবে। দরিয়া কি তাই ভেবেছিল ?

নিশ্চয়ই না। রাজসিংহ-এর পাঠক জানেন, তা নয়। তা-হলে ?

আসলে দরিয়াই মবারকের নিয়তি। তারই নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে মবারককে মরতে হবে। মরতে হয়েছিল। দরিয়া কি মবারককে গুলি করে হত্যা করার কথা তখনই ভেবে নিয়েছিল ? না, তা-ও নয়। সেটাও সেই মুহূর্তে স্বাভাবিক ছিল না। দরিয়ার তীব্র ক্ষুব্ধ বঞ্চিত প্রেম স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে উপন্যাসের উপসংহারে, একথা তখনই কী করে জেনে ও বুঝে ফেলবে দরিয়া ? মনে রাখতে হবে, যার হস্তনিক্ষিপ্ত গুলিতে মবারক প্রায়-স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছিল, 'সে উন্মাদিনী দরিয়া'। মবারক দরিয়াকে বরাবর 'পাগলী' বলে চিহ্নিত করেছে, আর জ্যোতিষী বলেছিল, পাগলী নয়। বোধ হয় মানুষও নয়। এ কথার তাৎপর্য, দরিয়াকে পাগলী বলে উপেক্ষা করাও যায় না, আবার সাধারণ মানুষও, সাধারণ নারীও সে

নয়। দরিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে কোনো সহজগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন। কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে জীবনের সব অঙ্কই কি মেলানো যায়? মবারকের প্রতি যে তীব্র প্রেম পোষণ করেছে, দরিয়া তার বিনিময়ে পেয়েছে অপ্রত্যাশিত আঘাত, সেই যুগপৎ প্রেম ও লাঞ্ছনা নারীকেই একমাত্র করতে পারে দেবী বা দানবী, আর কেনই বা নয় দূরদর্শিনী? ভবিষ্যদ্বক্ত্রী? চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু সম্পর্কে মানুষের সব কয়টি ইন্দ্রিয় চাবুকের মতো সক্রিয় হয়ে ওঠে। নারীই বোধ করি এ ক্ষেত্রে পরম তৃতীয় নয়নটি লাভ করে—'ত্রিনেত্রাং পরাম্' মহামায়ার অংশসম্ভূতা নারী যখন পুরুষের জন্য মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দেয়, ত্রিলোকের কোন্ ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন?

দরিয়া সেই নারী। দরিয়াই নিয়তি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের পাঠক লক্ষ করবেন, এই অদৃষ্ট গণণা থেকেই, এই গণনাকে কেন্দ্র করেই শুধু যে উপন্যাস-অংশেরই সূচনা ও বিস্তার, তা-ই নয়, গ্রন্থের ইতিহাস-অংশের সঙ্গে উপন্যাস-অংশের সংযোগসাধনের মূলেও এই অদৃষ্টগণনা। এই গণনা মবারককে চঞ্চল ও উচ্চাশী করলো, এই গণনা দরিয়া বিবিকে যন্ত্রণায় প্রায় পাগল করে তুললো, সে স্বামীকে করায়ত্ত করার শেষ চেষ্টায় জেবউন্নীসার কাছে অদৃষ্টগণনার সব কথা বলে দিল, জানিয়ে দিল মবারক তারই স্বামী, জেবউন্নীসার ক্রোধবহ্নি ও ঈর্ষাবহ্নি যুগপৎ ফুঁসিয়ে উঠলো, দরিয়াই সংবাদ বিক্রি করতে গিয়ে অদৃষ্টগণনার সঙ্গে সঙ্গে রূপনগরের চঞ্চলকুমারীর বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের তসবির ভাঙার কাহিনীটা আদ্যন্ত শুনিয়ে দিল জেবউন্নীসাকে, জেবউন্নীসা উদিপুরীকে, উদিপুরী ঔরঙ্গজীবকে এবং পরিণামে রাজসিংহ-ঔরঙ্গজীব যুদ্ধ, যে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'রাজসিংহ'-এর বিভিন্ন উপাখ্যান ও চরিত্রের সৃষ্টি ও বিবর্তন, জেবউন্নীসার জন্মান্তর, মবারকের মৃত্যু, দরিয়ার উন্মত্ততা: এই সমস্তই এবং কত কিছুই ঘটে গেল—করুণ, মধুর, শোচনীয়, বিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য ঘটনা ও চরিত্রের সমবায়ে সৃষ্টি হলো রাজসিংহ উপন্যাসের কবিতা ও নাটক।

সমস্ত কিছুর প্রেরণা: চাঁদনীচকের জ্যোতিষের—ঐ অদৃষ্টগণনা।

আটটি খণ্ডে সমাপ্ত 'রাজসিংহ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের 'অদৃষ্টগণনা' সমগ্র কাহিনীর উপন্যাস-অংশের সূচনা ও বিস্তারের জন্য দায়ী এবং উপন্যাস-অংশের এই জটিলতা ইতিহাস-অংশেও সঞ্চারিত হয়েছে। এ

'অদৃষ্টগণনা' সমগ্র উপন্যাসকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা-ও দেখিয়েছি আমরা।

কিন্তু পঞ্চম খণ্ডের (অগ্নির আয়োজন) পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমাদের জন্য আরো একটি বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ পড়তে গিয়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠক-সমালোচকদের আরো একবার নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনাকে বাদ দিয়ে, উপেক্ষা করে, বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠ ও রসগ্রহণ কোনোটাই সম্ভবপর নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনাকে উপেক্ষা করে তাঁর জীবনদর্শনের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক পরিচয়লাভও অসম্ভব। এতদিন অর্থাৎ একশো বছর ধরে বঙ্কিমসমালোচনায় সেই ভুল চেষ্টাই করা হয়েছে।

সাহিত্যের সৃষ্টি থেকে শুরু করে পঠনপাঠন-রসগ্রহণ-সমালোচনার জন্য ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি-নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-দর্শন-ইতিহাস-অর্থনীতি প্রভৃতি কী যে প্রয়োজন আর কী নয়, তা বোধ করি নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এককথায় বলা যায়, এক্ষুনি যে-সব বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হলো, তার যোগফল একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ চরিত্রটিকে না-জেনে না-চিনে সাহিত্যসৃষ্টি ও পাঠ: কোনোটারই দুর্বল চেষ্টা করে লাভ নেই। দায়িত্বশীল, যথার্থ স্রষ্টা নিছক রসচর্চা করেন না। নিছক রসের চাষ অলস, দুর্বল, অক্ষম লেখকেরই লক্ষ্য হয়।

মবারক-দরিয়া-জেবউন্নীসার প্রণয়ত্রিভুজ দিল্লির চাঁদনী-চকের জ্যোতিষীর অদৃষ্টগণনায় কেঁপে উঠেছিল। মবারক-দরিয়া-জেবউন্নীসা-উদিপুরী-ঔরঙ্গজীব পর্যন্ত পৌঁছে সেই অদৃষ্টগণনা ব্যক্তির ভাগ্যকে এর আগেই রাষ্ট্রের ভাগ্যের সঙ্গে একই সুতোয় গেঁথে দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এতেও খুশি হন নি। গল্পের বাঁধুনি বা প্লটের এতটুকু শৈথিল্য বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করতে পারতেন না। তাই পঞ্চম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদয়পুরে রাণা রাজসিংহের অন্তঃপুরাভিমুখে যাওয়ার সময় নির্মলকুমারী একটা বাড়িতে লোকের ভিড় দেখে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ঐ বাড়িতে থাকেন। হাজার হাজার লোক সেখানে গণনার জন্য আসে। ঐ জ্যোতিষী সমস্ত ধরনের সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেন এবং এতদিন যাকে যা বলেছেন, সবই মিলে গেছে। নির্মলকুমারীর শিবিকা জ্যোতিষীর বাড়িতে 'প্রবেশ করিল'।......'জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তুমি কি গণাইবে?......

নির্মল বলিল, 'আমার এক প্রিয়সখী আছেন।'

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, 'তার পর' ?

নির্মল বলিল, 'তিনি অবিবাহিতা'।

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, 'তার পর' ?

নির্মল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে ?

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কষিল। অনেক পুথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্মলের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

নির্মল বলিল, 'বিবাহ হইবে না ?'

জ্যোতিষী। প্রায় সেই রূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নির্মল। প্রায় কেন ?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।

'অসম্ভব বটে।' বলিয়া নির্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়া গেল।

আলোচিত ঐ অদৃষ্টগণনা পরিচ্ছেদটির পরে আবার এই অংশটি পড়তে গিয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটি জটিল প্রশ্নের মুখোমুখী না হয়ে পাঠক-সমালোচকের আর তো কোনো উপায়ই থাকে না। জ্যোতিষশাস্ত্র জানা না-ই থাক্, বঙ্কিমচন্দ্রকে এতটাই জ্যোতিষমনস্ক হতে দেখে এবং তাঁর উপন্যাসের প্লট ও চরিত্রের সঙ্গে জ্যোতিষভাবনার তথা অদৃষ্টচেতনার এই অদ্ভুত ধারাবাহিক সম্পর্ক লক্ষ্য করে পাঠককে ভাবতেই হয়: ব্যাপারটা কী ? বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে গ্রীক নাট্যকারদের ও শেকসপীয়রের মতো এতটাই নাটকীয় ও অদৃষ্টচেতনাময় ভেবেছিলেন ? আরো বেশি করে তা ভেবেছিলেন ? 'পুরুষকার' ও 'কর্তব্য' বোধের কথা তো তিনি অবশ্যই ভেবেছিলেন, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেই তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু, 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে ? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে।'—এই কি তাঁর প্রধান বা মূল কথা ? প্রধান বা মূল কথা তো নিশ্চয়ই ! শেষ কথাও কি ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধের উপসংহারে দিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।

আপাতত রাজসিংহ উপন্যাসের জ্যোতিষপ্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্যের উপসংহার রচনা করছি। আমাদের সর্বশেষ উদ্ধৃত অংশে দেখা গেল, নির্মলকুমারী উদয়পুরের জ্যোতিষীর কাছে চঞ্চলকুমারীর ভাগ্যগণনা করাতে গিয়ে যা জানতে পারলেন, তা বিস্ময়কর এবং অসম্ভবও বটে। এই দ্বিতীয় অদৃষ্টগণনাকে কেন্দ্র করে অতঃপর চঞ্চলকুমারী-নির্মলকুমারীর পরবর্তী কার্যধারা লক্ষণীয়। উপন্যাসের ইতিহাস-অংশেও অদৃষ্টগণনা সরাসরি তার প্রভাব বিস্তার করলো। এই অদৃষ্টগণনার জের রাজসিংহ-ঔরঙ্গজীবের যুদ্ধঘটনা পর্যন্ত প্রসারিত। পাঠক রাজসিংহ উপন্যাসের সমগ্র কাহিনী জানেন বা জেনে নিতে পারবেন। আমরা শুধু বলতে চাই, এই অদৃষ্টগণনার সূত্র ধরেই মানিকলালের সঙ্গে নির্মলকুমারীরও দিল্লি অভিযান এবং কাহিনীর জটিল গ্রন্থিগুলির ক্রমান্বয় বিন্যাস। আর লক্ষণীয়, জ্যোতিষশাস্ত্রের অসামান্যতা, জ্যোতিষীর গণনানৈপুণ্য, মানবজীবনে জ্যোতিষগণনার বিস্ময়কর প্রভাব : এবং এই সব কিছুতেই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরও গভীর প্রত্যয়। জ্যোতিষশাস্ত্র ও সে-সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞানকেই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্লট রচনায় ও চরিত্রবিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন, এইটুকু মাত্র নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে এই জ্যোতিষভাবনা তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে, প্রসঙ্গত এই সিদ্ধান্ত সচেতনভাবে, পুনরুক্তিদোষকে শিরোধার্য করেও পুনরায় নিবেদন করছি।

"তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতৃঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল, সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। * অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের 'প্রিয়' বলিতে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্য হইয়াছ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রথম খণ্ড। সীতারাম।

উদ্ধৃতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বড়ো আয়তনের উদ্ধৃতি ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। রচনার কলেবরবৃদ্ধি আমার লক্ষ্য নয়। আমি সংক্ষেপে লিখতে চাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের, তা-ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা ও তাঁর জীবনদর্শন প্রসঙ্গটি পরিস্ফুট করতে হলে কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাসের কিছুসংখ্যক নির্বাচিত উদ্ধৃতি ছাড়া, আমি কিছুতেই সব পাঠককে বুঝিয়ে উঠতে পারবো না, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা —বিশেষত তাঁর উপন্যাসের সূত্রে ও জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন, কোথায় ও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি উপন্যাসই, বিশেষত এই প্রবন্ধে আলোচিত উপন্যাসগুলি আরো অন্তত একবার পড়ে না নিলে, পাঠক-সমালোচক আমার সমগ্র বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব ও স্বীকার না-ও করতে পারেন।

সীতারাম উপন্যাস মুখ্যত শ্রী-সীতারামের বহুধা-জটিল জীবনসমস্যারই আলোচনা, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

শ্রীর ভাই গঙ্গারামের প্রাণরক্ষাপর্ব চুকে যাওয়ার পর সীতারাম যখন শ্রীকে সঙ্গে করে এগিয়ে দিতে চাইল, তখন শ্রী বলেছে—

'.........আমি সহধর্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয়দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই।...সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।'

এর পরেই সীতারাম শ্রীকে দৈবজ্ঞের উপরি-উদ্ধৃত গণনার কথা জানিয়েছে। অর্থাৎ দৈবজ্ঞের এই গণনাই হলো শ্রী-সীতারামের বহুধা-জটিল জীবনসমস্যার

কেন্দ্রবিন্দু। প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবে, শ্রী সম্বন্ধে জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎ-গণনাই শ্রীকে সীতারাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই বিচ্ছেদ না ঘটলে অনেক দিন পরে সম্পূর্ণযৌবন অনিন্দ্যসুন্দরমুখী শ্রীকে দেখে সীতারাম রায়কে তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে বলতে হতো না, 'তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!' তার পর থেকে, বিশেষত সীতারাম শ্রীকে দৈবজ্ঞের কথা জানানোর পর থেকে, দিনে দিনে ক্রমশ শ্রী সুদুর্লভ হয়ে উঠলো সীতারামের কাছে! সীতারাম শ্রীর রূপজ মোহে সম্পূর্ণ আবিষ্ট। অথচ শ্রী অপ্রাপণীয়া: অদৃষ্টগণনাই এর কারণ। সীতারামের প্রতি প্রগাঢ় পরিপূর্ণ প্রেম পোষণ করেও পাছে সীতারামের কোনো অকল্যাণ তার দ্বারা ঘটে, এই ভযে শ্রী যত দূরে সরে যেতে, সরে থাকতে চেয়েছে, নিয়তি ততই রূপজ মোহের আবরণে সীতারামকে গ্রাস করেছে, সীতারাম উন্মত্তের মতো শ্রীকে অধিকার করতে চেয়েছে, দস্যুর মতো তাকে ভোগ করতে চেয়েছে।

কিন্তু, হায়! তার আগেই সে শ্রীকে জানাতে বাধ্য হয়েছে, 'যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।' শুধু তাই নয়: পাঠক বিস্মিত অভিভূত না হয়ে পারেন না, যখন প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয় * লিখেই লেখক একটি তারকা চিহ্ন বসিয়ে পাদটীকায় উদ্ধৃত করেন এই শ্লোক, উৎস-নির্দেশিকাসহ—

> চন্দ্রাগারে খাগ্নিভাবে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তিজ্ঞস্য শিল্পে প্রবীণা।
> বাচাং পত্যুঃ সদ্গুণা সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥
>
> ইতি জাতকাভরণে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞান ও বিশ্বাসের সুনিশ্চিত প্রমাণ আরো একবার পাওয়া গেল। আর বোঝা গেল, সীতারাম উপন্যাসের বিয়োগান্ত পরিণাম অনিবার্য। জ্যোতিষবচন ফলবে কি ফলবে না, এই টেনশন্ যেমন পাঠকের মনে কাজ করতে থাকে, তেমনই পাঠকের হয়তো মনে পড়ে যায় গ্রীক ট্র্যাজেডির সেই ভাগ্যহত নায়কের কথা, যে জ্যোতিষীর অদৃষ্টগণনা থেকে জানতে পেরেছিল নিজের বিষয়ে দু'টি কল্পনাতীত শোচনীয় ফলাদেশ, সে পিতাকে হত্যা করবে এবং মাতার শয্যাসঙ্গী হবে: আর সেই আতঙ্কে ছুটতে ছুটতে সে পার হয় রাজ্য প্রান্তর পরিধি, আর হায়, এইভাবেই সে নকল মা-বাবার কাছ থেকে নিষ্ঠুর অন্ধ নিয়তির টানে সম্মুখীন তার জন্মদাতার এবং শেষ পর্যন্ত গর্ভধারিণীর। অয়দিপাসের সেই শোচনীয় পরিণাম, ভাগ্যহত জীবনের কাহিনী আমরা সবাই জানি।

ঠিক সেইভাবে, সীতারামের অকল্যাণ ঘটতে দেব না বলে শ্রী যতই সরে আসতে চেয়েছে, তত বেশি করে রূপতৃষ্ণা জেগেছে সীতারামের, আগুনের ঝড় উঠেছে তার রক্তে, বিষাক্ত হয়েছে তার চেতনা এবং আসন্ন হয়েছে তার ক্ষয়, পতন ও সর্বনাশ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের অন্তিম বাক্য দুটি হলো—'তখন দুইজনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও তারকাচিহ্নিত পাদটীকা যুক্ত করেন, 'হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে Accelerated Motion-কে শীঘ্রগতি বলে। দুইটি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন এক রাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

তথ্যটুকু যুক্ত করি। সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে শ্রী যখন জিজ্ঞাসা করে, জয়ন্তী হাত দেখতে জানে কী-না, তখন জয়ন্তী বলে, 'আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।'—তখন শ্রী ও সন্ন্যাসিনী পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামীর উদ্দেশে দ্রুত যাত্রা করলো। শ্রী ও জয়ন্তীর দ্রুতগতি চলার বর্ণনাপ্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।'

প্রাচীন ভারতীয় প্রাতঃস্মরণীয় জ্যোতিষশাস্ত্রীগণের লেখনী হাতে নিয়ে যেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম লিখেছেন। লেখনীটা যে শুধু ঔপন্যাসিকের নয়, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। লেখনীটা যে জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তার, এ বিষয়েও সন্দেহ থাকে না, যখন নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পড়ি—

"শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, 'তোমার কর্কট রাশি। (এখানে তারকাচিহ্ন দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পাদটীকায় লিখেছেন,

পরকনকশরীরো দেবনম্রপ্রকাণ্ডো
ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ।—কোষ্ঠীপ্রদীপে।

এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন)।

গুহার বাইরে এসে শ্রীর 'বাম হস্তের রেখা সকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা

দেখিয়া দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন 'তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।' (এখানেও তারা চিহ্ন এবং পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত ছত্রটি: 'জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ঞী ভবেদ্ভূপতেঃ')।

কিন্তু স্বামীই পরে বললেন,'......এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে * (এখানে তারাচিহ্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের টীকা: 'মকরে'। আমার টীকা—পাপগ্রহ শনি, শনির ক্ষেত্র মকর!) পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।' তা ছাড়াও স্বামী জানালেন, 'চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত'। এরই ফলে, শ্রী প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবে! অবশ্য, স্বামী তাকে এও জানালেন, শ্রীর অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তখন যেন শ্রী স্বামীসন্দর্শনে যায়।

এই প্রবন্ধের কোনো পাঠক যেন কল্পনাও না করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস জ্যোতিষশাস্ত্রের বচনাদির অনুপ্রবেশের ফলে এতটুকু নীরস নীরক্ত হয়ে উঠেছে। কেউ যেন ভুলেও না ভাবেন, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্ধ জ্যোতিষবিশ্বাস-কেই তাঁর উপন্যাসগুলিতে সবচেয়ে বড়ো আসন দিয়েছেন! না, জীবনরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তিনি নরনারীর জীবনসমস্যার অন্তরঙ্গ চিত্র রচনা করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছু তথ্য, আসলে তার সত্যটুকু নিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। তার সাহায্যে জীবন নামের অসহ্য সুখজ্বালাময় এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র রসে স্বাদে তুলে ধরেছেন শিল্পের শর্তে!

তাই জ্যোতিষগণনার পরে জয়ন্তী যখন শ্রীকে অন্য কিছুতে মন দিতে বললো, শ্রী বলেছে, স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামীসেবা। সেটাই যখন হলো না, তখন তার আর পুণ্য কিসে? এর পর শ্রী-জয়ন্তীর কথোপকথন সত্যিই উল্লেখযোগ্য। শ্রীর কথার পরে—

জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী, আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী, কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে। জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।

শ্রী স্বামীর কাছে কিছুই পায় নি। কেমন করে স্বামীকে এত ভালোবাসলো তবে? "জয়ন্তী বলিল, 'তোমার সঙ্গে তাঁর তো দেখা-সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভালবাসিলে কিসে?

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।"

তারপর শ্রীর সব কথা শুনে, কিন্তু না, শ্রী সব কথা বলতেই পারে নি—'শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। জয়ন্তীরও চক্ষু ছল-ছল করিল।'

জীবনরসের রসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন: 'এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী?'

সীতারাম-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ-এ পূর্বকথামতো গঙ্গাধর স্বামীর সঙ্গে দেখা করে জানা গেল, এই বার শ্রী যেতে পারে স্বামীসন্দর্শনে। সঙ্গে জয়ন্তী। 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' কথাটা কি তখনও শ্রীকে ভয় দেখায়? না। শ্রী জয়ন্তীকে বলে—

'কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক্ পরের হাতে হউক তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না……'তিনি' যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে, আমারই হাতে…তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে?……

কিন্তু শ্রীর এই অনাসক্তি স্থায়ী হয় নি।

শ্রীর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসিনী থাকতে দেন নি। বস্তুত শ্রী যথার্থ সন্ন্যাসিনী কখনই হতে পারে নি। অবস্থাগতিকে তাকে সন্ন্যাসিনী সাজতে হয়েছে। কিন্তু তার মর্তপ্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় নি। তা বাইরে প্রতিহত হয়ে অন্তরে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে মাত্র। তাই

সন্ন্যাসিনীর অনাসক্তি নিয়ে সীতারামের কাছ থেকে নিজেকে যতবার সরিয়ে নিয়েছে, ততবারই নিজের ও সীতারামের দু'জনেরই ক্ষতি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত শ্রী পতনের সর্বশেষ সোপানে দণ্ডায়মান "সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?'

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তবু, তার শেষ পুণ্য কাজ এই যে, সীতারাম সপরিবারে প্রাণে বেঁচেছে তার জন্যই। আর সেই অদৃষ্টফল—সেই 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' ফলাদেশ?

উপন্যাসের পাঠক জানেন, 'শ্রী বলিল, 'মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎর্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই।—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।'

'সীতারাম' উপন্যাসের শেষ কথাটা কী? শ্রী বলেছে, 'সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।'

জ্যোতিষভাবনা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র নয়, কিন্তু একটি প্রধান চিন্তাসূত্র। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম—এই পাঁচটি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের তাৎপর্যপূর্ণ মুখ্য উপন্যাস, যেগুলিতে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। যুগলাঙ্গুরীয় ক্ষুদ্র আখ্যান বলে এখানে উল্লেখ করলাম না। জ্যোতিষপ্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো কয়েকটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। 'অদৃষ্ট' বা নিয়তি বঙ্কিমচন্দ্রের সব উল্লেখযোগ্য উপন্যাসেই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। নিয়তিই বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়িকা।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'অতি তরুণ বয়স হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এই জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি; তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী, বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা

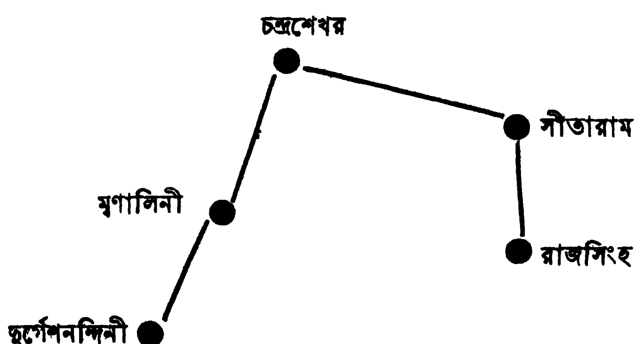
সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।' ধর্মতত্ত্ব। একাদশ অধ্যায় : ঈশ্বরে ভক্তি।

তবে কি আমার কথাটা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা আর তাঁর জীবনদর্শন সমার্থক? এ কথা আমি বলতে চাই না। জ্যোতিষভাবনা বঙ্কিমের জীবনদর্শনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত। এ দুইকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। জ্যোতিষভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পরিহার করেন নি। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রধান রচনা রাজসিংহ (১৮৯৩, চতুর্থ সংস্করণ) পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা অব্যাহত। এ থেকে বুঝতে পারি, জ্যোতিষভাবনা, নিয়তিবোধ বঙ্কিম-চিন্তার ধ্রুবপদ।

কিন্তু এই কি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের, জীবনোপলব্ধির শেষ কথা, চূড়ান্ত কথা?

আমার তা মনে হয় না।

দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম-রাজসিংহ পর্যন্ত যে পাঁচটি প্রধান উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা প্রধান প্রসঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে, সেই পাঁচটি উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের আধাররূপে দেখলে এইভাবে বিন্যস্ত করা যায়—



'দুর্গেশনন্দিনী'তে জ্যোতিষভাবনার সূত্রপাত। 'মৃণালিনী'তে জ্যোতিষভাবনা অগ্রসর। সীতারাম উপন্যাসের জ্যোতিষভাবনা সর্বাধিক পরিমাণে জ্যোতিষশাস্ত্রভিত্তিক। বঙ্কিমচন্দ্র কথায় কথায় শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার

করেছেন। রাজসিংহ উপন্যাসেও জ্যোতিষগণনার ভূমিকা পর্যাপ্ত। স্তর-তম ভেদে দুর্গেশনন্দিনীতে জ্যোতিষভাবনা পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এগুলির মধ্যে ন্যূনতম। পক্ষান্তরে সীতারাম উপন্যাসে জ্যোতিষভাবনা পরিমাণ ও প্রকৃতিবিচারে সর্বাধিক। তাৎপর্যবিচারে জ্যোতিষভাবনা পাঁচটি উপন্যাসেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাকি থাকলো চন্দ্রশেখরের কথা। চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও জ্যোতিষভাবনার তাৎপর্য অপরিসীম। যথাস্থানে বিশ্লেষণ করে তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি চন্দ্রশেখরকে মধ্যমণি করেছি, এই উপন্যাসটিকেই সুতুঙ্গ করেছি। কেন?

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে জ্যোতিষভাবনার পর্যাপ্ত ও গভীর পরিচয় আছে। কিন্তু সে দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আরো চারখানি উপন্যাসও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সেগুলির কথা বিশেষভাবে বলাও হয়েছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের তাৎপর্য বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা ও জীবনদর্শনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। কেননা, জ্যোতিষভাবনার গুরুত্ব ও বঙ্কিমের জীবনদর্শনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অন্যান্য উপন্যাস থেকেও বুঝতে পারি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর উপন্যাসেই কিছু গূঢ় সমাচার পাই।

দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখর ভবিতব্য ও পুরুষকারের কথা ভেবেছেন, আমরা দেখেছি। ভবিতব্য ও পুরুষকারের মধ্যে সামঞ্জস্যসন্ধানচেষ্টারই অপর নাম যে বঙ্কিমসাহিত্য, তা-ও আমরা অন্যত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি। পুরুষকারের কথা বঙ্কিম বললেও 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে?' এই নিয়তিচেতনাকে বহুলাংশে তাঁর জীবন-দর্শনের প্রধান সূত্র বলা যায়।

কিন্তু এই ভবিতব্য, অদৃষ্ট বা নিয়তিকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মের শাস্ত্র হিশেবেই দেখেছেন। এ যে chaos নয়, cosmos, সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য। তবু, নিয়তি বড়ো বাস্তব, বড়ো নিষ্ঠুর! বঙ্কিমের মন প্রশ্ন করেছে, জিজ্ঞাসার প্রহারে ভেঙে পড়েছেন তিনি, ভবিতব্যই কি সব? শেষ কথা?

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের (পুণ্যের স্পর্শ) প্রথম পরিচ্ছেদে (রমানন্দ স্বামী) 'সিদ্ধপুরুষ' রমানন্দ স্বামী, যিনি 'অদ্বিতীয় জ্ঞানী', তাঁর কাছেই বহুশাস্ত্রবিদ্ জ্ঞানী চন্দ্রশেখর এক আশ্চর্য মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রমানন্দ স্বামী সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন।' রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলেছেন :'......কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেননা, দুঃখ বলিয়া একটা পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাঁহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।...

'যিনি সর্বজ্ঞ তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসে?... যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।

'আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে দুঃখনিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই, তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত।.........তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।'

দর্শন, বিজ্ঞান সর্বশাস্ত্র মন্থন করে সিদ্ধপুরুষ রমানন্দ ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখরকে এই সব কথা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। চন্দ্রশেখর বিস্মিত মোহিত হয়ে শুনলেন। তাঁর শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো। চন্দ্রশেখর বললেন, 'গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।'

কী সেই মন্ত্র?

ষষ্ঠ খণ্ডের (সিদ্ধি) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম 'যোগবল না Psychic Force?'

শৈবলিনীকে ঔষধ সেবন করাবার জন্য "চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশনব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয় দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।"

'যোগবল না Psychic Force ?'—বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা।

আমরা কি উত্তর জানি ? আমরা শুধু বঙ্কিম উপন্যাস পর্যালোচনাশেষে এইটুকু উপলব্ধি করি : অন্যান্য বহু শাস্ত্রে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-রহস্যের অর্থ সন্ধান করেছিলেন তেমনি খুঁজেছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রেও। তাঁর জীবনদর্শন ও জ্যোতিষজিজ্ঞাসা একাকার হয়ে গেছে।

এবং সর্বোপরি, সেটাই শেষ কথা নয়।

যোগবল না Psychic Force ?—কিসের দ্বারা ভবিতব্যকে খণ্ডন করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তারও মন্ত্র আয়ত্ত করছিলেন। কিন্তু সে মন্ত্রের স্বরূপ-সন্ধান আর একটি স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ বা গ্রন্থের বিষয় হতে পারে। সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ মৌলিক একটি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করে আমি শুধু এখানে আরো একটি নতুন গবেষণাযোগ্য বিষয় উত্থাপন করে রাখলাম।

জাতীয় শিক্ষাচিন্তা

স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ পদার্থটা পণ্ডিতেরা য়ুরোপীয় শিক্ষার ফল বলেই গণনা করে থাকেন (রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৫, ১৩৬৭ পৌষ)। হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে যে ইংরেজি শিক্ষা এ-দেশে প্রচারিত হয়েছিল, দেশের পক্ষে সর্বতোভাবে তা কল্যাণকর হয় নি, তবে দেশের জন্য দরদ বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য এই বিদেশী শিক্ষার ভূমিকা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

'অদৃষ্টের পরিহাস না বলে একে ইতিহাসের পরিহাস বলাই ভালো। ইংরেজ সাধ করে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, ভেবেছিল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হবে তাদের সত্যকারের আপনজন। এমন কি, তারাই হবে সাম্রাজ্যের ধারক এবং বাহক। কিন্তু ফল এমনি উলটো হল যে সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিশেষভাবে যাঁরা বিলেতে গিয়ে বিলিতি শিক্ষাকে পাকা করে এনেছিলেন তাঁরাই হলেন ইংরেজ বিতাড়নের প্রধান উদ্যোক্তা। বলা বাহুল্য, ইংরেজ চরিত্রের নানা গুণে তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য তাঁদের কাছে এক পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল (মনোমোহন ঘোষ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬)।

কিন্তু ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানভাণ্ডার এঁরা একদিকে যেমন পরম শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগের সঙ্গে আহরণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন, তেমনি আবার এই আলোরই পাশাপাশি ভারতবর্ষে ও অন্যত্র ইংরেজ শোষণের ভয়াবহ বীভৎসতার কালিমা এঁদের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। এঁরা বুঝেছিলেন, 'ইংরেজের এক হাতে অমৃত, অপর হাতে বিষ। সেদিন ইংরেজি শিক্ষায় যাঁরা ছিলেন অগ্রগামী তাঁরাই অগ্রণী হয়ে

বিষপাত্র কণ্ঠে গ্রহণ করেছেন। (মনোমোহন ঘোষ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬)।

পরবর্তীকালেও আমরা এইভাবেই বিদেশে বিদেশী শিক্ষায় লালিত অরবিন্দকে পেয়েছি 'স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি' রূপে, বারীন্দ্রকে 'স্বদেশাত্মার অগ্নিমূর্তি' রূপে—'স্বদেশী মহলের নীলকণ্ঠ' হতে হয়েছে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আরো অনেক ব্যক্তিত্বকে।

কাজেই, প্রধানত ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্য ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দু মেলা (রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ; পৃষ্ঠা ৪৬, ১৩৬৭) যে স্থাপিত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১৮৬৭, এপ্রিল ১২); মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ, সহকারী সম্পাদক নবগোপাল। মেলার অধ্যক্ষগণ 'স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতের চর্চা, কুস্তি ও ব্যায়ামাদির পূর্ণবিকাশে উৎসাহদান করার জন্য 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' হলেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৪১-৬৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪) বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষের সাহায্য যাজ্ঞা করি, ইহা সাধারণের লজ্জার বিষয়,…… অতএব যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।'

সংক্ষেপে বলা চলে, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মান জাগরণ, জাতীয় চরিত্রে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল)। 'হিন্দুমেলা' প্রসঙ্গে যে চিন্তাসূত্রগুলির উল্লেখ করা হলো, তারই গভীরে পরবর্তী কালে স্বদেশী শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা-বাসনারও দূরতম বীজ নিহিত ছিল বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। গণেন্দ্রনাথ যে 'আত্মনির্ভরতা'র কথা বলেছিলেন, জাতীয় চরিত্রের সেই 'স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি' কিন্তু সেই দিনই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় নি। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টিরও প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘকাল এ জিনিস দেখা যায় নি। সেই পর্যায়টা ছিল রাজপুরুষদের কাছে শুধু দরখাস্ত লেখার যুগ—আবেদন-নিবেদন-ব্যর্থতা-অপমানে ভর্তি।

স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং কর্মচেষ্টার প্রকৃতিই যে এই রকমই ছিল, তার বিশ্বস্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় ভিন্ন প্রসঙ্গে (শচীন্দ্রনাথ সেন রচিত Political Philosophy of Rabindranath নামক গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিত "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র রচনাবলী : চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৩৬-৪৪৪) পরবর্তীকালে রচিত (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ থেকে—'আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে নি বলেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদঘর্ম চেষ্টা করি—এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হলো।··· তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গভর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনে তরুণেরা ঠিকমত কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।'

একই প্রবন্ধে, '······ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়ে চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্‌, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকার বাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই।"

তাঁর বক্তব্য, বিদেশীর শাসনাধীনে থাকলেই যে দেশ স্বদেশ হয় না তা নয়। মানুষ কোনো দেশে দৈবক্রমে জন্মায়। সেই দেশকে "সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা, সম্পূর্ণ আত্মীয় করে" তুলতে হয়, অধিকার করতে হয়। 'বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে' যাকে গড়ে তোলা যায় তারই উপরে অধিকার জন্মায়, অধিকার এমনিতে আসে না।

কংগ্রেস গঠনের পরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সেকালে লক্ষ্য করা যায়

নি। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যেতে পারে: "আমরা কংগ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা, দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি।" কেউ কেউ সেকালে এমন অভিমতও পোষণ করতেন যে, দেশ পরাধীন বলেই অনেকে দেশ সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু এ কথার কি কোনো মূল্য থাকতে পারে? "সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতঃই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা দিলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না।" লর্ড কার্জন যেদিন বঙ্গভঙ্গের সূচনা করেছিলেন, সেদিনও এই কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে প্রতিকূল অবস্থায় দেশপ্রেম—দেশের প্রতি কর্তব্য বোধ আত্মত্যাগেই প্রণোদিত করে যথার্থ দেশপ্রেমিককে। বাধা আসবেই, কিন্তু উদ্যম তাতে ব্যাপক হয়, নিষ্ঠা তাতে গভীর হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে আমরা পরে প্রবেশ করবো। কেননা, কোন্ পটভূমিতে এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেই পটভূমিটির পরিচয় মোটামুটি ভাবে না জানলে জাতীয় শিক্ষার জন্য ব্যাকুলতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

মনে রাখতে হবে, অবস্থাটা তখন এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, 'দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে।' ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪২)।

আমাদের দেশ ও জাতির পরম সৌভাগ্য বলতে হবে, গত শতাব্দীর শেষ দিকে একাধিক চিন্তানায়ক এই গভীর সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সে দিনের শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্নিহিত চাতুরীও এঁদের চোখে ধরা পড়েছিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা যে শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাকেন্দ্রিক স্বদেশী আন্দোলন নয়, একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আধুনিক কালের ঐতিহাসিকবৃন্দ। এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র এতটা সরল নয়। এর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন

করতে হলে মনে রাখতে হবে এর জটিলতা এবং বহুমুখিতার কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির সহায়তা নিয়ে বলা যেতে পারে—'সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা' দেশকে সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলবার ব্যাকুলতাই এই আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। বস্তুত, "যে সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার" উদ্‌যোগই স্বদেশী আন্দোলনের আকারে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই লক্ষণীয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্দোলন স্পষ্ট দৃশ্যগোচর হলো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই নানা ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে জঙ্গী দেশপ্রেম ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠেছিল—জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এই জঙ্গী দেশপ্রেমের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দুই জন গবেষক যে মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশ করেছেন, তাঁদের ভাষাতেই সেটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে—

"The memories of the Sepoy war (1857), the Indigo Agitation (1860), the activities of the Hindu Mela (1867-1880), the Indian League (1875) and the Indian Association (1876), the Ilbert Bill Agitation (1883), the Activities of the Indian National Conference (December, 1883) followed by the Indian National Congress (1885) ; the literary creations of Rangalal, Madhusudan, Dinabandhu, Bankim, Hemchandra, Nabinchandra and Rabindranath (from 1885-1900) ;—the national plays of Jyotirindranath (Tagore), Upendranath (Das) and Girischandra as well as the national songs of Satyendranath (Tagore), Dwijendranath (Tagore), Manmohan (Basu), Gobindachandra (Roy) and

Dwijendralal (1868-1900) ; the journalistic propaganda of the Hindu Patriot (since 1853) and the Amrita Bazar Patrika (since 1868) as well as the Bengalee under Surendranath (since 1879) ;—the moral and spiritual forces generated by Keshabchandra, Ramkrishna, and Bejoykrishna (1860-1899) ; Vivekananda's Chicago Success (1893) and the Cult of Sakti-yoga—all these factors shook Bengal and together awakened the self-consciousness of the Bengalis and promoted the spirit of militant nationalism in our country. (From 'The Origins of the National Education Movement'—Prof. Haridas Mukherjee and Prof. Uma Mukherjee).

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে জেগেছিল দেশবাসীর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্মজ্ঞ পাঠকগণ অনুভব করতে পারবেন, রবীন্দ্রনাথের যে পর্বটিকে রবীন্দ্র-রসিক সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারত পরিক্রমার কাল হিশেবে চিহ্নিত করেন—সেই পর্বটি এই উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিলগ্ন। নূতন যে সত্যটি এই পর্যালোচনা থেকে আহরণ করা যায় তা' হলো—এই পর্বটি প্রাচীন ভারতে কবি রবীন্দ্রের একক পরিক্রমার ইতিবৃত্ত মাত্র নয়, কবি রবীন্দ্রের সহযাত্রীরূপে এই প্রাচীন ভারত ভ্রমণের পুণ্য সেকালের বাঙালীদের সকলেরই। অর্থাৎ, এই পর্বের রবীন্দ্রকাব্য এই বিশেষ অর্থে জাতীয় স্বপ্নকল্পনার অবিস্মরণীয় দ্যোতক হয়ে উঠ্‌লো। রবীন্দ্রনাথের চৈতালি, কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য কাব্য পর্যায় এই প্রাচীন ভারত ভ্রমণের ছন্দোবিধৃত দিনপঞ্জীর মতো। নিজের অতীতকে যে জাতি জানে না তার বর্তমানের পায়ের তলায় মাটি নেই আর ভিত্তিহীন বর্তমান কোনো স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেও তাকে চালিত করতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই।

জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হিশেবে তাই পরিকল্পনা করা হয়েছিল এমন এক ত্রি-মাত্রিক পদ্ধতির—প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানশিক্ষা-সহ সাহিত্য-অধ্যয়ন যাতে পূর্ণমূল্য ও মর্যাদা পেতে পারে, জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে হবে তাকে এবং পরিপূর্ণরূপে এই শিক্ষাপদ্ধতি থাকবে জাতীয়

নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং এর উদ্দেশ্য হবে, 'the realization of the national destiny.'

পরবর্তীকালে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলেরই তাই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে কয়েকজন চিন্তানায়কের কাছে, যাঁদের দূরদৃষ্টিতে প্রথমেই ধরা পড়েছিল এই গভীর সত্য যে, জাতীয় শিক্ষাকে উপরিলিখিত লক্ষ্যের দিকে চালিত করলেই 'the realization of the national destiny' সম্ভব হবে।

এই অবিস্মরণীয় চিন্তানায়কগণের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম ভারতীয় উপাচার্য' গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিচার্য। গত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রারম্ভে তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতাগুলির (১৮৯০-১৮৯২) মাধ্যমে গুরুদাস লর্ড বেন্টিকের আমল থেকে (১৮৩৫) প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য ত্রুটিগুলির দিকে একদিকে সরকারের, অন্যদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য তিনি যে সুপারিশগুলি প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করেছিলেন তার মধ্যে ছিল—(১) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, (২) মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ্ প্রবর্তন ও (৩) প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন! জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরবর্তীকালে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রথম ভারতীয় উপাচার্যের' সমাবর্তন ভাষণগুলির মধ্যে তারই খসড়ারূপটি লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাবিদ্ ও দেশনেতাদের দৃষ্টিতে যেমন, তেমনই কবি ও সাহিত্যিকের ধ্যান-ধারণাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ সেই অগ্রবর্তী চিন্তানায়কগণের অন্যতম, যিনি প্রায় একই সময়ে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটির কথা শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই জানেন। পুরো প্রবন্ধটিই সকলের অবশ্যপাঠ্য ও উদ্ধৃতিযোগ্য হলেও সঙ্গত কারণেই আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ আমাদের বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য তুলে দিচ্ছি—

১. বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই।

২. এক তো ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দ বিন্যাস, পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনো প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী।

আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।

৩. যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্য পুস্তকে নাই; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতামাতা, আমাদের সুহৃদ্ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বলিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না।

'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটির মধ্যে সেকালের দেশপ্রেমিক বাঙালীর অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা অবিস্মরণীয় ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের একাধিক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ও আনন্দমোহনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। 'সাধনা' পত্রিকার পরবর্তী মাঘ মাসের সংখ্যায় রবীন্দ্র-সুহৃদ্ লোকেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর 'শিক্ষা প্রণালী' নামের প্রবন্ধে রবীন্দ্র-ধারণাই ব্যক্ত করেন।

সুলভ নয় অথচ প্রাসঙ্গিক ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র ও আনন্দমোহনের মন্তব্য ও অভিমত (সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃষ্ঠা ৬১৬-৬১৭) এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করে দিচ্ছি—'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির

নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

গুরুদাস লিখেছিলেন: "আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা (যথা, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি।...ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমত, বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান-দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়ত, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাংলা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভাসমিতির কার্য ও বক্তৃতা ইংরেজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।"

আনন্দমোহন বসু এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত, সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই।" কয়েক বছর পর 'ডন' পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) সম্পাদকরূপে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করে বললেন, (The Dawn, February 1898. P. 354.) এই শিক্ষা আমাদের মধ্যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করতে পারে নি, আত্মবিশ্বাসী আত্মনির্ভরশীল আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকরূপে আমাদের তৈরি করতে পারে নি। পরবর্তী অংশটুকু তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে "The present system of mere Examinations has failed to bring to the front the stamp of men who can hold their own in the great

industrial struggle which is the marked feature of the great civilisations midst which we live. Must we still stand by with folded hands until the doom of extinction overtakes us? Seriously speaking, these are momentous questions and cannot indefinitely wait for an answer."

প্রচলিত বিদেশী শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও অন্তর্নিহিত চাতুরী নিয়ে গত শতকের সর্বশেষ দশকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়, ভারতপ্রেমিক বিদেশীগণও জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনকে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর এবং দেশের সর্বতোমুখী বিকাশের পক্ষে অনিবার্য বলেই মনে করেছিলেন। এঁদের মধ্যে Sir Birdwood, Mrs. Annie Besant ও Sister Nivedita বিশেষভাবে স্মরণীয়। Mrs. Besant ডন পত্রিকার জুন, ১৮৯৭ সংখ্যায় 'The Education of Hindu youth' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"Boys of the upper classes must, under the circumstances of the day, receive an English education. Without this, they cannot gain a livelihood, and it is idle to kick against facts we cannot change. We can take the English education, then for granted. But a reform in the books they study is necessary, and efforts should be made to substitute a detailed knowledge of Indian History and Geography now learned. A sound and broad knowledge of universal History widens the mind and is necessary for culture but everyman should know in fuller detail the History of his own nation, as such knowledge not only conduces to patriotism but also enables a sound judgement to be formed......"

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অস্বাভাবিকতা দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। Sir George Birdwood 'ডন' সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্রে যে সব সুচিন্তিত

অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তী কালে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' তাঁদের পাঠ-পরিকল্পনা-সংগঠনের ক্ষেত্রে সেই সকল অভিমত বহুলাংশে গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় এই ভারতপ্রেমিক বিদেশী আমাদের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে কী গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন।

সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে চিন্তানায়কগণের এই অসন্তোষ কেবল তাত্ত্বিক সমালোচনাতেই পর্যবসিত হয় নি, প্রতিকারের বাস্তব পথেও তাঁদের প্রয়াস চালিত হয়েছিল। ১৮৯১-এর আগস্ট মাসে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াসে 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব্ ইয়ংমেন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সোসাইটি যুগোচিত প্রয়োজনসাধনে সমর্থ হয় নি। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভবানীপুরে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র প্রতিষ্ঠাও স্মরণীয়। কার্তিকচন্দ্র নানের ভবনে ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও এই সূত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন' রূপে পরিচিত হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কী ভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তার অবকাশ স্বল্প। খুব সংক্ষেপে, রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি উদ্ধার করে দিচ্ছি ('আভাস'—চার অধ্যায়, ১৩৪১)—"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা কালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই। এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালি জাতকে কৃশ করে দেবে, এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্‌বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়- দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে

পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। ৮ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ রাজনৈতিক চেতনাকে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে জাতিকে, এই অনিবার্য পরিণাম' লর্ড কার্জন অনুভব করেছিলেন। সুতরাং "ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ এ্যাক্ট"-এর সাহায্যে শিক্ষার মূলেই আঘাত হানতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুছে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ, কমিশন' স্থাপিত হয়েছিল ১৯০২-এর জানুয়ারি মাসে। গুরুদাস ছিলেন সেই কমিশনের একমাত্র হিন্দু সদস্য। তিনি কমিশনের মেজরিটি রিপোর্টে তীব্র আপত্তি জানালেন। বলা বাহুল্য, তাঁর অবিস্মরণীয় 'নোট অব, ডিসেণ্ট' সত্ত্বেও ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই 'দি ইউনিভার্সিটিজ, বিল্' ১৯০৪-এর ২১ মার্চ চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হলো। গুরুদাসের সঙ্গে সেকালের চিন্তানায়কগণ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু ও মোহিতচন্দ্র সেন—সকলেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্রথমেই। 'এ্যাক্ট' রূপে তা গৃহীত হবার পর সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়লো অসন্তোষ। তীব্র ক্ষোভে ও ঘৃণায় ফেটে পড়লো দেশ।

গুরুদাসের 'নোট অব ডিসেণ্ট'-সহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাদ গণনা করেছিলেন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিন যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা সকলেই। তারই তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ডন সোসাইটি'—যার অনিবার্য ফলশ্রুতি পরবর্তীকালের 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ—সেকালের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হলো সোসাইটি—উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতাগুলি দূরীকরণ আর স্বাদেশিক ও জাতীয় ভাবধারার অনুশীলন।

১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকেই সারা দেশ জুড়ে চলছিল বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ। ১৯০৫-এর ৭ আগস্ট তারিখে কলকাতার টাউন হলের ঐতিহাসিক সভা থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো বাংলা দেশ। বস্তুত পক্ষে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের নব পর্যায়ের সূচনা, বয়কট-

স্বদেশী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই! জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লো এই আন্দোলন—রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে এই আন্দোলন, প্রবেশ করলো শিক্ষা-জগতেও গভীরতর ভাবে।

সতীশচন্দ্রের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রগণ সরকার-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করার জন্য এগিয়ে গেলেন। ১৯০৫-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পি. আর. এস. ও এম. এ. পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই এই বয়কট আন্দোলনের সূচনা। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং বিনয়কুমার সরকার এই বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছাড়া সকলেই সতীশচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্য, ডন সোসাইটির নিয়মিত সদস্য এবং সর্বোপরি সতীশচন্দ্রের সঙ্গে একই মেসে ১৯০৫-এর জুন মাস থেকে অবস্থান করছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এই মেসটির তত্ত্বাবধায়ক। বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলনের এই চারজন অগ্রবর্তী নায়ক ছিলেন সে যুগের সর্বাধিক দীপ্তিমান ছাত্র। নৃপেন্দ্রচন্দ্রও ছিলেন সতীশচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত।

সতীশচন্দ্রের নেতৃত্ব তো ছিলই, তার সঙ্গে অবিলম্বে যুক্ত হলো রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা। ইতিহাসের সেই দিনগুলি কী উজ্জ্বল! বর্তমানের দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, যখন ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণার সম্মুখীন হই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেরণা, রচনা করলেন স্বদেশ প্রেমের সঙ্গীতরাজি—তাঁর অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি। গান লিখছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় অজিত চক্রবর্তীকে নিয়ে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের হল ঘরে আসছেন, গান গাইছেন, উদ্বুদ্ধ করছেন ছাত্রদের, দেশপ্রেমের শিখা রাখছেন অনির্বাণ! তাঁর সঙ্গে আরো আসতেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশপ্রেমের সাধনায় এই পর্বে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, আসতেন ভগিনী নিবেদিতা 'Than whom a more passionate patriot the country has rarely seen.' হীরেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত মেস বাড়িটিতে ছাত্রদের নিয়ে সভা করতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষাসমূহ বয়কট করার জন্য ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতেন।

সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৫-এর জুন মাসেই মেসটির চালনা আরম্ভ করেন। ১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের দোতলায় শুরু হলো এই মেস। এরই একতলায় ছিল ঐতিহাসিক 'ফিল্ড এ্যাণ্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব'—যেখানে সেদিন

সমবেত হতেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাস। ক্লাবটি ছিল এঁদেরই।

জাতীয় শিক্ষাচিন্তা ও তার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই সব চিন্তা-নায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের দান অবিস্মরণীয়। বস্তুত পক্ষে, জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। বিশেষত, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ নভেম্বর পান্তির মাঠে যুবক সুবোধচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ এই স্বল্প অবকাশেও অনিবার্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা কালে সুবোধচন্দ্র মাতৃভূমির জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখেছিলেন। কী চরম দুঃখ ও ত্যাগ সেজন্য বরণ করতে হবে, তা-ও তিনি জানতেন। সেই দুঃখবরণের উৎসাহও সেদিন চতুর্দিকে দেখা গিয়েছিল। তাই পান্তির মাঠে প্রদত্ত ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "......If we are all ready to undergo the huge sacrifices that have been lately heard of, what in world is there in the way of starting a National University ?...Why then do we halt and falter ? The great demand is that of sacrifice. If I may say so, the first, the next and last essential is sacrifice in the present crisis."

আরো কত মনস্বীর চিন্তা ও স্বপ্ন, কত বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করলো জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জুন, রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানরূপে এবং এর অধ্যক্ষ হলেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি জাতীয় শিক্ষা চিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভব হলো ?

কোনো ভাবুকই তা মনে করতে পারেন না। এ শুধু জাতীয় শিক্ষা চিন্তার একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের পরিণতি লাভ এবং অবশ্যই নতুন পর্যায়ের সূচনা : আর সেই নতুন পর্বের পরিণতিরূপে কলকাতা শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় : বহু দিক থেকে নতুন ধরনের। উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত বাঙালী মনীষীর শ্রম ও সাধনা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের একটি প্রতীক হয়েই তাকে উঠতে হবে : আজ, কাল কিংবা পরের দিন !

রবীন্দ্রসংস্কৃতি

'এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি, কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানাবিভাগেই আমার জবাবদিহি, সব দিকটাকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী করে! যদি না মেলাতে না পারি, তাহলে সমস্যা অত্যন্ত কঠিন বলে তো পরীক্ষক আমাকে পার করে দেবেন না—জীবনের পরীক্ষায় তো হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্য এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না।'

অস্তিত্বের নানাবিভাগেই জবাবদিহির দায়িত্ব যাঁকে নিরন্তর প্রবল কান্নায় টেনেছিল, রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে না। তাই, মুখ্যত কবি বা এমন কি সাহিত্যিকরূপেই রবীন্দ্রনাথকে ভাবার অভ্যাসটা শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, বিপদজনকও বটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে যেমন, এখনো পর্যন্ত তেমনি সচরাচর ভুলভাবে প্রশংসা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ কথাটাও স্বীকার করা উচিত. সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-উপলব্ধির পথে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অংশত অন্তরায়। অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন রচনাংশের পাহাড় সাজিয়ে এটাও প্রমাণ করা শক্ত নব যে, তিনি নিজেকে মুখ্যত, এমন কি একমাত্র কবি হিশেবেই দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন।

লিপিকার বিশুদ্ধ কবিতাগুলিকে যে কারণে তিনি কবিতাকারে বিন্যস্ত করে উঠতে পারেন নি বলে পুনশ্চ-এর ভূমিকায় খেদ প্রকাশ করেছেন, বোধকরি সেই 'ভীরুতা'ই তাঁকে অন্তত কোনো কোনো সময়ে নিছক কবির সজ্ঞাগ্রহণে প্ররোচিত করেছে। অথচ, রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিশেষে, তাঁর এই সিদ্ধান্তই শিরোধার্য যে,

'এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি, কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানাবিভাগেই আমার জবাবদিহি···।'

প্রশ্ন তোলা যায়, একজন কবি বা সাহিত্যিকেরও কি সেই দায় নেই, থাকে না? অস্তিত্বের নানাবিভাগে একজন কবি বা সাহিত্যিককেও কি জবাবদিহি করতে হয় না? উত্তরে বলা যায়, হয়। কেন হবে না। সমগ্র জীবনই তো সাহিত্যের উপকরণ। জীবনের কোনো দিকই তো সাহিত্যের আসরে অনিমন্ত্রিত অতিথি নয়।

ঠিক কথা। কিন্তু কবি বা সাহিত্যিক অস্তিত্বের নানাবিভাগে প্রবেশ করেন, সন্ধান করেন রসবোধকেই সম্বল করে আর তাঁর লব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেন রসাত্মক বাক্যেরই মাধ্যমে। তথ্যাশ্রিত হলেও রসবোধ ও কল্পনাই সাহিত্যিকের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার ও গাইড আর তাঁর প্রকাশের মাধ্যম একমেবাদ্বিতীয রসাত্মক বাক্য।

সাহিত্যিকের এই দৃষ্টি ও প্রকাশমাধ্যম অনিবার্যভাবেই সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথেরও। কিন্তু বলার কথাটা এই যে, এই সাহিত্যধর্মই তাঁর 'একমাত্র ধর্ম' ছিল না আর সেইজন্যই 'রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই' রবীন্দ্রনাথের কাজ ফুরিযে যায় নি। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক প্রতিভার দান বহুতর। সহস্রাধিক কবিতা, অর্ধশত নাটক-নাটিকা-প্রহসন, শতাধিক গল্প, চোদ্দটি উপন্যাস প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। জীবনের বহু বিচিত্র দিক ও দিগন্তের স্পর্শে তাঁর এই রচনাবলীর সাহিত্যিক পূর্ণতা ও ঐশ্বর্য অসামান্য।

রবীন্দ্রসংস্কৃতির স্বরূপ-পরিচয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কমবেশি এইসব কল্পনামূলক রচনার মধ্যেও পাওয়া যাবে। উল্লেখযোগ্য সব লেখকেরই রচনায তাঁদের সংস্কৃতির ও সংস্কৃতিচিন্তার পরিচয অবশ্যলভ্য। কেননা, সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পকলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামে যে বিশেষ সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করার তাগিদ বোধ করেছি, সেই সংস্কৃতির পরিচয কেবল তাঁর সৃজনমূলক রচনাবলীতেই পাওয়া যাবে না। ভাষা-সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র,

নানাধরনের সংক্ষিপ্ত রচনা থেকেই রবীন্দ্রসংস্কৃতির আরো ব্যাপক ও গভীর পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এ-পর্যন্তও গেল অবিশ্রান্ত বৈচিত্র্যে পূর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্যেরই কথা। একটি সমগ্র দেশের বা কালেরও সাহিত্য যদি বিষয় ও প্রকাশরীতির বৈচিত্র্যে এতটাই সমৃদ্ধ হয়, তাহলে সেই সাহিত্য গোটা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেই আত্মস্থ করে রচিত হয়ে উঠেছে বলে মানতেই হবে। অতএব, এক্ষেত্রে একা রবীন্দ্রনাথেরই, শুধু সাহিত্যকর্মেই একটি দেশের একটি জাতির একটি কালের সংস্কৃতির পরিচয় উজ্জ্বলভাবে বিধৃত : এই উচ্চারণ অসংশয়িতভাবে সত্য।

অথচ, আরো আছে। রবীন্দ্রসংস্কৃতি শুধু সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য-কীর্তি-আশ্রয়ী নয়।

ধরা যাক্, তাঁর আঁকা ছবিরই কথা। এ-বিষয়ে প্রচলিত ধারণাই ব্যক্ত করেছেন সত্যজিৎ রায়, যার মূলে রবীন্দ্রনাথেরও সায় খুঁজে পাই : 'কোনো-রকম অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন না, কোনো অংশ কাটতে হলে ঘন কালি লেপে দিতেন। ক্রমশ দেখলেন অবগুণ্ঠিত কাটাকুটির মধ্যে ছন্দের বেশ একটা আদল নিচ্ছে, একটু-আধটু কলমের আঁচড়েই সেগুলি ফুল পাখি কিংবা জন্তুর রূপ ধরছে—এইভাবে ছবি আঁকার তাগিদ এলো মনে।'—'রবীন্দ্রনাথ' চলচ্চিত্র নির্মাণকালেও সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার এই তাগিদটাকে চিত্রার্পিত করেছেন।

ছন্দও কবিতার সম্পদ কিন্তু শুধু কবিতারই সম্পত্তি নয়। সব শিল্পেরই ছন্দ আছে। ছন্দই শক্তি, সুষমা, সার্থকতা। মাধ্যম বদল হলে ছন্দ বদল হয়, শিল্পীও নতুন নতুন পন্থায় সমন্বয়ের পথ খুঁজে ফেরেন। আত্মপ্রকাশের পথে ছন্দের স্বগত শক্তি প্রাণশক্তি। রবীন্দ্রসাহিত্যের করুণ কোমলতার দিকটা এককালে সাময়িক প্রয়োজনপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় নিন্দা পেয়েছিল, কিন্তু তাঁর ছবির মধ্যে নন্দলাল বসু এই প্রাণশক্তির অভ্রান্ত পরিচয় পেয়েছিলেন : 'গুরুদেবের ছবিগুলিতে ছন্দের এই প্রাণশক্তি দুর্মর বলিষ্ঠতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমস্ফূত জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচারিতা, যে জীবন ক্লান্তিতে শীর্ণ নয়, সংগ্রামশক্তিতে উজ্জীবিত। তাঁর রেখা ও রঙ বিন্যাসে অবসাদ তাই অনুপস্থিত। এক আশ্চর্য সজীব প্রাণময়তা ছবিগুলির সহজাত গুণ। ভারতীয় শিল্পে এটি তাঁর একটি বিশিষ্ট অবদান।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের গোধূলিপর্যায়ে ছবি আঁকায় হাত দিয়েছিলেন এবং 'অবগুন্ঠিত কাটাকুটির মধ্যে ছন্দের বেশ একটা আদল' ক্রমশ ছবি হয়ে ফুটেছিল তাঁর হাতে, এই ধারণার ব্যতিক্রম হিশেবেই আচার্য নন্দলালের আরো একটি মন্তব্য অনতিপরিচিত বলেই স্মরণ করা উচিত: 'প্রথম জীবনেও ছবি এঁকেছিলেন, খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে।' তবু প্রকৃত প্রস্তাবে সত্তরের সীমায় এসে রীতিমতো 'চিত্রকরের তুলি' হাতে তুলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রকলায় শিল্পীর যে তিনটি গুণ আবশ্যক, নন্দলালের মতে, রবীন্দ্রনাথের সেগুলি ছিল:

১. ছন্দের চেতনা, ২. সামঞ্জস্যের চেতনা, ৩. আত্মলীনতার চেতনা।

উল্লেখ হয়তো অনাবশ্যক, আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করছি না, সে যোগ্যতাও আমাদের নেই অথচ চিত্রকলায় শিল্পীর যে গুণ তিনটি নন্দলাল আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন, সেই তিনটি গুণ বিশেষভাবে সংস্কৃতির সঙ্গেও সংলগ্ন বলেই প্রসঙ্গটির অবতারণা। অর্থাৎ ছন্দের চেতনা আর আত্মলীনতার বোধ কেবল তাঁরই প্রয়োজনীয় নয়, যিনি ছবি আঁকেন; তারও অর্জনীয় সেই গুণাবলী যিনি জীবনের পটে নিয়ত-অনুশীলন-সম্ভব সংস্কৃতিকেও সুচিহ্নিত করে থাকেন। তাই, শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য নয়, রবীন্দ্র-চিত্রকলাও এইভাবেই হয়ে ওঠে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত, রবীন্দ্রসংস্কৃতির মূল সূত্রটিই ছন্দের সুষমা-সৌন্দর্য, সামঞ্জস্যবোধ আর নিয়ত-অনুশীলনের মধ্যে নিহিত। শিক্ষা ও চর্চা দ্বারাই লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পকলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষকেই সমগ্রভাবে সংস্কৃতিরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'কালচার' অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটির প্রয়োগ সমীচীন মনে করেন নি, তিনি প্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষকেই উপযুক্ত প্রতিশব্দরূপে বেছে নিয়েছিলেন। এই 'চিত্তোৎকর্ষ' সর্বস্তরে বাংলার, ভারতের তথা বিশ্বের সংস্কৃতির সারাৎসারকে আত্মস্থ করে নিতে চেয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ আমাদের কাছে অভ্যাসজনিত। এই অভ্যাসের মধ্যে অশুদ্ধি আছে কী-না ভেবে দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথের গানে কথার প্রাধান্য আর সে কথা শুধু সুরের ছন্দে নয় কবিতার ছন্দেও বহুলাংশে গ্রথিত হওয়ায়, এমন-কি তাঁর গানের

পাঠযোগ্যতাও অবিশ্বাস্য বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের অসতর্কতায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে প্রায়শ জড়িয়ে যায়। আমরা আলোচনার প্রারম্ভে তাঁর সাহিত্যপ্রসঙ্গে গানের কথাটা এড়িয়ে গিয়েছি বলে কোনো কোনো পাঠক অস্বস্তি ও আপত্তি প্রকাশ করতে পারেন। বাংলা সাহিত্যে অন্তত কাব্য ও সঙ্গীতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রথমাবধি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল' - প্রসঙ্গে লিখে গেছেন, 'সর্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলাম.........।' 'সারদামঙ্গল কাব্য' বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কাব্য'রূপেই পঠিত ও আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল'কে সঙ্গীতরূপে ভাবতে পছন্দ করতেন, এর প্রমাণ আছে। আর তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নামই তো 'সঙ্গীত-শতক'। এই বইখানার বিশেষত্ব, এর পদাবলীতে গান আর কবিতা, একযোগে মিশে আছে : একই অঙ্গে দুই রূপ বা দুই অঙ্গই একাকার। 'সঙ্গীতশতক'-এর সার্থক পরিচয়, এ খানা 'গান-কবিতা'র বই।

রবীন্দ্রনাথও যে সবসময়েই তাঁর গান ও কবিতার মধ্যে বিচ্ছেদকে স্পষ্টত স্বীকার করে নিতে পেরেছেন, এমন মনে করার কারণ নেই। তাঁর গানের বইয়ে কবিতা ও কবিতার বইয়ে গান : এমন তো আছেই। তা' ছাড়া, তাঁর গান-চিহ্নিত রচনাও যেমন কবিতারূপে পাঠ্য ও পরিচিত, তেমনি আবার কবিতা-চিহ্নিত রচনাও সুরসংযোগে গেয় : দেখা গেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ গান-কবিতা লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, গানও লিখেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সে-যোগ্যতাও আমাদের নেই। আমাদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এইমাত্র, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃজনমূলক সাহিত্যকর্মে সমগ্রত রবীন্দ্রসংস্কৃতির যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক গভীর, বিচিত্র ও বিস্তৃতভাবে রবীন্দ্রসংস্কৃতি ধরা পড়েছে শুধু —নিছক আলাদাভাবে ধরলেও—তাঁর গানেই। সঙ্গীতরচয়িতা, সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীতশিল্পী হিশেবে আমাদের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, 'তাঁদের তখন গানের মজলিসে ভারতবর্ষের এমন গুণিগায়ক বা বাদক কেউ ছিলেন না যাঁরা তাঁদের বাড়িতে না এসেছেন। রবিদা গান শিখেছিলেন

সুবিখ্যাত গায়ক যদুভট্টের নিকট আর সুবিখ্যাত রাধিকা গোঁসাই নিযুক্ত ছিলেন বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান শেখাতে।' তা ছাড়া আমরা সকলেই জানি, প্রথম বিদেশ-অভিজ্ঞতাই অতি তরুণ বয়সে তাঁকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত-রীতির নানান মহলে অবারিত প্রবেশাধিকার দিয়েছিল।

সঙ্গীতরসিক ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ স্বীকার করেন, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে নতুন যুগ এনেছেন। উত্তর ভারতের নানাধরনের গানের সঙ্গে যাঁর পরিচয় ছিল অতি গভীর, সেই ধূর্জটিপ্রসাদ অসংশয়ে জানিয়েছেন, 'সঙ্গীত-ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে।' ওস্তাদী-সঙ্গীতে রপ্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে ওস্তাদ ছিলেন না। অথচ, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একটানা দশখানি ভালো খেয়াল শুনে ধূর্জটিপ্রসাদ মুগ্ধ হয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, সুরের জগতে রবীন্দ্রনাথ নতুন ধারা এনেছেন, যার 'সঙ্গীত হিসাবে মূল্য তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়া কিংবা মিয়া-কী-মল্লার অপেক্ষা কম নয়।'

প্রথমদিকে, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যেমন পাশ্চাত্ত্যরীতিকে প্রশ্রয় দিযেছিলেন, তেমনি একটা সময় ছিল যখন তিনি হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। এই উভয় পর্যায়কেই সঙ্গীতে তাঁর হাতে খড়ির যুগ বা অনুকরণের যুগ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীতে এলো সৃষ্টির যুগ। কখন থেকে, কী ভাবে? এ সবের নির্ভরযোগ্য উত্তর বিশ্বস্ত মুখে শুনে নিতে পারলে বোঝা যাবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রসংস্কৃতির কতখানি?

কিন্তু এ কথাটা স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো, আমরা যে বস্তুর নাম দিয়েছি রবীন্দ্রসংস্কৃতি, তা কোনো মূলহীন তরু নয়, তা নয় 'গগন-ফুল কল্পনালতার'। রবীন্দ্রসংস্কৃতি প্রথমত, সর্বতোভাবে, বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে আত্মিকসম্বন্ধে গ্রথিত, এদের ভিন্নভাবে দেখা উচিত নয় বললে ঠিক বলা হবে না, এদের ভিন্নভাবে দেখা আজ আর সম্ভবও নয়। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিতে না পারলে রবীন্দ্রসংস্কৃতি দরিদ্রই থেকে যেত এবং বঙ্গসংস্কৃতিকে কোনোভাবেই তা সমৃদ্ধ করতে পারতো না। অর্থাৎ রবীন্দ্রসংস্কৃতির যেমন একটি বিস্তৃত পটভূমি আছে, তেমনি আছে তার পরিণাম।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই রবীন্দ্রসংস্কৃতির কতখানি? রবীন্দ্রসংস্কৃতির চিন্তায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের জন্যই বলতে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গান প্রভাবের পর্যায় পার হয়ে সৃষ্ট হয়ে উঠলো তখন: 'যখন থেকে দেশী সঙ্গীত,

অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত' করলো। তখন তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ সঠিকভাবেই বলেছেন 'দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটির ও গ্রামের সন্ধান, শূদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখনই মানুষ, জাতি, সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন। রবিবাবু যে সব গান লিখেছেন—সে সব একেবারেই নতুন, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, যার তুলনা আমাদের দেশে অন্তত নেই।' রবীন্দ্রসঙ্গীতেও দেখি বাংলা দেশী গান, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সঙ্গীতরীতি সমস্তই যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সংস্কৃতি জিনিশটা শিক্ষা বা চর্চার দ্বারাই অর্জন করতে হয়, উৎকর্ষ-সাধন অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়! সেই জন্যই কী-না জানি না, বাংলার ও বাঙালীর সংস্কৃতির কথা বাঙালীর আড্ডাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। তাই বোধ হয়, যে বাঙালী বঙ্গসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক লিখেছেন, সেই শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় 'আড্ডা' নিয়েও ভেবেছেন, 'আড্ডা' লিখেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, আড্ডার স্টাণ্ডার্ড বা মান থেকেই একটি জাতির সংস্কৃতির স্টাণ্ডার্ড সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। মধ্যযুগের ক্ষয়িষ্ণু অন্ত্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মান যদি অধঃপতিত বলে বিবেচিত হয়, তাহলে যেন মনে রাখি, বাঙালীর তদানীন্তন চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডার মান নিঃসন্দেহে অবনমিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধে সে বিষয়ে ইঙ্গিত আছে। আর সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, নগরে-গ্রামে প্রচলিত বাঙালীর সাম্প্রতিক আড্ডাগুলির চিহ্ন স্পষ্টত বিদ্যমান। বাংলা-সাহিত্যের বিপুলাংশ আজ যদি চুটকির স্তরে পৌঁছে থাকে, বাংলার সংস্কৃতি আজ যদি অগভীর, অনুকরণাত্মক এবং শহরঘেঁষা বলে মনে হয়, তা হলে সঙ্গতকারণেই বাঙালীর অধুনাতন আড্ডাগুলির বিষয়বস্তু, প্রকরণ ও চরিত্রের 'চুটকি'-স্বভাবকে স্মরণ করতে হবে।

বাঙালীর আড্ডার স্টাণ্ডার্ড অবনমিত, রবীন্দ্রনাথ একথা বুঝেছিলেন। তাঁর কৈশোরে নিজেদের বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নতুন বৌঠান, বিহারীলাল প্রমুখের ঘরোয়া আড্ডার অভিজ্ঞতা এবং তারপর বিভিন্ন পারিবারিক আড্ডার স্মৃতি থেকে তিনি নিশ্চয়ই প্রেরণা পেয়েছিলেন। আড্ডা যে কী গুরুত্বপূর্ণ ও কতখানি ফলপ্রসূ হতে পারে, তা অনুভব করেছিলেন

বলেই রবীন্দ্রনাথ আড্ডার আসর সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি থেকে পড়া যেতে পারে: 'রসবিদ্ রসস্রষ্টাদের আসর তখন একটিও ছিলো না। কলকাতার মতো এতো বড়ো শহরে এমন একটি জায়গা ছিলো না যেখানে মনের অন্দরমহল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রসিকদের সমাবেশ হতে পারতো কিংবা যেখান থেকে খাঁটি সাহিত্যরসের পরিবেশন করা যেতে পারতো রসপিপাসুদের। বিচিত্রার আসর সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ সেই দৈন্য ঘোচালেন। কতো গান যে এই সময় তৈরি করলেন তার শেষ নেই।'

রঙ্গমঞ্চ বা স্টেজ একটি জাতির ও তার সংস্কৃতির সবচেয়ে তাজা ও তেজী নিদর্শন। এমন নিখুঁত দর্পণ আর কী হতে পারে? বাংলার রঙ্গমঞ্চ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে কাজ করে গেছেন, শুধু তাঁর সেই কীর্তি নিয়েই কিছু লেখালেখি হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো অনেক প্রবন্ধ, বই রচিত হবে এই বিষয় নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ নিয়ে বাঙালীকে গবেষণা করতে হবে দীর্ঘকাল। বাংলার মঞ্চপরিকল্পনা নিয়ে, নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁর প্রায় কৈশোর থেকে অতি পরিণত বয়স পর্যন্ত। এই বিষয়েও তাঁর ভাবনা বাংলার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত, মৌলিক ধ্যান ধারণায় উজ্জীবিত অথচ এ-ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেই শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ করে সবচেয়ে বেশি ফলবান করে তুলেছেন তাঁর ভূমিকাকে। বাংলা নাটক কোন্ উৎস থেকে এলো: বাঙালী গবেষকদের কাছে এটা একটা বহু বিতর্কিত সমস্যা। বিলেতি ঢঙে স্টেজ বেঁধে বিদেশীদের অভিনয় করতে দেখে না-কি প্রাচীন যাত্রাভিনয়ের উত্তরসূরীরূপে বাংলা নাটকের আবির্ভাব: এই হলো জিজ্ঞাস্য। প্রাচীন যাত্রাভিনয়ের সংস্কার ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার দরকার কী, আর বিলেতি ঢঙে স্টেজ বেঁধে বিদেশীদের নাট্যাভিনয় করতে দেখে অব্যবহিত প্রেরণা লাভ করেছিলাম আমরা—এই হলো আমার কথা। অর্ধসত্যের বিড়ম্বনা ভোগ করে লাভ কী?

অল্পবয়স থেকে বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনয়ের ও নাট্যপ্রযোজনার মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছিল। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য ও মঞ্চবিষয়ক সক্রিয় অভিজ্ঞতার অংশীদারও ছিলেন তিনি। সরোজিনী নাটকের উপসংহার অংশের প্রুফ সংশোধন করছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

পণ্ডিত মহাশয়ের সহযোগিতায়। উচ্চকণ্ঠে পড়া হচ্ছিল শেষাংশের সংলাপ। পাশের ঘর থেকে শুনছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মনঃপূত হয় নি শেষাংশের গদ্য-সংলাপ। তিনি তৎক্ষণাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বললেন, একটা গান দিয়ে নাটকটি শেষ করা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দায়িত্ব দিলেন তাঁকেই। 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি রচনার এই ইতিহাস। দৃষ্টান্ত না বাড়িয়েও বলা যায়, নাটক রচনা, অভিনয়, নাটক প্রয়োজনা, মঞ্চ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়সে প্রায় পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য নাট্য ও মঞ্চরীতি এবং বাংলায় তার অনুকরণাত্মক প্রয়োগ ইত্যাদি এইভাবেই অধিগত হয়েছিল তাঁর। রাজা ও রাণী, বিসর্জন শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির রচনা, প্রয়োগপরিকল্পনাও তদনুরূপ। আবার মালিনী নাটকে গ্রীক নাটকের ছাঁদ দেখা দিয়েছে। পরিণত বয়সে রাজা ও রাণী যখন রূপ নিল তপতী-র, তখন রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-ভাবনাই যে কেবল পরিবর্তনের মুখ দেখলো, তা-ই নয়, নাটকের আঙ্গিকও গেল বদলে, মঞ্চভাবনাতেও দেখা দিল তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। 'দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটি ও গ্রামের সন্ধান' এক কথায় এবং সোজা কথায় বাংলার লোকসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার তাগিদ দেখা দিল এইবার। আগেও শান্তিনিকেতনে নাট্যাভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রযোজনায়-মঞ্চ পরিকল্পনায় কিছু কিছু নিজস্বতার পরিচয় সুচিহ্নিত করেছিলেন, তপতীর 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তার পরিণতি ও পরিণত নাট্যমঞ্চচিন্তার সংবাদ পাওয়া গেল : 'পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।' আমাদের দেশে সাধারণত মঞ্চ থেকে অর্থাৎ অভিনয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাটককে নিছক সাহিত্যরূপে বিচারের প্রবণতা লক্ষণীয়। অথচ, নাটক অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য মিশ্রশিল্প। অভিনীত না-হওয়া পর্যন্ত নাটকের প্রতিমা প্রাণহীন। নিতান্ত সাহিত্যরূপে এর বিচার চলতে পারে না। আবার মঞ্চসফল হলেই কোনো নাটকের সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নেই।

যাই হোক্, 'অভিনয় করে দেখানো'—এ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। তারপরের বাক্যটি : 'এই উপলক্ষ্যে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলার আবশ্যক'। নাট্যমঞ্চের আয়োজন

নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা লক্ষণীয়। এবার তাঁর পরিণত নাট্যমঞ্চচিন্তার সংবাদ: 'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। এটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।......শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সেই পর্যাপ্ত।' আঁকা ছবি ও দৃশ্যপটের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ মুখর: 'অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু, দর্শকের চিত্ত দৃষ্টিতে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না।

'আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।'

রবীন্দ্রনাথের নাট্যমঞ্চচিন্তা এইভাবেই বাংলার সংস্কৃতির অন্তর্গত আমাদের চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে হয়ে ওঠে তাঁর নিতান্তই নিজস্ব অথচ দেশীয় সংস্কৃতির উপেক্ষিত দিকটিও তার ফলে পুনর্জীবন লাভ করে সমৃদ্ধতর মহিমায়।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-নাটক-প্রযোজনা শুধু বিশিষ্ট ও উচ্চাঙ্গের ছিল বললেও কিছুই বলা হয় না। তাঁর অভিনয় ও প্রযোজনা আন্তর্জাতিক মানের তুলনাতেও কতদূর অগ্রসর, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিনয় স্মৃতি' থেকে তা জেনে রাখা উচিত: 'আমাদের বাড়িতে আমি অনেক অভিনয় দেখেছি, য়ুরোপে থাকাকালীনও প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অভিনয় আমি দেখেছি ও মুগ্ধ হয়েছি। সে সব অসাধারণ অভিনয়ের কথা স্মরণ রেখেও আমি বলছি যে 'ডাকঘর'-এর যে অভিনয় আমি দেখেছি তার মতো আশ্চর্য অভিনয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত অভিনয় আমি মাত্র আর একবার দেখেছি জীবনে, আর সেটা হচ্ছে মস্কোর ভাগ্‌তাঙ্গভ থিয়েটারে 'প্রিন্সেস তুরেনদতে'র অভিনয়।'—এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায়

আশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন। নেচে নেচে গেয়েছিলেন 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'। সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর গানের সঙ্গে বাঁশি বাজিয়েছিলেন। 'বিচিত্রা'র ঘরের পশ্চিম দিকে স্টেজ বাঁধা হয়েছিল। দড়মা দিয়ে, তার উপরে আঁকা হলো আলপনা। এ ছাড়া মঞ্চসজ্জার সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ: 'ঘরের কোনে রাখা হলো পিলসুজ আর খড়ের চালের উপরে বাবুই পাখির শূন্য বাসা।' সাতদিন ধরে অভিনয় হয়। গান্ধী, তিলক, মালবীয়জী, এ্যানি বেসান্ত প্রমুখ নেতারা এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন একদিন—অভিনয়-প্রযোজনা-মঞ্চপরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা চিন্তা অনুশীলন বাংলার লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিস্পর্ধী করে তুলতে পেরেছিল, এ থেকে এই সত্যটি পরিস্ফুট হয় যে, সংস্কৃতিচিন্তার প্রত্যেকটি দিকে ও স্তরে রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্যসৃষ্টিতে ও সমন্বয়সাধনে নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলাকেও রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে অন্বিত করেই দেখতে হবে। নৃত্যবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার উদ্বোধক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নাচেরও মূল বৈশিষ্ট্য হলো 'খাঁটি ভারতীয় আদর্শের উপর গঠিত একটি শিল্পকলাসম্মত আনন্দময় পরিবেশরচনা'। ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের নিজস্ব ধারা সমগ্র প্রাচ্যকে একদিন অনুপ্রাণিত করেছিল। একটি উচ্চ আদর্শের সন্ধান তা থেকে পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাও আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকায় প্রাচীন আদর্শকে ভিত্তি করেও রবীন্দ্রনাথ যে-নাচের প্রবর্তন করলেন, আধুনিক মন তাতে সাড়া দিয়েছে।

রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নৃত্যের বিবর্তনের ও পরিণতির ইতিহাসও কম জটিল ও বিস্তৃত নয়। রবীন্দ্র সৃষ্টিসম্ভারে কী ভাবে গান এলো, অভিনয় এলো, নৃত্য এলো, কী ভাবেই বা গানের সঙ্গে অভিনয় যুক্ত হলো এবং তার পরে গীতিনাট্য ক্রমশ নৃত্যনাট্যে এসে পৌছলো, স্বতন্ত্র শিল্পরূপে নৃত্য কী ভাবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও সংস্কৃতি-পরিকল্পনার অন্তর্গত হলো, সে ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নৃত্যপ্রযোজনার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সক্রিয় দেখি দীর্ঘকালব্যাপী। গৌণভাবে হলেও ঋতুনাট্য ও সঙ্গীতগুলিতে নৃত্যের ভঙ্গিমা কিছু ছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ষামঙ্গলের আদলে বসন্ত

ঋতুর নতুন কিছু গান নিয়ে 'বসন্ত' নামে গানের আসর বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়। এতে গানই মুখ্য হলেও কোনো কোনো গানে তাঁর পরিকল্পিত নাচও ছিল বলে জানা যায়। 'রাজা'র রূপান্তর 'অরূপরতন'-এ গান ও অভিনয়ের মধ্যে নাচ এলো। এই ক্ষেত্রেও ভারত-সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ মনে রাখলেন, আপন করে নিলেন। নাচ এলো কাথিয়াবাড় ও গুজরাটি লোকনৃত্যের আদর্শে, তার সঙ্গে ছিল 'ভাও বাতলানো'। যে অভিনব নৃত্যকলা, রবীন্দ্রমানসে কল্পরূপ গ্রহণ করেছিল, বাইরে যথোচিত বিশেষ একটি আধারের সন্ধানে সে হয়ে ওঠে ব্যগ্র। শাস্ত্রীয় নৃত্যব্যাকরণের সূত্রে গ্রথিত ভারতীয় ঘরাণার নৃত্যপদ্ধতির সংযোগ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নৃত্যপরিকল্পনায় তখন অপেক্ষিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন যেখানে নৃত্যের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন, বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন দ্বীপেও নৃত্যের যে ঐতিহ্য তিনি আহরণ করেছেন, সিংহল, চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশে সফরকালে যে নৃত্যপরিকল্পনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, সে সব কিছুই এক অবিশ্বাস্য প্রতিভার সমগ্রতাবোধ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব নৃত্যপরিকল্পনার অন্তর্গত করে নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সিংহলের ক্যাণ্ডি নৃত্য ও জাপানী পুতুল নাচ একত্র করে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' রচনা করেন, তা অভিনীত হয় জনপ্রিয় পাশ্চাত্ত্য ব্যালে নাচের আদর্শে। গান ও সামান্য অভিনয়ের সাহায্যে খাঁটি নৃত্যনাট্য রচনা করলেন—চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা। এগুলিতে দেশ-বিদেশের নৃত্যাদর্শের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়, লক্ষণীয় নৃত্যেরই প্রাধান্য। 'নবীন' গীতিনাট্যে শান্তিনিকেতনের বাঙালী ছেলেরা নাকি মণিপুরী নাচের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বাউল, রায়বেঁশে ও য়ুরোপীয় হাঙ্গেরিয়ান লোকনৃত্য মিশিয়ে অভিনয় করেছিলেন।

নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না, বার্ধক্যে পা দিয়েছেন। উদয়শঙ্কর শান্তি-নিকেতনে গিয়ে তাঁর নৃত্য প্রদর্শন করলেন। ভারতনাট্যম্ কথাকলি মণিপুরী কথক নৃত্যধারার অপূর্ব রসোত্তীর্ণ সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এবং নৃত্যকলার ক্ষেত্রে একটি বৈচিত্র্যময় স্বতন্ত্র ধারার তিনি প্রবর্তক। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের স্থান' নির্ণয়প্রসঙ্গে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে প্রবর্তিত এতদ্‌বিষয়ক যে-সিলেবাসটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে প্রথমেই দেখা যায়:

The Sangit Bhavana aims at providing instruction

in all the three branches of Indian Music, i,e., Gita (vocal music), Vadya (instrumental music) and Nritya (dancing).

নাচের সিলেবাসে ভারতীয় ও সিংহলী নৃত্যকলার স্থান তো আছেই, তাছাড়া অন্যান্য অনেক দিক থেকেই সিলেবাসটি আধুনিক নৃত্যচিন্তার সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। চার বছরের কোর্স। এই কোর্স যাঁরা শেষ করবেন তাঁদের জন্য এবং অন্যান্য অগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরো উচ্চমানের স্পেশাল ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে এই সিলেবাসে। আর আছে তৃতীয় বর্ষের জন্য অন্যতম শিক্ষণীয় প্রসঙ্গ: 'Rendering of Bengali Songs to dances'. শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রবর্তিত নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন: 'আমি পূর্বদেশের নানাস্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জাভায়, বালীতে, শ্যামে, চীনে, জাপানে; আমাদের দেশে কোচিন, মালাবার, মণিপুরে, গুজরাটে। য়ুরোপের ফোকড্যান্স এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গেও আমি পরিচিত। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে। এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করবো না যে, আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিশেছে, তার পিছনে যে সাধনা, যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমগ্রের সৌন্দর্য-বিকাশ আছে তা যে-কোনোখানেই দুর্লভ।'

শিক্ষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতীরূপে রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপরিকল্পনা করেছিলেন, তার মধ্যেও রবীন্দ্রসংস্কৃতির সমগ্রতাবোধ লক্ষণীয়। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ যথার্থ ই বলেছেন, 'গুরুদেব খণ্ডিতভাবে কোনো বিদ্যাকে অগ্রাধিকার দেন নি। তাঁর কাছে যাবতীয় বিদ্যা, ধর্মশিক্ষা, মানবসেবা, খেলাধূলা ও স্বনির্ভরতার শিক্ষা সবই ছিল মানবজীবনের পক্ষে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়।'

শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত যাবতীয় শিক্ষাই ভারতবর্ষ ও বিশ্বের সামগ্রিক সংস্কৃতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকবে: এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। প্রকৃতির অব্যবহিত সাহচর্যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করলে, তাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক শিক্ষালাভ সম্ভব হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি নিছক রোমান্টিক কবিসুলভ নয়। তিনি প্রকৃতিকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার সংকীর্ণতা তাঁর অজানা ছিল না। অজানা ছিল না নিছক মস্তিষ্ক চর্চার অস্বাস্থ্যকর পরিণতি।

কোনো এক আসন্ন বৃষ্টির দিনে ছেলেদের ক্লাস নিতে গিয়ে সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর মনে হয়েছিল, ক্লাসে ছেলেরা মন বসাতে পারছে না। ছেলেদের তিনি ছুটি দিলেন। ছেলেরা হৈ-চৈ করে মাঠে নেমে পড়লো। সুধাকান্ত বাবুরও ইচ্ছা, ছেলেদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু অতটা তাঁর সাহসে কুলোল না। কিছুক্ষণ পরে জগদানন্দ রায় মহাশয়ের সামনে পড়লেন সুধাকান্ত। জগদানন্দ কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন ছেলেদের ছেড়ে দেওয়ায়। অবশ্য বাদলা দিনে মুক্ত প্রান্তরে ক্লাস করাটা যে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হতো না বৃষ্টিতে, সেটাও জগদানন্দ বুঝলেন। তবু সুধাকান্ত ভয় পেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে তাঁর কুঠিবাড়িতে। সুধাকান্ত ক্লাস ছেড়ে দেওয়ার সঠিক কারণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দিলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫ মাঘ রবীন্দ্রনাথ সুধাকান্তকে যে উত্তর লিখলেন, তত্ত্বভারহীন সহজ গভীর সুরের সেই চিঠিখানা অল্পকথায় অনেক কথাই আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ' ....পেয়ালা ভরে তোমরা প্রকৃতির সুধার ঝরণা থেকে সুধা পান করো। একদিনও তোমাদের আনন্দ ভোজের কামাই না যাক। সেদিন যে ছেলেদের ক্লাসের বেড়া টপাটপ ডিঙিয়ে দৌড় দিতে দিয়েছিলে, সে খুব ভালো করেছিলে। আনন্দনিকেতনের আনাগোনার রাস্তাটা তাদের খুব করে চেনাশোনা হয়ে যাক। মক্কা-মদিনা, কামস্কাটকা, কোচিন, পাটাগোনিয়ার ঠিকানা তারা যখন হয় জেনে নেবে, কিন্তু বিশ্বলক্ষ্মীর স্নেহকোলের ঠিকানাটা যদি এই বয়সে খুঁজে না পায়, তবে যেদিন মস্ত পণ্ডিত হয়ে আমার মতো চোখে চশমা লাগাবে, সেদিন আর কোনো আশা থাকবে না। আর সকল শক্তির চেয়ে খুশি হয়ে ওঠবার শক্তিটা ওদের যেন পুরোপুরি ফুটে উঠতে পায়—আমার এইসব ছেলেরা যেন আকাশের আলোর সঙ্গে তাদের হাসি মেলাতে জানে এবং নববর্ষার সঙ্গে যেন তারা হৃদয়ের সুর মিলিয়ে মেঘমল্লারে নেচে উঠতে পারে। ওরা অশোক হোক, বীর হোক এবং সহজ আনন্দে ভরপুর হোক।'

কেবল 'প্রকৃতির সুধার ঝরণা থেকে সুধা পান' করা নয়, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন 'অশোক' হয়, 'বীর' হয়। সেজন্যও তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই একজন কবি, যাঁর কথায় ও কর্মে কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না। ছাত্ররা যাতে দেহে মনে সুস্থ ও সবল হয়, বিলাসিতা যাতে তাদের প্রভাবিত না করে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। এক সময়ে শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারী থেকে ভালো ভালো লেঠেল আনিয়ে ছাত্রদের লাঠিখেলা শেখানোর এবং জাপান থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে জুজুৎসুর কুশলী শিক্ষক আনিয়ে ছেলেদের জুজুৎসু ব্যায়াম শেখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শুধু ছাত্রদেরই নয়, শিক্ষকদেরও লাঠিখেলা ও জুজুৎসু শেখানোর ব্যবস্থা ছিল শান্তিনিকেতনে। পুলিনবিহারী দাসের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের ড্যাগার ছুরি খেলাও শেখানো হতো। কিছু ছেলে নিয়ে 'অভয়ব্রতী' নামে একটি গোপন দলও গঠন করা হয়েছিল। এই সব ছেলেদের ভয়হীনতা চর্চার জন্য মজার সব বন্দোবস্ত ছিল। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর শান্তিনিকেতনের স্মৃতি -চারণ করতে গিয়ে এসব কথা লিখেছেন। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল আশ্রমের উপর। ঐ দপ্তর যাঁদের চিঠিপত্র খুলে পড়তো, তাঁদের বিভিন্ন নম্বরে চিহ্নিত করা হতো। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন ১৩ নম্বরের আসামী। এই সময় শান্তিনিকেতনে সরকার বিরোধীদের গোপন ও প্রকাশ্য আনাগোনা ছিল। সরকারবিরোধী লোকজনদের সন্ধানে সরকার ও গোয়েন্দা দপ্তরের ইংরেজ ও বাঙালি বড়োকর্তারা শান্তিনিকেতনে এলে রবীন্দ্রনাথ তাদের নানা কৌশলে ফিরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আবহাওয়ার মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ তো বিশেষভাবেই ছিল স্বদেশীয়ানায় মণ্ডিত। হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১৮৬৭, এপ্রিল ১২)। 'প্রধানত ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার আয়োজন হয়েছিল। আত্ম নির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হবে, বদ্ধমূল হবে ঃ এই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য। অপরদিকে তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁক ও ফাঁকি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলেন। তাই অতি তরুণ বয়স থেকেই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, ইংরেজের শিক্ষানীতি ইংরেজের রাজনীতির সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাঁর স্বদেশচেতনা ও রাষ্ট্রচিন্তারই অন্তর্গত। তিনি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'সাধনা'য় 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বিদেশী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। শিক্ষাকে জাতীয় সমস্যারূপে অনুভব করে শিক্ষাসমস্যার স্বরূপ তিনি উদ্‌ঘাটন করলেন এবং সমাধানেরও ইঙ্গিত দিলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়

শিক্ষা আন্দোলনে বরাবর তিনি যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ আগস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' নামে যে প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেছিলেন, তাতে মুক্তকণ্ঠে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা থেকেই বুঝতে পারি, আমাদের শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে আমাদের স্বদেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করেই জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল-যে একটা উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে; ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম'।

আত্মশক্তি ও আত্মসমীক্ষাকেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান কথা বলা যায়। তাঁর শিক্ষানীতিরও মূল কথা তাই। এগুলি কী ভাবে তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত তা-ও ক্রমশ প্রকাশ্য। রাষ্ট্র ও সমাজ-সংগঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অসংখ্য রচনায় প্রকাশিত। 'স্বদেশী সমাজ' তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক কর্মধারার পরিচয় পাওয়া যায। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তিনি আবেদন-নিবেদনের পন্থাকে বরাবর ধিক্কৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা শহুরে নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাখীবন্ধন প্রথা প্রবর্তন করেন শহরে গ্রামে। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বইতে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে কৃষিনির্ভর এই দেশের গঠনমূলক কাজ কী ভাবে হওয়া উচিত, তার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই করিব ·…।' গ্রাম বাংলাকে বাঁচাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় শিলাইদহে একটি তাঁতের কারখানা তৈরি করে গ্রাম্য তাঁতী ও জোলাদের নিয়ে বস্ত্রবয়ন কাজে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন ও সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। গতানুগতিক চাষ আবাদ,. হাজাশুখা, জলাভাব, জমির অনুর্বরতা ইত্যাদির

প্রতিকার চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল। তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্রকে কৃষিবিজ্ঞান গো-পালন ইত্যাদি শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। দেশের দুটি প্রধান সমস্যা —খাদ্যসমস্যা ও বস্ত্রসমস্যা—নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনের কাজে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। অনুশীলন সমিতির কয়েকজন যুবককে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনের কাজে বেছে নিয়েছিলেন। কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী সংগঠনকর্মীর নিরন্তর শ্রমে ও সাধনায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠনের পরিকল্পনা বহুলাংশে বাস্তব রূপ নিতে পেরেছিল।

স্কুলের বাড়ি মেরামতে বহু অর্থ ব্যয় করেন রবীন্দ্রনাথ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, বিজলি বাতির ডাইনামো ইত্যাদি তৈরি হলো। এই সময় বিদেশ থেকে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ইত্যাদি গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ টাকাও পাচ্ছিলেন। স্কুলের এই ল্যাবরেটরি ইত্যাদি পরবর্তী কালে শ্রীনিকেতন নামে চিহ্নিত হয়। পল্লী-সংগঠন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেদিনের আহ্বান আধুনিক বিশ্বের বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়কদের মূল বক্তব্য থেকে খুব দূরবর্তী নয়: 'পাণ্ডিত্য ছেড়ে কাজে লাগো। প্রচণ্ড জনশক্তি শিশুর বেশে এসেছে, একে বাঁচাও, তবেই বাঁচবে।'

ফলকথা, বাংলার ভারতের বিশ্বের এবং বস্তুত মানবজীবনের সমস্ত দিকেরই চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে রবীন্দ্রসংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তাই, রবীন্দ্রসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কেবল রবীন্দ্রসাহিত্যেই নেই। আর রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যচর্চাও বিশুদ্ধ রসচর্চাই নয়।

রসচর্চা+আরো অনেক কিছুর মধ্যেই রবীন্দ্রসংস্কৃতিকে পাওয়া যাবে। সাহিত্যক্ষেত্রেও শুধু সৃষ্টি নয়, সংগঠনের দিকটিকেও তাই রবীন্দ্রনাথ যথোচিত মূল্য দিয়েছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি হিশেবে পারিভাষিক উপসমিতি ও লেখকরূপে পরিষদের সকল কার্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলা দেশের প্রচলিত মেয়েলি ছড়া ও পল্লীকবিদের রচনা সংগ্রহ করে চৈতন্য লাইব্রেরিতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ ছড়া ও লোকসাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থখানি থেকেই বুঝতে পারা যাবে,

রবীন্দ্রভাবনায় গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতি যথোচিত মর্যাদায় উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বঙ্গ-সংস্কৃতিচিন্তা তাঁর ভারতচিন্তারই অন্তর্গত, যেমন বলা যায়, তাঁর ভারতচিন্তা বিশ্বের মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে গ্রথিত। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা-রাষ্ট্রচিন্তা ও অধ্যাত্মচিন্তাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। অন্যত্র [জাতীয় শিক্ষাচিন্তা : উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল] লিখেছি : 'রবীন্দ্রনাথের কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য কাব্যপর্যায় এই প্রাচীন ভারতভ্রমণের ছন্দোবিধৃত দিনপঞ্জীর মতো। নিজের অতীতকে যে জাতি জানে না তার বর্তমানের পায়ের তলায় মাটি নেই আর ভিত্তিহীন বর্তমান কোনো স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেও তাকে চালিত করতে পারে না স্বাভাবিক ভাবেই।' . তাই, 'লোকসাহিত্য'-এ যেমন গ্রামবাংলার সংস্কৃতিচিন্তা, 'প্রাচীন সাহিত্য'-এ ভারতসংস্কৃতির সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা, তেমনই 'আধুনিক সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' বই দু'খানি তাঁর নিজের সময়ের দেশবিদেশের সাহিত্য ও সেই সূত্রে সংস্কৃতি নিয়ে বিকীর্ণ চিন্তারাজির মূল্যবান সংগ্রহ।

রবীন্দ্রসংস্কৃতি বৈচিত্র্যে ব্যাপকতায় ও গভীরতায় অসামান্য। তাঁর সুদীর্ঘ সমগ্র জীবনব্যাপী অনলস অনুশীলনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ও অনুভবের সকল দিকেরই যে অবিশ্বাস্য উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণমূলক পরিচয় প্রদানের প্রয়াস প্রায়-অসাধ্য বলা যায়।

তবু, রবীন্দ্রসংস্কৃতির স্বরূপনির্ণয়ে অগ্রসর হলে এই অনিবার্য সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতেই হয় যে, রবীন্দ্রসংস্কৃতি এক অর্থে আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতিরই নামান্তর। আবার অল্পবয়স থেকে জীবনের গোধূলিপর্যায় অবধি ভারতসংস্কৃতির স্বরূপনির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অবিরাম প্রয়াসী। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ইতিহাস নিয়ে লিখিত অসংখ্য রচনায়, সারাজীবনের বিবিধ বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতসংস্কৃতির মূল বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ যেমন সন তারিখের তালিকায় বাঁধেন নি, ভারতবর্ষের ভূগোলও তেমনই তাঁর কাছে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডমাত্র ছিল না। ভারত-ইতিহাসের অভিপ্রায় ও ভারত-সংস্কৃতির তাৎপর্য তাঁর কাছে সংকীর্ণ ছিল না বললে কমই বলা হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনি নিছক ভারতবাসীরই ইতিহাস বলে কখনো ভাবতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা, সুতরাং, বিশ্বচিন্তারই আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন—তাঁর 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে আছে—'ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে ;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।' —এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ প্রভৃতির স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটলে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, সত্য ও মঙ্গলের, পরিপূর্ণ মানবতার প্রতিষ্ঠাই আসল কথা। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি।'

তাই, রাজবংশাবলীর ধারাবাহিক তালিকায় ভারতসভ্যতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, 'যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যত বিধৃত তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়'—(ধম্মপদং : প্রাচীন সাহিত্য)। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' অন্বেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন : 'জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহেই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে, নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন কি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবে আপনার পথে চলে, সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনোখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।......সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল।......অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত

প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা।'

অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে, অভ্যাসের জড়সঞ্চয় বারবার আমাদের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও আমাদের কর্মকে সংরুদ্ধ করেছে। জটিলতা বাহ্যিকতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে সরলতা অন্তর ও এক-কে বাধামুক্ত করার জন্য যে চিত্তশক্তির প্রয়োজন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা-ও দুর্লভ ছিল না কোনো দিন। জড়ত্বের বিরুদ্ধে ভারতচিত্ত চিরকাল যুদ্ধ করেছে—'……ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক……।' সমাজের একান্ত শম্বুক বৃত্তির অচৈতন্যের মধ্যেও তার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধন চেষ্টা ভারতের মধ্যযুগে লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নানক কবীর প্রমুখ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়েছেন। কবীর সমস্ত বহিরঙ্গ ভেদ করে ভারতের অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতের সত্য সাধনা ব'লে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর পন্থীকে বিশেষভাবে ভারতপন্থী বলা হয়েছে। বুদ্ধ ও খ্রীস্টের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন মানবপ্রেমের শ্রেষ্ঠ রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনই সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটিকেই নিহিত দেখেছেন—'বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।'

অনিবার্যভাবে তাই, রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা 'পূর্ব ও পশ্চিম'-এর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়চিন্তায় পরিণামে বিশ্বমুখী হযেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কগণের সমন্বযমূলক সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেছেন, কারণ, পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের সত্যভাবেই মিলতে হবে, যা কিছু গ্রহণযোগ্য গ্রহণ না করে আমাদের অব্যাহতি নেই। মনুষ্যত্বের দ্বারা মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করার আর কোনো সহজ পন্থা নেই।

রবীন্দ্রসংস্কৃতি এইভাবেই ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার আত্মীকরণে অগ্রসর হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন,'……ভারতের কবি সৌন্দর্যের পূজার সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভূতির চেষ্টা করিয়াছেন। এই আত্মানুভূতির প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য এবং এইখানেই রবীন্দ্রসাহিত্যের সার্থকতা'। মুলকরাজ আনন্দ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন, রেনেসাঁস আন্দোলনে

আমাদের আত্মসচেতন করে তোলাই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম দান। সমগ্র জাতি হিসাবে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, মানবসম্বন্ধের বৃহত্তর পট-ভূমিকায় জীবনের দিগন্তবিসারী আয়োজনে আমরা যে নিজেদের প্রতি মুহূর্তে রচনা করে চলেছি, আবহমানকালের ভারতবর্ষ যে জীবনচাঞ্চল্যে অস্থির, এই আলোড়নে প্রতিটি দেশবাসী যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, একথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস সহজ উত্তরাধিকারের মতো রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত হওয়ারই কথা, এতে মুলকরাজ আনন্দ বিস্ময় বোধ করেন না, কিন্তু, 'উত্তরাধিকারের এত বিত্ত ও বৈভব সত্ত্বেও তিনি যে অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে ক্ষীয়মান লোকসংস্কৃতির শীর্ণ ধারার দিকে ছুটে গিয়েছেন, পাশ্চাত্ত্য আবেগ অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও যে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মতো তার বহিরঙ্গ রূপের কাছে আত্মবিক্রয় করেন নি, এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব'।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি বলতে 'চিত্তোৎকর্ষ' বুঝতেন, আগেই বলেছি। তবু, সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর করার জন্য, আমরা যাকে রবীন্দ্রসংস্কৃতি বলছি তাঁরই ধারণা অনুসারে তা কতদূর গ্রাহ্য, সেটাও বুঝে নেওয়ার জন্য শান্তিনিকেতনের ও বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে—

'আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র, তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্‌ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা প্রশাখা, মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়। ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীত বাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণতা বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণের, স্বজাতির ও বিশ্বমানবের 'চিত্তের পূর্ণতা বিকাশের' তথা 'চিত্তোৎকর্ষ'-সাধনের জন্য এই সবকিছুই অত্যন্ত জরুরি বলে জেনেছিলেন এবং এই সমস্তই তাঁরই ভাষায় 'সংস্কৃতির অন্তর্গত' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই তাঁর মনে হয়েছিল : 'এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি, কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি......'

অত্যন্ত করেই মনে রাখতে হবে, এই জবাবদিহি বাঙালি বা এমন কি ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথেরও নয়, বাঙালি+ভারতপথিক+বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের জবাবদিহি, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিয়ে যে সনাতন অস্তিত্ব : তারই নানাবিভাগে নয়, সমস্ত বিভাগেই।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসংস্কৃতি ভারতসংস্কৃতি ও বিশ্বসংস্কৃতির সমস্ত শ্রেষ্ঠ দানকে আত্মস্থ করে আবার তা সহস্রধারায় ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভারত ও বিশ্বমানবকে, আকাশের সঞ্চিত মেঘ যেমন বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীরই বুকে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সূত্র থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে তিনিই শ্রেষ্ঠ দাতা : এই রকমই আমার মনে হয়।

প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য

'ভারতচন্দ্র' শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধটির এক জায়গায় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন : 'ভরতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে।'

প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি, তিনি যে লেখকের পারিপার্শ্বিক উপেক্ষা করেই তাঁর রচনার আস্বাদনে বিশ্বাসী, তারই সাক্ষ্য দেয়। আক্ষরিক অর্থে লেখকের কুলের পরিচয় সবসময় যে লেখার রসগ্রহণে আমাদের সম্পূর্ণ সহায়ক নয়, সেকথা আমরাও মানি। কিন্তু লেখকবিশেষের রচনায় তাঁর যে মানসপ্রবণতাগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তাঁর রুচি, ইচ্ছা, আবেগ ও মেজাজ সমগ্র রচনার শরীরে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বাদ যুক্ত করে দেয়, সেইগুলির পরিচয় না পেলে কোনো রচনার রসগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না, একথাও প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কাজেই, কোনো লেখকের রচনা পাঠকালে এইসব তথ্যের দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষার যোগ্য বলে আমরা মনে করি না।'

প্রমথ চৌধুরীর রচনার পাঠক তাই একথা বিস্মৃত হতে পারে না যে, যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে পরিবেশে তিনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এবং আত্মীয়তাসূত্রে যে প্রখ্যাত পরিবারের সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু ঘনিষ্ঠ যোগ রচিত হয়েছিল, তার সবকিছুই এককথায় বনেদিয়ানা এবং বৈদগ্ধ্যে সুচিহ্নিত। জীবনের প্রথম পর্যায় তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছিল নাগরিক সভ্যতার উৎসভূমি কৃষ্ণনগরে, দীর্ঘদিনের বাসভূমি,—যেখানে তাঁর চারিত্র্য গঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে সেই বাসভূমি যে জীবনের কীর্তিময় ও কর্মচঞ্চল অংশের আলোচনায় পরিত্যাজ্য নয়, সেকথা তো তাঁর ক্লান্তিহীন স্বীকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে, 'আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর', '... আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।'

কাজেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকীর্তি পর্যালোচনার জন্য একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, তিনি সেই বিশেষ যুগ পরিবেশেই জাত ও লালিত এবং পরবর্তী জীবনে কলকাতার নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা আদ্যন্ত প্রভাবিত ও প্রণোদিত। তাঁর সমস্ত রচনাকর্মের মধ্যেই একটি ফিটফাট, রসিক, চতুর ও কৃত্রিম, শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর কৌতুকপ্রিয়তা ও রসবোধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠকের পক্ষে তৃপ্তিকর হলেও বহু প্রসঙ্গে সেই কৌতুকপ্রিয়তাই মাত্রাতিরিক্ত বলে রুচিকর হয় নি।

রচনার আপাত-ঔজ্জ্বল্য-সাধনে তিনি রীতিমতো তৎপর ছিলেন, আমাদের 'আধুনিক' মেজাজ সেই বাইরের আয়োজন দেখেই ভুলেছে। আধুনিক রচনা তো কেবল স্মার্ট রচনাই নয়, অথচ অতিশয় স্মার্ট হতে গিয়ে আধুনিক রচনা যে প্রায়শ সারশূন্য হয়ে পড়ে—'রম্যরচনা'র অজস্রতা এবং সর্বপ্রকার রচনার 'রম্যরচনা'য় পর্যবসান কি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে না? প্রমথ চৌধুরীও রচনার তীক্ষ্ণতা ও চটক সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক সময় কৌতুকের স্বচ্ছতা রক্ষা করতে পারেন নি, প্রগলভ ব্যঙ্গের ঝাঁজ রচনার লাবণ্য ও অন্তরঙ্গ রমণীয়তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর চুটকি প্রবন্ধটির একটি অংশ উদ্ধৃত করি: 'শাস্ত্রীমহাশয় বাঙালির প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পুরাকালে বাংলায় হাতি ছিল, কিন্তু বাঙালির দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এ দেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কেননা যদি সেকালে গাধা না থাকতো তো এ কালে এদেশে এত গাধা এল কোথা থেকে'। শাস্ত্রীমহাশয়ের পুরাতত্ত্ব গবেষণা প্রমথ চৌধুরীর ভালো লাগে নি, এ হওয়া সম্ভব, শাস্ত্রীমহাশয়ের গবেষণাপদ্ধতিও ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য কি কৌতুকরসাত্মক না আক্রমণাত্মক? আসলে, আতিশয্য যেখানে যেমন রুচির স্খলনও সেখানে ততটাই।

প্রমথ চৌধুরীর তর্কপ্রবণতা মাত্রা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে তাঁর সদা-সজ্জিত ভদ্র মানসিকতাকেও দ্বিধাজড়িত করে তুলেছে। তা না হলে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে তিনি খ্রীস্টধর্মের প্রচারকদের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের 'ভদ্র বিদ্রূপে'র এত প্রশংসা করেও নিজে কেন 'সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা' রক্ষা করতে পারলেন না?

প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ বর্ষণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, প্রতিপক্ষকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁদের বক্তব্য এত বেশি লঘু চালে তুলে ধরেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রায়শই তাঁদের বক্তব্য তাঁর রচনায় নিজের অভিপ্রেত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গ থেকে ছিন্ন হলে ও অন্যের অভিপ্রেত অর্থে ব্যবহৃত হলে অনেক সার কথাও খেলো কথায় পর্যবসিত হয়। অন্যের বক্তব্য লঘু চালে ব্যবহারের এই ঝোঁক তাঁর প্রবন্ধাবলীর বহু অংশে বিদ্যমান। প্রতিপক্ষের বক্তব্য ছিল এই—'একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব।' স্পষ্টই বোঝা যায়, লেখক এখানে মহৎ ও গভীর সাহিত্যপাঠের আকাঙ্ক্ষার কথাটুকুই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী মহাশয় প্রথমেই আঘাত হানলেন এই কথা বলে যে '…বাংলায় এরকম ক'জন পাঠক আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলট-পালট হয়ে গেছে?'—শাস্ত্রীমহাশয় যে নিজের প্রবন্ধ সম্বন্ধে এই দাবি উত্থাপন করেন নি, এ কথাটা চৌধুরী মহাশয় বুঝতেই পারেন নি: এ কি হতে পারে?

একেবারে নিজের গায়ে এসে না পড়লে এরই নাম বোধ হয় বীরবলী রসিকতা যার সাধারণ ধর্মই হচ্ছে গুরুতর বিষয় নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে কথার অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে প্রতিপক্ষের বক্তব্যের অভাব্য ভাষ্যরচনা। বস্তুতপক্ষে, রণে ও প্রেমে অনেকে যেমন কোনো নীতি মেনে চলাকে ভীরুতা ও বোকামি বলে মনে করেন, প্রমথ চৌধুরীও তেমনি সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সহিষ্ণু, শান্ত ও উদার নীতিকে অনেক সময়েই পরিহার করেছেন — এমনি ছিল তাঁর তর্কপ্রিয়তা।

একই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'শাস্ত্রীমহাশয় বাংলাসাহিত্যে চুটকির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চান। বড় বইয়ের যদি ধর্মই এই হয় যে, তা পড়বা মাত্র আমাদের মনের ভাবের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে, তাহলে সেরকম বই যত কম লেখা হয়, ততই ভালো। কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্তন ঘটে, তাহলে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আসবে।'

উদ্ধৃত অংশে প্রমথবাবু তাঁর বক্তব্য যেভাবে উপস্থিত করেছেন, তা খুবই চটকদারি, প্রবণতার বিচারে চুটকিও বলা যেতে পারে এবং কথাগুলি—যদি,

কারণ, তাহলে প্রভৃতি শব্দের সহায়তায় এমনভাবে: সজ্জিত, যার ফলে সেগুলি খুবই নিরীহ এবং যুক্তিপূর্ণ বলেও মনে হয়—কিন্তু বিন্যাসচাতুর্যে মূল বিষয়টি এখানেও দুঃখজনকরূপে খণ্ডিতভাবেই উপস্থাপিত। আসলে তাঁর রচনাপদ্ধতির মধ্যে এক ধরনের নৈয়ায়িকমন্যতা থাকলেও প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য ও সমালোচনা অনেক সময়েই যুক্তিনির্ভর নয়। তাঁর রচনার প্রাথমিক-পাঠে এক ধরনের 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে' পাঠকচিত্ত ঝলমল করতে থাকে, কিন্তু এ আলো যে আলেয়ার আলো, পথ ভোলায় কিন্তু মূল বিষয়ের দিশা দেয় না, তা-ও অবিলম্বে ধরা পড়ে।

তাঁর সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগিগণের একটি প্রধান দাবি এই যে, তিনি আমাদের মনের মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি ঘটিয়েছেন। কোনো কোনো উক্তি বহুকথনের ফলে যাথার্থ্যের দাবি নিয়ে আসে। তখন আর আমরা তাদের বিচার করি না, সংস্কারের মতো মেনে নি। এইটেই সবচেয়ে অনাধুনিক।

বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যায় বাংলার প্রবন্ধসাহিত্য বঙ্কিমের হাতেই আদর্শ রূপ পেয়েছে। তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আমাদের জীবনের বিবিধ দিক ও সমস্যা যথোচিত ভাষাই পেয়েছে, একথা কে অস্বীকার করবেন জানি না। মুক্ত বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মননের পরিচয় যদি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতেই কেউ না পেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর 'চোখ' নেই অথবা তিনি যে 'বস্তু'র সন্ধানী, তারই অস্তিত্ব নেই।

আসলে বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছিল তো রামমোহনের রচনার মধ্যেই, তাঁর লেখাও বুদ্ধিদীপ্ত, মার্জিত ও ভদ্র। আমি কিন্তু তাঁর ভাষাগত অপরিণতির কথা তুলছি না। তাঁর ভাব ও চিন্তার অভিনবত্ব ও আধুনিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আধুনিক শব্দটি অত্যন্ত 'রিলেটিভ', আমরা এখানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষজনিত নতুন চেতনার কথা বলতে চাইছি, উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই এদেশে যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

কাজেই মানসিক জড়তা অনেক আগেই আমাদের ভাঙতে আরম্ভ করেছিল। বিশেষত রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নিভৃত গৃহকোণের মুগ্ধ অবসর যাপনের অভিপ্রায়ে শ্রুতিসুখকর বাণী-বিন্যাসে চরিতার্থ ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন যথার্থই চিন্তানায়ক। সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধনমোচনের জন্য তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে উদ্যমী হয়েছিলেন, দূর

থেকে জীবনের অগ্নিক্ষরিত সমস্যাগুলির উষ্ণ তাপটুকু উপভোগমাত্র করেন নি, সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, জীবনের প্রত্যক্ষ ও তীব্র গরল গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল তঁাদের, কেবল বাণী-বিন্যাসেই তাঁরা বাঙালীর বেদনা দূর করার চেষ্টা করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য মননদীপ্ত প্রবন্ধাবলীর কথা দূরে থাক, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের, একজনেরও রচনাবলীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অবকাশ যাপনের জন্য উৎসর্গীকৃত সাহিত্যের তুলনাও কি চলে? এঁদের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হলো এই যে সমগ্র বাঙালী জাতির মানস-মুক্তির প্রসঙ্গে অনেকেই দেশকাল-ইতিহাস এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গুরুত্ব বিস্মৃত হয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রমথ-বন্দনায় ব্যগ্র হয়ে ওঠেন—অথচ মনের মুক্তি বুদ্ধির মুক্তি ঘটিয়ে আধুনিক চিন্তা দেশের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত করার জন্য যাঁরা সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেলেন, কেবল বড়ো কথা বলেই নিরস্ত হলেন না বড়ো কাজ করেও গেলেন, তাঁদের কথা এই পৌত্তলিক দেশের ভক্ত সম্প্রদায়েরা মনেই আনতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্য বিষয়ে একটি মূল প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, এ-কথা অনুমান করে আমরা সবিনয়ে নিবেদন করি, সাহিত্যরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য যে লোকহিত-সাধন নয়, সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সংশয় নেই। যাকে 'ক্রিয়েটিভ লিটারেচার' বলা হয়ে থাকে—তা যে বর্তমান জীবনের প্রাত্যহিক গ্লানি-মোচনের শুধুই যান্ত্রিক মাধ্যম নয় তা আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু 'সবুজপত্রের মুখপত্র' 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'র একটি অংশে সাধারণভাবে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, '...মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই তা সাহিত্য নয় তা শুধু বাক্‌ছল।'

প্রমথ চৌধুরীর এই কথাগুলি বস্তুতপক্ষে তাঁরই সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তাঁর স্বকৃত ভাষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ মুখ্যত তিনি স্রষ্টাজাতের লেখক নন, তিনি মননশীল প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবেই প্রখ্যাত—এ বিষয়ে তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন মনে হয়। তিনি লিখেছেন, 'আমি প্রবন্ধলেখক, গল্পলেখক নই।' এই হিসাবেই লোকহিত-সাধনের দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন না, বিশেষত তঁার অনেকগুলি প্রবন্ধই আপাতদৃষ্টিতে কোনো না কোনো সমস্যা অবলম্বনে রচিত। কাজেই পাঠকের এ প্রত্যাশা অন্যায় নয়

যে, তিনি উক্ত সমস্যার যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব বিশ্লেষণ উপস্থিত করবেন—অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য সেই সমস্যার উত্থাপন ও আলোচনা, সম্ভব হলে মীমাংসার নির্দেশ—গণিত শাস্ত্রাধিকারী অথবা অর্থনীতি-বিশারদের ধরনে চাই না, কারণ প্রসাদগুণহীন প্রবন্ধ সাহিত্যের এলাকাভুক্ত নয়।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়—অতুল গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—'বিগত যুগের ইংরেজ সিবিলিয়ান অ্যাসকলি সাহেব বাংলাদেশের চাষের জমির স্বত্বস্বামিত্বের এক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখেছিলেন। পরিষ্কার ঝরঝরে সুপাঠ্য লেখা। বাংলাদেশের রায়তের অবস্থা ও সে অবস্থার ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা। প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিষয়ও ঐ এক কথা। কিন্তু সে কথা তাঁর হাতে হয়েছে 'রায়তের কথা'।'

অ্যাসকলি সাহেবের লেখা আমরা পড়ি নি। ভূমিকালেখক অতুল গুপ্ত মহাশয়ের মতে সে লেখা বাংলাদেশের রায়তের অবস্থা ও সে অবস্থার ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা হয়েও 'পরিষ্কার ঝরঝরে সুপাঠ্য লেখা।' প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েও শিল্পগুণসমৃদ্ধ। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় শিল্পগুণ তো আছেই। বস্তুত, এ বিষয়ে লেখকের অতিসচেতনতাই আমাদের পক্ষে অস্বস্তিকর। শিল্পের সম্মানেই কি তা পরিহার্য নয়? এই অতিসচেতনতা? 'রাযতের কথা' অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে। কেননা আমাদের প্রবন্ধের প্রথমাংশেই উল্লেখ করেছি—প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে যে অভিজাত মানুষটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়—তিনি তাঁর সুসজ্জিত ড্রইংরুমের অতি-নির্বাচিত, মার্জিত ও বিদগ্ধ গোষ্ঠীর জন্যই তাঁর বিবিধবিষয়ক ধারণা-গুলিকে পরিবেশন করে গেছেন। সাধারণ মানুষ এবং প্রত্যক্ষ জীবনপ্রবাহ সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় নি। যে জীবন তাঁর রচনায় প্রতিফলিত, তা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী এক শ্রেণীর মানুষের জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র। তাঁর অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র' (উত্তরসূরী পত্রিকার ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—'যে বহু নিন্দিত নাগরিকতা সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য গতিতে গ্রামীন সফলতাপুষ্ট বাংলার উপর এসে চেপে বসেছে, প্রমথ চৌধুরী হলেন সেই নাগরিকতার ভাষ্যকার।...ভাষ্যকার কিন্তু

চিত্রকর নন। তাই নাগরিক মানুষের বহু বিচিত্র আলেখ্য সজীব হয়ে তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে নি, ফুটে ওঠে নি সবুজপত্রে। ধনীর বিলাসকক্ষের বহু নীচে কানাগলির মধ্যে কুলি মজুরের ডেরায় যে দুর্নীতি ও ব্যভিচার নীচতা ও দীনতা জমে থাকে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে তা চিত্রিত হয় নি। তিনি নিজেই বলেছেন, লেখাপড়া তাঁর পেশা, নেশা, কাজ আর খেলা। নিজেকে বরাবর বলেছেন, উদাসীন গ্রন্থকীট। তাই লেখাপড়ার পরিবেশেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে গৃহকোণে, পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়ান নি। নানা শ্রেণীর মানুষকে জানবার যে সুযোগ তিনি বাল্যে লাভ করেছিলেন, যৌবনে তা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। সমজাতের এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন।'

প্রমথবাবুর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীর এই কথাগুলি থেকেই তাঁর মন, মেজাজ এবং অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা আর সাধারণ মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে তাঁর ঔদাসীন্য বোঝা যায়। প্রমথবাবুর জীবনদর্শনের এই অগভীরতা তাঁর রচনার অধিকাংশ স্থলে একটা অতিতরল, ভাসা-ভাসা ভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বিস্ময়কর মনে হয় বহু সাহিত্য-সমালোচকের এই সিদ্ধান্ত যে, তিনি বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে ঋজুতা, তীক্ষ্ণতা, স্পষ্টতা ও সংযত বুদ্ধিবাদের আমদানি করেছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রবন্ধের বহুলাংশ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণায় বিড়ম্বিত, কথার মারপ্যাঁচ দেখানোর মোহে মূল বিষয়ের প্রতি তিনি অধিকাংশ সময় সুবিচার করতে পারেন নি।

'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থে শ্রীঅজিত দত্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, তা এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিল বুদ্ধিসর্বস্ব। আবেগবর্জিত বুদ্ধির প্রাবল্য মানুষকে স্বভাবতই বিতণ্ডাপরায়ণ করে তোলে।' প্রমথ চৌধুরীর রচনার সাধারণ ধর্মই এই তর্কপ্রবণতা। এ বস্তু একই সঙ্গে তাঁর রচনার দোষ ও গুণ দুই-ই। গুণের দিকটাতেই এ পর্যন্ত বড়ো বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ যে একটি গুরুতর ত্রুটিও সে কথাটা তেমন বলা হয় নি। এই তর্কপ্রবণতার ফলে তাঁর গদ্যে একটা বহিরঙ্গ ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু বক্তব্যের প্রাণকে বিচলিত করেই এই ঔজ্জ্বল্যের আবির্ভাব। তাছাড়া তর্কটাই তাঁকে এমন পেয়ে বসতো যে একটি প্রবন্ধে এক বিষয়ে যা বলেছেন—অপর রচনায়

তারই প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। এইসব ক্ষেত্রে প্রমথবাবুর ব্যক্তিত্বের দ্বিধা প্রকট।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় রচনার মধ্যে 'প্রসাদগুণের সঞ্চার' পছন্দ করতেন এবং এই সাহিত্যিক মেজাজের দিক থেকে এক গোত্রের বলে 'প্রসাদগুণসম্পন্ন' এবং 'রসাল' ভাষায় কাব্য রচনা যাঁর লক্ষ্য ছিল, সেই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের চতুর রচনার তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। অর্থাৎ রচনাকে 'মুখরোচক' করে তোলার জন্য প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গচ্যুতি, ভাষায় তারল্য সব কিছুকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। অথচ 'চুটকি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নানারকম সত্য ও ব্যঞ্জনা এক সঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে বত্রিশ ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে, তাও মশলা থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না।' সমস্ত মন্তব্যটিকেই ব্যুমেরাং-এর মতো নিষ্ঠুর নিয়তি প্রমথবাবুর রচনার উদ্দেশ্যেই নিক্ষেপ করে দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় মশলা বড়ো বেশি, 'বস্তু' সেই তুলনায় নেই বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধের প্রতিবাদে রচিত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের সমালোচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে। এই সমালোচনাও যুক্তিপূর্ণ নয়। এমন কি অন্যান্য রচনায় প্রকাশিত তাঁর নিজের বক্তব্যকেও তিনি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন বার বার। সাহিত্য বাস্তব-ভিত্তিক, এই মত প্রকাশ করতে গিয়ে রাধাকমল একটি উপমার আশ্রয় নিয়ে বলেছিলেন: 'মৃণাল না থাকিলে লতিকা না থাকিলে, পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে?' উপমাটির প্রমথ চৌধুরী-কৃত ভাষ্য—'…মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকবে না। তবে, মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না। সম্ভবত তাঁর মতে যে যার নীচে থাকে সেই তার বাস্তব।' স্বতন্ত্র বিচারে প্রমথবাবুর এই পরিহাস উপভোগ করায় আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু প্রতিপক্ষের বক্তব্যের উদ্দেশ্যমূলক উপস্থাপনা বীরবলী রসিকতার মোড়কেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা যায় না।

রাধাকমলবাবু তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছিলেন—'সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।' প্রমথবাবু আলোচ্য

প্রবন্ধে এ মত স্বীকার করেন নি। অথচ সবুজপত্রের মুখপত্রে তাঁর পত্রিকার আদর্শ হিসাবেই এই একই সত্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—তাঁর উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করে দিচ্ছি'···এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য—বাদবাকি সব লেখা কাজের নয়, বাজে।' এইসব দৃষ্টান্ত তাঁর প্রবন্ধাবলী যত বিশ্লেষণ করা যাবে, ততই বাড়তে থাকবে। কিন্তু তাঁর তর্কপ্রবণতা তাঁকে যে প্রায়শই স্ববিরোধ এবং প্রতিপক্ষের প্রতি অবিচারে প্রণোদিত করেছে, সেই সত্য আশা করি এতক্ষণে পরিস্ফুট হয়েছে।

এইবার আমরা তাঁর সম্বন্ধে বহু কথিত একটি দাবির যাথার্থ্যনির্ণয়ে অগ্রসর হব। বুদ্ধদেব বসু প্রমথ চৌধুরীর একান্ত অনুরাগী। তাঁর 'কালের পুতুল' নামক গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত দুটি আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে তাঁর (১) অগোছালো, এলোমেলো রচনার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরীর উজ্জ্বল বিদ্রোহ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলো, কিংবা (২) ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, অকারণ বিশেষণ প্রয়োগ, অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি প্রভৃতি যে সব দুর্লক্ষণ বাংলা গদ্যের অভিশাপ, তিনি তাঁর রচনায় উচ্ছেদ করেছেন—প্রভৃতি দাবিগুলি যে স্বীকারযোগ্য নয় তা আমরা পূর্বেই দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা ভাষায় চলিত গদ্যের প্রবর্তকরূপে স্বীকার করা যায় কি না এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর প্রাক্-প্রমথ বাংলা গদ্যের বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ না-হলেও তথ্যবর্জিত নয়।

'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য' নামক প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চলতি ভাষা নতুন ছিলো না। সতেরো বছর বয়সে লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' ও তারপরে ছিন্নপত্রে, নাট্যাবলীর কথোপকথনে হাস্যকৌতুকের কোনো কোনো রচনায় যে চলতি ভাষা তিনি লিখেছেন, আজকের দিনেও তা নবীন লেখকের আদর্শ হতে পারে না তা নয়। তবু কোথায় যেন একটু দ্বিধা ছিল।'

এই দ্বিধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে ক্রমশ চলতি গদ্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, বুদ্ধদেবও সেকথা স্বীকার করেন। 'চতুরঙ্গ' এবং 'জীবনস্মৃতি'র গদ্য যে চলতি ভাষার ঠাটেই লেখা, সেকথা অবশ্যস্বীকার্য। এই কথাগুলি এবং তার সঙ্গে আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক সত্য মনে রেখে বাংলা ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর চলতি গদ্য বিষয়ক দানের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে।

এবার আমি যে সব লেখকের নাম উল্লেখ করবো—তাঁরা সকলেই যে সচেতনভাবে চলতি রীতি অবতারণার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন, সেকথা যেন কেউ না মনে করেন। কিন্তু কথ্যভাষাশ্রয়ী রচনারীতির যে-কোনো বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তও এই প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচনার অন্তর্গত হওয়া উচিত এইজন্য যে, তা থেকে আমরা বুঝতে পারবো শুধু ভাষারই নয়, দেশ-কাল-পাত্রের আভ্যন্তরীণ প্রবণতা ও দাবি অনুসারেই রচনারীতি বিকশিত হয়।

১। উইলিঅম কেরির নামে প্রচলিত Dialogue intended to facilitate the acquiring of the Bengali language অর্থাৎ কথোপকথন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন গুলির কয়েকটির বচনারীতি কথ্যভাষাশ্রয়ী। বিদেশী ছাত্রদের ব্যবহারের ও শিক্ষা-উপযোগী গদ্য নিদর্শন তুলে ধরাই ছিল এ-বইয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু কথ্যভাষাশ্রয়ী গদ্যরীতির প্রথম দৃষ্টান্তের একটি নিজস্ব ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। বিশেষত ভিন্ন উপলক্ষ্য আশ্রয় করে ছাপার হরফে এই নতুন গদ্যরীতিব চেহারাটা আমাদের অনভ্যস্ত দৃষ্টির সামনে সেই প্রথম এসে দাঁড়াতে পাবলো।

২। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (আনুমানিক রচনাকাল ১৮১৩, প্রকাশ ১৮৩৩) গ্রন্থে অনুসৃত তিনটি বিভিন্ন রচনারীতির অন্যতম ছিল কথ্যরীতি। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'কথ্য ভাষামূলক অংশগুলি প্রাঞ্জল'। স্বভাবতই, 'সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে'ই 'প্রাঞ্জল'।

৩। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা'র রচনারীতি কথ্যভাষাশ্রিত তো ছিলোই, তা'ছাড়া ছিলো 'প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ফারসী শব্দের ব্যবহার' এবং 'ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ' (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : ডঃ সুকুমার সেন)। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে 'সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ফারসী শব্দের এবং কথ্যভাষাসুলভ বাক্যাংশ বা ইডিঅম এবং আভাণক বা প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ' লক্ষ করতে হবে। এর ভাষাও কোনোমতেই চলতি রীতি-প্রধান নয়, বরং মিশ্র সাধুভাষাই এর বৈশিষ্ট্য। তবু মনে রাখতে হবে 'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়' (মাসিক

পত্রিকা'র প্রত্যেকটি সংখ্যার শীর্ষে থাকতো এই সম্পাদকীয় মন্তব্য) সেই সহজ ও সর্বজনবোধ্য ভাষাই ছিল 'মাসিক পত্রিকা'-গোষ্ঠীর অম্বিষ্ট। এই সহজ রচনারীতির অন্বেষণ-ব্যাকুলতা প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের কত আগে থেকে দেখা দিচ্ছিল।

৪। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১) নির্ভেজাল কথ্যভাষার ঢঙে লেখা। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রদ্ধেয় সমালোচকও সুবিচার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এই গ্রন্থের ভাষাও, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের উপযুক্ত ঘনিষ্ঠ সন্ধিৎসা এখনও অর্জন করতে পারলো না। তবু, একটি বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা প্রসঙ্গে হুতোমের গদ্য নিয়ে 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থে শ্রীঅজিত দত্ত যতটুকু আলোচনার অবসর পেয়েছেন, তার মধ্যেই অত্যন্ত দৃঢ়ভঙ্গিতে এই গদ্যের পক্ষে তিনি যে দাবি তুলেছেন, তা খুবই সঙ্গত বলে মনে হয়। তিনি হুতোমের উদার আধুনিক মন ও ইতিহাসবোধের উল্লেখ করে তাঁর গদ্যরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হুতোমি ভাষা যে কী আশ্চর্যরূপে আধুনিক ও শক্তিশালী ভাষা, তা যে-কোনো পাঠকই অনুভব করবেন। প্রকৃতপক্ষে হুতোমই বাংলায় প্রথম চলতি ভাষারীতির প্রবর্তক।'

মনে রাখতে হবে, 'হুতোমি' ভাষা-সৃষ্টির প্রায় ষাট বৎসর পরে প্রমথ চৌধুরী চলতিভাষার অনুকূলে কাজ আরম্ভ করেন।

'নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো।' —এই দুটি বাক্যের সুনিপুণ, রুচিকর, সাহিত্যিক ও স্নিগ্ধ বিন্যাসের জন্যও চলতি রীতির অনুরাগী পাঠক 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন। যদিও এমন রচনাংশ তাঁর লেখায় বিরল নয়। বরং প্রকাশের তীব্রতা ও প্রত্যক্ষতাগুণের জন্য কথ্যভঙ্গি এবং প্রচলিত নানা বুলি উদার আমন্ত্রণে সমবেত করে তিনি সাহিত্যিক বোধ-বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন, বলতে হয়।

৫। চলতি গদ্যরীতি প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়া উচিত। তাঁর নামে প্রচারিত অনেক বাংলা রচনাই অবশ্য ইংরেজি থেকে অন্যকৃত অনুবাদ। কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থগুলি পড়লে তাঁর গদ্যশিল্পের একটা পরিণত চেহারা পাওয়া যায়। সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত না হলেও তাঁর গদ্যে যে শক্তি ও সৌন্দর্যের সন্নিবেশ লক্ষ্য করি, তার মূল্য অপরিসীম। চলতি

গদ্য নিয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন—বলিষ্ঠ চিন্তা। স্বামীজি চলতি ভাষাকে চালাবার জন্য নিজে চেষ্টা করেছিলেন, সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখে চলেছেন, ঐ সাধুভাষার কাছে তখনও আমাদের অনেক কিছু প্রাপ্য ছিল।

৬। এবং এই তথ্য কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে, চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একজন অসামান্য সাহিত্যশিল্পীও ছিলেন? আর তাঁর 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯, ১৯৩১) প্রভৃতি কাহিনী-গ্রন্থগুলির গদ্যরীতি আমাদের সাহিত্যে যেমন অভিনব, তেমনই অবিস্মরণীয়।

৭। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'র কথা বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় বলতেই হয়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত এই গ্রন্থটির ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের চতুর্থ সংস্করণের ১৬-১৭ পৃষ্ঠা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি—

'আমি একবার জমিদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়ীতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘনঘটা, বেগে বায়ু উঠিয়াছে, পদ্মা তোলপাড় হইতেছে। মাঝিরা ভারি তুফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল। সেই কিনারাতেও তরঙ্গে বোট স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহুদিন বিদেশে, শীঘ্র বাড়ীতে আসিতে বড় ইচ্ছা। বেলা চারিটার সময়, একটু বাতাস কমিলে আমি মাঝিকে বলিলাম যে, 'এখন নৌকা ছাড়িতে পারিবি?' সে বলিল, 'হুজুরের হুকুম হয়তো পারি।' আমি মাঝিকে বললাম, 'তবে ছাড়্।' তারপর দেখি, সময় চলিয়া যায়, তবু নৌকা ছাড়ে না। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তবু ছাড়ে না। মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুই যে বল্লি হুজুরের হুকুম হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারি', আমি তো হুকুম দিয়াছি, তবে এখনও ছাড়িলি না কেন? এখন একটু ঝড় থামিয়াছে, আবার কখন ঝড় উঠিবে, তাহার ঠিক নাই। যদি ছাড়িতে হয় তো এখনি ছাড়্।' সে বলিল যে, 'বৃদ্ধ দেয়ানজী বলিলেন, 'ওরে মাঝি, এমন কর্ম কি করিতে হয়? একে এই সরদার মোহানা, কূল-কিনারা কিছুই দেখা যায় না, তাহাতে শ্রাবণের সংক্রান্তি। ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা কিনারাতেই থাকিতে পারিতেছে না। তুই কি না এই অবেলায় এহেন পদ্মায় পাড়ি দিতে চাস্?' দেয়ানজীর

এই কথায় ভয় পেয়ে আমি নৌকা ছাড়িতে পারি নাই।' আমি বলিলাম, 'ছাড়্'। সে অমনি নৌকা খুলে পাইল তুলে দিলে। অমনি বাতাসের এক ধাক্কায় নৌকা পদ্মার মধ্যে চলিয়া গেল। হাজার নৌকা কিনারায় বাঁধা ছিল। তাহারা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল, 'এখন যাবেন না, যাবেন না।' তখন আমার হৃদয় ডুবিয়া গেল। কি করি, আর ফিরিবার উপায় নাই, নৌকা পাইল পাইয়া শাঁ শাঁ করিয়া চলিতে লাগিল। খানিক গিয়া দেখি যে, তরঙ্গে তরঙ্গে জল ফাঁপিয়া সম্মুখে যেন একটা দেওয়াল উঠিয়াছে। নৌকা তাহাকে ভেদ করিতে ছুটিল, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময়ে অদূরে দেখি, একখানা ডিঙ্গি হাবুডুবু খাইতে খাইতে মোচার খোলার মতো ওপার হইতে আসিতেছে। তার মাঝি আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ভয় নাই, চলে যান।' আমার উৎসাহে উৎসাহের স্বর মিশাইয়া এমন ভরসা দেয় কে? আমি এইরূপ সায় চাই। কিন্তু হা! তা আর কে দিবে?'

এই গদ্যের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়, ক্রিয়াপদসমেত সমস্ত ক্ষেত্রে এ-ভাষা যুগান্তর সৃষ্টির উপক্রম রচনা করেছে। আর সমগ্র অংশটির মধ্যে যে সরল-সুন্দর গদ্যভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে, তথাকথিত সাধু গদ্যের সমস্ত রকম কৃত্রিমতা থেকে তা মুক্ত। যে সর্বভারমুক্ত সংক্ষিপ্ত প্রকাশভঙ্গি, ক্ষিপ্রগতি ও স্বচ্ছতা চলতি ভাষার গুণ—তার পরিচয় দেবেন্দ্রনাথের গদ্যে আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অভিমত [অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত: 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ'—শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ড] উল্লেখযোগ্য। তিনিও লক্ষ্য করেছেন'...রবীন্দ্রীয় গদ্য সবুজপত্রের বহু পূর্ব থেকেই মৌলিক ভঙ্গিকে স্বীকার করে নিচ্ছিল।' তা'ছাড়া প্রমথ চৌধুরীকে চলতি রীতির প্রথম প্রবর্তকরূপে ভাবা আমাদের এত বেশি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, এর অন্যথা হলে আমরা বিস্মিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠি। এখনও পর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত অনেক আধুনিক ব্যক্তি প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের ভক্ত। তাঁর গদ্যের শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিরোধাভাস প্রভৃতি নানা রকমের তির্যকভঙ্গি চিন্তা ও বাক্যের 'মারপ্যাঁচ' অনেককেই হয়তো খুশি করে, কিন্তু তাঁর গদ্য আমাদের কখনও কি ভিতর দিকে টানে? প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের ঐ সব বহিরঙ্গ 'অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব হলেও নিশ্চয়ই সাধারণভাবে চলতি রীতির বিশেষত্ব নয়।' দুঃখের বিষয় অনেকেই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যকে চলতি

রীতির গদ্যের পরাকাষ্ঠা মনে করেন। কিন্তু আবার প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি স্মরণ করা যাক,—'এ গুলি যদি ভাষাপ্রকৃতিরই লক্ষণ হতো, তবে পরবর্তী এই রীতির গদ্যেও এই লক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকতো। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সাময়িকভাবে, বিশেষত 'শেষের কবিতা'য় প্রমথ চৌধুরীর অলংকার-কৌতুকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু চলতি রীতি প্রয়োগে আসলে তিনি সম্পূর্ণ নিজের আদর্শেই চলেছিলেন। চলতি রীতির সাহিত্যিক রূপ তিনি নিজেই গড়ে নিয়েছিলেন। যেগুলি নিছক শব্দক্রীড়া বা কথার কৌশল, রবীন্দ্রনাথ তাই দিয়ে তাঁর রচনাকে সাজান নি, কিন্তু বাক্যের মধ্যে অর্থের নমনীয়তা এনে কৌতুকরস সঞ্চার করা, অপ্রত্যাশিত অর্থ বা বাক্য যোজনা করে পাঠককে চকিত করা এসব রীতি রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্রের পূর্বে গল্পগুচ্ছ ও অন্যান্য রচনাতেই ছিল, তবে তাঁর রচনার সামগ্রিক বক্তব্যের অনুকূলেই তারা প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গিতে এই রীতি সমগ্র বক্তব্যের থেকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন থেকে বুদ্ধিগত শব্দক্রীড়া বা অর্থক্রীড়ায় পরিণত হয় মাত্র।'

এই আলোচনার অন্যত্র 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর যে প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছি, সেখানেই লেখক একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন: 'প্রমথবাবুর নিজের গদ্য অত্যন্ত কৃত্রিম, আর যাই হোক, তাকে বাঙালীর মুখের ভাষা বলে না।'

বাংলায় চলতি রীতির গদ্য প্রবর্তনের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা একমাত্র নয়, প্রধানতমও নয় সেই ভূমিকা। তবু যে মর্যাদা তিনি অসঙ্গতরূপে একক ভোগ করে আসছেন, তার কারণ তাঁর হাতে ছিল 'সবুজপত্র,' পাশে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েকজন শক্তিশালী লেখকও ছিলেন তাঁর অনুরাগী। তবু এই ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর উদ্যম একটি গোষ্ঠী ও পত্রিকাকে অবলম্বন করে প্রকাশ পাওয়ায় বিষয়টি সর্বজনগোচর হতে পেরেছিল। গদ্যরীতিবিষয়ক বিতর্কও অনেক দ্বিধাগ্রস্ত নবীন লেখকের মনে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আত্মীয়-বন্ধুটি সম্বন্ধে যে সুগভীর প্রীতি পোষণ করতেন, 'চিঠিপত্র'-এর পঞ্চম খণ্ড পড়লেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর মতামত ও সমালোচনার মূল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বড়ো কম ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গে অনেকেই, প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথকে কী ভাবে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন, তার সবিশেষ উল্লেখ করেন। কিন্তু একথাটাও মনে রাখা দরকার প্রমথ চৌধুরীকে সাহিত্য রচনায় ব্যাপকভাবে

প্রবৃত্ত করায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা অপরিহার্য হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একতা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ : শ্রীনির্মাল্য আচার্য) সঠিকভাবেই মন্তব্য করা হয়েছে : 'অন্যায় বা বিরূপ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হতেন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁর চেয়েও আহত হতেন। প্রমথ চৌধুরীর মানসিক গঠনে কোথায় যেন তাঁর ভাবাবেগ চাপা পড়ে থাকতো। সম্ভবত তা শেষ জীবনে তীব্র স্নায়বিক বিকারে পৌছেছিল। রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁকে সর্বদাই ভরসা দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন।'

প্রমথ চৌধুরী নিজেও তাঁর সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রেরণা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। আমি তাঁদের রচনারীতি ও চিন্তা-ভঙ্গির সাদৃশ্যের কথা ভাবছিই না। কারণ সেক্ষেত্রে কোনো সাদৃশ্য ছিলোই না। সাহিত্যাদর্শের বিচারেও প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর কৃষ্ণ-নাগরিক প্রতিবেশী দ্বিজেন্দ্রলালেরই অনেক কাছাকাছি ছিলেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপে দু'জনেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ভাবাবেগ ও স্পর্শকাতরতা তাঁদের নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও এগুলিকে অন্যের রচনায় তাঁরা 'ন্যাকামি' মনে করতেন, উপদেশাত্মক ভঙ্গি দু'জনেরই ছিলো, যদিও তাঁরা একে 'জ্যাঠামি' বলে ভাবতেন। গভীরতাসন্ধানী ছিলেন না কেউ। দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁচা আবেগ ও প্রমথ চৌধুরী কাঁচা উত্তেজনায় তাঁদের রচনা ভারাক্রান্ত করেছেন। রচনা-কালে অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব-কল্পনা দু'জনেরই লেখনীকে উদ্বেলিত করতো। পরমত-অসহিষ্ণুতা তাঁদের মধ্যে অপর সাদৃশ্যসূত্র, সন্দেহ নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এই প্রসঙ্গে যথোচিত ঔদার্য ও প্রীতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রের দানের কথা ঘোষণা করেছেন। 'গল্পসংগ্রহ'-এর ভূমিকায় দেখি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : '...আমি যখন সাময়িকপত্র-চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ তখন প্রমথ'র আহ্বান মাত্র 'সবুজপত্র' বাহকতায় তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্যসাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারতো না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব।...'

মনে রাখতে হবে সাহিত্যের এই নূতন 'ভূমিকা' বা 'নূতন পথ' রচনায়

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য, উপদেশ ও নির্দেশ সবচেয়ে বড়ো ও অপরিহার্য অংশ ছিলো। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হলে দেখা যেত, কোনো ব্যক্তিবিশেষ, বা তাঁর রচনার দ্বারা তিনি কখনও মূলত প্রভাবিত হন নি। কৈশোর রচনার কথা ঠিক ধরছি না কিন্তু আমার ধারণা তাঁর নিতান্ত প্রথম পর্যায়ের রচনাও প্রকরণে ততটা না হলেও ভাবনা-ভঙ্গিতে বেশ স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হলে আমাদের অভ্যস্ত ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে (দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়'। ১৯৬৯)।

যাই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকেই সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে যেমন, তেমনি আমাদের বাংলা সাহিত্যেও নতুন চিন্তাভঙ্গি, আনুষঙ্গিক রূপ ও নূতন প্রকাশরীতির জন্য ব্যাকুলতা জেগেছিল। সেই ঐতিহাসিক তাগিদই প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর উদ্যমে সহায়তায় বহুমুখে ছড়িয়ে পড়লো। ঐতিহাসিক তাগিদ এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাকুলতাবোধটাই মুখ্য, প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর পত্রিকা অন্যতম উপলক্ষ মাত্র। অন্যতম উপলক্ষকে একমাত্র কিংবা প্রধান কারণ রূপে নির্দেশ করাটা অবৈজ্ঞানিক।

এই প্রসঙ্গেই 'আধুনিকতা' ও প্রমথ চৌধুরী বিষয়টি পর্যালোচনার যোগ্য বলে মনে হয়। অনেক ধরে নেওয়া ও মেনে নেওয়া বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি যে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, প্রমথ চৌধুরীই আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। এ সম্বন্ধেও আমার ধারণা পূর্ববৎ। আধুনিকতা একটি দৃষ্টিভঙ্গির নাম। এই জিনিশ কোনো ব্যক্তি বা পত্রিকার একক দান হতে পারে না। এ-ও যুগের আভ্যন্তরীণ তাগিদ থেকে উদ্ভূত। এবং G. H. Mair যেমন তাঁর Modern English Literature গ্রন্থে 'Renaissance' এর সংজ্ঞা নির্ণয় ও মর্মব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"The Renaissance was and was the result of a numerous and various series of events which followed and accompanied one another from the fourteenth to the beginning of the sixteenth centuries." আধুনিকতাও তেমনি কোনো দেশেই কোনো সাহিত্যেই একটি বিশেষ তারিখে বিশেষ ঘটনা থেকে জাত হয় নি। বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা ও উদ্যমের সামগ্রিক ফল হিশেবে এই বস্তু আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

উপরের উদ্ধৃতিতে 'Renaissance'-এর পরিবর্তে 'আধুনিকতা' এবং 'from the fourteenth to the beginning of the sixteenth centuries'-এর পরিবর্তে আমরা যদি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর কালপরিমাণকে হিশেবের মধ্যে রাখি, তাহলেই 'সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরী' প্রসঙ্গে আতিশয্যহীন, স্বাভাবিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

শরৎচন্দ্র : প্রসঙ্গ ও পুনর্বিবেচনা

যে শরৎচন্দ্র একদিন পরিচিত জগৎসংসারের অকথিত গল্পমালা শুনিয়ে একটি সমগ্র জাতিকে বিস্ময়ে-অভিভূত পুলকে-শিহরিত করে রাতারাতি জয় করে নিয়েছিলেন, বাঙালী লেখককুলের মধ্যে 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' উচ্চারণের অধিকার যাঁর সবচেয়ে বেশি : তাঁর সম্বন্ধেই গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে এক প্রায় অবিশ্বাস্য শীতলতা অনুভব করে এসেছি আমরা। 'আধুনিক' পাঠকদের, সমালোচকদের ঔদাসীন্য তাঁর প্রসঙ্গে মর্মান্তিক বলে অনুভব করেছি। শুধু কি তাই ? শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই অনীহা-যুগের সমকালীন হওয়ায়, আমরাও সংশয় অনুভব না করে পারি নি তাঁর প্রতিভার, সৃষ্টির চিরত্বে। শরৎসাহিত্য সম্পর্কে অনীহাব্যাধিতে কমবেশি আক্রান্ত হওয়ার মতো সময়টাই।

মনে রাখতে হবে, শরৎচন্দ্র বা তাঁর সাহিত্য অথবা সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে বিরুদ্ধতা ততটা নয়, আমরা যে পরিবেশে তরুণ বয়সের সাহিত্যপাঠ সাঙ্গ করেছি, সেটা ছিল শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতার কাল। এখনও পর্যন্ত সেই ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা, তথাকথিত আধুনিক মহলে রীতিমতো বিদ্যমান। বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ এই ঔদাসীন্য চলে আসার ফলে এখনকার তরুণ-তরুণীরাও শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহলও বোধ করেন বলে মনে হয় না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত শরৎসাহিত্যের অংশবিশেষ সম্বন্ধে নিতান্ত ভাসা-ভাসা ধারণা ছাড়া সামগ্রিকভাবে শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান শোচনীয়রূপে বিভ্রান্তিকর। আসলে সেটাও ততটা দুঃখজনক নয়, যতখানি পরিতাপজনক হলো, শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা ও জ্ঞান না থাকাটাকেই বাহাদুরি বলে মনে করা। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বা তাঁর সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহল থাকাটাকে অনাধুনিকতা বলে বিশ্বাস করাটাই এ কালের অল্পবয়সীদের দুর্মরতম কুসংস্কার।

বিপদটা গভীরতর। কেননা, শুধু অল্পবয়সীরাই নন, শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশের বিষয়টিকে এখনকার বহু বুদ্ধিজীবীও সন্তর্পণে এড়িয়ে যান। শরৎচন্দ্রের নামাঙ্কিত পুরস্কার ও আনুষঙ্গিক বিবিধ সুযোগসুবিধালাভের জন্ম ইঁদুর দৌড়ে আমরা থাকতে পারি, কিন্তু শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে নিজেরা অনুশীলন করতে এবং অন্যদের অনুশীলন করতে দিতে আমাদের অকৃপণ উৎসাহ নেই। আনুষঙ্গিক লাভের লোভে যে কোনো স্তরের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আসরে-বাসরে আছি, কিন্তু 'আর এক পাটি 'পাম্প'-নামক আধুনিক মেজাজ-মর্জিকে নতুনদার দল হারাবেন কী করে?

সাম্প্রতিক লেখালিখির কতোটা কী হচ্ছে, থাকবে, টিঁকবে, তা এখনই জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু চর্যাগীতি থেকে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের যে সব এলাকা অদ্যাপি বাসযোগ্য এবং ফলত যেগুলির ব্যবহারযোগ্যতা দীর্ঘকাল থাকবে বলে মনে হচ্ছে, শরৎসাহিত্য সেগুলিরই অন্যতম।

পাঠকসাধারণের রুচি ও বিচার সব সময়েই চূড়ান্ত হতে পারে না, কিন্তু বহুকাল যাবৎ বহু পাঠকের রুচি ও বিচার নিতান্ত ভ্রমাত্মক সাক্ষ্যও দিতে পারে না। শরৎসাহিত্য ত্রুটি ও দুর্বলতামুক্ত নয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে ও সাহিত্যচিন্তায়, পরন্তু, বহুবিধ ত্রুটি ও দুর্বলতা লক্ষণীয়। বিশেষত, শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যিক। কথাসাহিত্য বড়ো বেশি করে বিশেষ দেশকালরুচিকে আলিঙ্গন করে থাকে। কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার, ব্যাপক অর্থে সামাজিকতার উপাদান, ভূমিকা, জের : অনিবার্য। বিশ্বসাহিত্যের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকদের কার রচনায় এই আঞ্চলিকতা (বিশেষ 'দেশ' অর্থে) ও 'সাময়িকতা' (বিশেষ 'যুগ' অর্থে) নেই? শরৎসাহিত্যেও সেগুলি আছে।

শরৎসাহিত্যের মাহাত্ম্য এই কারণেও স্বীকার করতে হয় যে, বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি নিয়েই সৃষ্ট তাঁর সাহিত্য অবাঙালী ভারতীয় পাঠকদের মনও লুঠ করে নিয়েছে এবং সমগ্র ভারতীয় কথাসাহিত্যে তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা তাঁর সাহিত্যিক আবির্ভাবের কাল থেকে এ পর্যন্ত অনুভূত হচ্ছে। সুখের বিষয় শ্রেষ্ঠ অবাঙালী ভারতীয় লেখকেরা শরৎসাহিত্যের সেই প্রভাব ও প্রেরণাকে স্বীকারও করছেন।

বাংলা সাহিত্যের দিকে, বিশেষত কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে কী দেখি? সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা মানসিকতা সংস্কৃতির কিছু রূপান্তর সাধিত

হয়, সম্ভব হয় কিছু-বা সমৃদ্ধি, অনিবার্য হয় যুগোচিত শিল্পরীতির পরিবর্তন। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। এ কোনো ব্যক্তির দান নয়, একে 'সময়ের দান' বললেই সত্যি কথাটা বলা হয়। তবু দেখুন, এই রূপান্তরিত ভাবান্তরিত বাংলা কথাসাহিত্য অনেকাংশে শরৎচন্দ্রীয়। শুধু একালের জনপ্রিয় লেখকদের রচনাবলীতেই নয়, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যেই শরৎচন্দ্রই অন্তঃসলিলা। শুধু কি কথাসাহিত্য? সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই অস্তিত্বের অনুসন্ধানী সেই ভবঘুরে মধ্যবিত্ত ভালোবাসার কাঙাল সহৃদয় অভিমানী আলস্যপ্রিয় নিয়তিতাড়িত স্মৃতিভারাতুর কথাশিল্পী চিরপথিকটির দেখা কি আজও মেলে না? হ্যাঁ, যুগোচিত পরিচ্ছদে-ঢাকা আধুনিক বাংলা কবিতার এক উল্লেখযোগ্য অংশের স্বভাবও পূর্ববর্তী বাক্যটিতেই গাঁথা হয়ে রইল। বাংলা সাহিত্য কতকাংশে শরৎচন্দ্রীয়। কারণ, শরৎ-সাহিত্যে বাঙালীর স্বভাবধর্মেরই প্রতিপত্তি।

আসলে, গভীরতর বিবেচনায়, শরৎসাহিত্যে বাঙালীস্বভাবের দ্বিধা-দুর্বলতা-সহৃদয়তা-পরশ্রীকাতরতা-বিশ্বাস-অবিশ্বাস-প্রেম-ধর্ম বহুবিচিত্র পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে বলেই শরৎচন্দ্রকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে চাইলেও এড়িয়ে যেতে পারি নি।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে ছোট-বড়ো-মাঝারি আয়তনের অনেক বই লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের ধারাবাহিক খুঁটিনাটি আলোচনায় পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। সে-পথে না-হেঁটে শরৎসাহিত্যের ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তায় অপেক্ষাকৃত অনালোচিত, স্বল্পালোচিত ও উপেক্ষিত দিকগুলির উত্থাপন ও পুনর্বিবেচনায় উৎসাহ বোধ করেছি। কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা হলো। যাঁরা ভবিষ্যতে নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় বসবেন তাঁরা অনুপ্রাণিত হলে ও সায় পেলেই হলো। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনীহাব্যাধিতে অল্পবিস্তর আক্রান্ত শরৎসাহিত্যের একজন পাঠক শরৎ-সাহিত্যের সম্মুখীন হয়ে ক্রমশ এই ধারণায় এলো যে, মুখে না বলেও তাঁর প্রসঙ্গেও আমরা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছি: 'পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে'ই স্বভাব ও স্বধর্মের বিত্ত ও বৈভব।

১. শরৎ-প্রসঙ্গ

'অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।'—১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পঁচিশে আশ্বিন রবিবাসর কর্তৃক অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠিত ভাষায়। শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কথা তিনি বলেছিলেন, সেই জনপ্রিয়তার কারণও বিশ্লেষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়।

আজ উনচল্লিশ বছর পরে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের সেই অভিনন্দনের পূর্ণাঙ্গ রূপটির বিভিন্ন স্মরণীয় অংশ, শরৎচন্দ্রের নিজের নানা উক্তি উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণ করে অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শরৎ-প্রশস্তি করছেন, করবেন। রবীন্দ্রনাথই শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে।' এবং 'তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।' বাঙালী শরৎ-সাহিত্যে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে—এই বিশ্লেষণও রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের এই সব বিচার ও মন্তব্য এত আন্তরিক যে খুব সঙ্গত কারণেই সাম্প্রতিক সমালোচক ও বক্তারা এই সব মন্তব্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবেন। শরৎচন্দ্র বিভিন্ন চিঠিপত্রে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে নানা সময়ে বহু মূল্যবান মন্তব্য করে গেছেন। প্রিয়জনদের কাছে লিখিত চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্টি বিষয়ে কয়েকটি দাবিও উপস্থাপিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের সেই সব মতামত ও ধারণাও এর আগেই অনেকের অনেক লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে, এই জন্মশতবর্ষেও সেগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজে লাগানো হবে। সেটাই স্বাভাবিক।

এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, শরৎ-সাহিত্যের গুণের দিকটাই, তার সমাদর ও স্বীকৃতির দিকটিকেই এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হবে। এবং তা-ও প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয়।

কম প্রয়োজনীয় নয়, এই অস্বস্তিকর সত্যটির মুখোমুখী হওয়া যে, সভামঞ্চে বক্তৃতার আবেগে, ভাষার ওজস্বিতায় ও কবিত্বের উচ্ছ্বাসে এবং গ্রন্থে-প্রবন্ধে, নানাবিধ রচনায় বাক্যবিন্যাসের যাদুতে, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত, বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সুকঠিন হবে।

শরৎ-সাহিত্যের কী কী ত্রুটি দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা, অতএব, আমরা বিচার করতে বসেছি : না, এই ধারণাও ঠিক নয়। কারণ, সে সব কথাও বহু জন বহু উপলক্ষে বলেছেন, বলছেন। আমিও অন্যত্র লিখেছি। সেই সঙ্গে এ-ও লিখেছি যে, এই সব ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের জয়জয়কার কেন ?

অতএব, না, সেই প্রসঙ্গও এখানে টানবো না।

একটা কথা বোধ হয় আর এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না যে, এই মুহূর্তে যাঁরা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, তাঁরা কিন্তু অনেকেই শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা দুটোই পোষণ করেন। সমস্যাটা আরো কিছু সৎসাহসের সঙ্গে বিচার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সত্যি কথাটা এই যে স্বাধীনতা -উত্তর কালে বিশেষত গত পঁচিশ বছরে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে একটা উদাসীন অবজ্ঞার ভাব প্রশ্রয় পেয়েছে।

প্রবীণদের কথা স্বতন্ত্র। মুষ্টিমেয় রসজ্ঞ পাঠক সমালোচকের কথাও আলাদা। প্রকৃত রসজ্ঞ পাঠক বা সমালোচক কোনো বিশেষ যুগরুচির হাওয়ায় আন্দোলিত হন না। তাঁদের বিচার ও রসবুদ্ধি চলতি কালের ফ্যাশনের দাসত্ব করে না।

কোনো সাহিত্যসৃষ্টিই একেবারে প্রতিবাদহীন সমাদর লাভ করতে পারে না। সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। 'ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ'—এই অভ্রান্ত নির্ণয়ও রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু প্রতিবাদ ও ঔদাসীন্য এক কথা নয়।

আমাদের সমস্যাটাও এইখানে।

শরৎ-সাহিত্য কি তার স্পর্শগুণ হারিয়ে ফেলছে ? ক্রমশ ?

আমরা চাই বা না-চাই, সাহিত্যে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটা অস্বাভাবিক নয় যে, এককালের বহু-অভিনন্দিত সৃষ্টিও পরবর্তীকালে নিন্দিত এমন-কি উপেক্ষিতও হতে পারে। হয়ে থাকে। শরৎ-সাহিত্য প্রসঙ্গেও কি সেই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে ? জন্মশতবর্ষে উৎসব-অনুষ্ঠানের সংখ্যা কিংবা অসাহিত্যিক কোনো কারণে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, শরৎ-রচনাবলীর বিক্রয় -সংখ্যা—এ সব দিয়েই কিন্তু আজকের দিনে শরৎচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব নির্ণয় করতে যাওয়াটা অনুচিত হবে।

আসল কথা, সাহিত্যিকের মনোভঙ্গি-গঠনে যেমন, তেমনই তাঁর সৃষ্টিতে

এবং সেই সৃষ্টির সমাদরের ক্ষেত্রেও সামাজিক পরিবর্তন-পরম্পরার, এক কথায় সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বস্তুত সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বটা প্রধান বললেও অত্যুক্তি হবে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। শরৎ-সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তৎকালীন পল্লীসমাজ, একান্নবর্তী পরিবারসমূহের বিশেষ সমস্যাবলী মুখ্য হয়ে উঠেছে। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। উল্লিখিত সমস্যাগুলির চেহারা চরিত্র বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেকটা বদলেছে এবং সমাজবিন্যাসেরও। সে-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় দুই ভাই আজ বিবাহোত্তর জীবনে স্বতন্ত্র সংসার পাততে চোখের জল ফেলার কোনো কারণই খুঁজে পায় না। বরং দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবসম্মত ও আধুনিক হওয়ায় এটা এখন সবাই বোঝে, আলাদা থাকলেই দুই জা-এ প্রীতি তবু থাকতে পারে কিন্তু জোর করে একসঙ্গে থাকতে গেলে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

সামাজিক-আর্থিক গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে শরৎ-সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনী ও সমস্যাগুলির প্রাসঙ্গিকতা এ কালের মানুষের কাছে ক্রমশই কমে এসেছে, এক সময়ে সেই প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণরূপেই চলে যেতেও পারে। তখনও শরৎ-সাহিত্য নির্দিষ্ট একটি দেশ-কাল-জাতির সমস্যা ও মানস-প্রকৃতির চিরন্তন দলিলরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আর শরৎ-সাহিত্যে নিপীড়িত-লাঞ্ছিত নীচুতলার নরনারীর যে জীবনযন্ত্রণা ও মর্মবেদনার আলেখ্য পাই, তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া নিশ্চিত কঠিন। তা' ছাড়া সাহিত্যে শুধু সামাজিক-আর্থিক অসম ব্যবস্থার স্থূলরূপই চিত্রিত হয় না, সাহিত্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানুষ, মানবহৃদয়; সামাজিক-আর্থিক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা সেই মানুষকে, মানবহৃদয়কে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে, কিন্তু মানুষের এমন কিছু সম্পদের চাহিদা থেকে যায় যা হাতে -হাতে দেওয়া-নেওয়ার জিনিশ নয়, চোখে-দেখা জগতের বাইরেও মানুষের নিজস্ব একটা জগৎ আছে, সেখানেও মানুষের হাসিকান্নার উৎস আছে। সেই জগৎ কি তার হৃদয়? যা ব্যক্তিগত, কিন্তু জাতির চৈতন্যের ও সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত?

শরৎচন্দ্র তো তাঁর স্বজাতির 'হৃদয়রহস্যেও ডুব' দিয়েছিলেন।

সেইজন্য, শরৎচন্দ্রকে বাঙালীর পক্ষে ভুলে-যাওয়া, ভুলে-থাকা অসম্ভব।

তিনি কখনো-সখনো চলতি ফ্যাশনের আড়ালে থাকবেন হয়তো। কিন্তু বার বার তাঁর আবির্ভাব হবে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে, এই মুহূর্ত পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য-প্রেরণা নয়, পাশ্চাত্য-অনুকরণের ঝোঁক প্রবল ও অস্বাস্থ্যকররূপে ক্রমবর্ধমান। পাশ্চাত্য প্রেরণার কাছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঋণ সুপ্রচুর ও গভীর। কিন্তু এখন চোরাই চালানে বাংলা সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে আজও আমরা জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করতে অগ্রসর হই নি। কিন্তু, ঐতিহাসিক নিয়মে, একদিন সে কাজে হাত লাগাতেই হবে। তখন, শরৎ-সাহিত্য আমাদের আলোকিত করবে ও নতুন ভাষ্যে আলোকিত হবে। পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের প্রেরণাকে অস্বীকার করার কথা কোনো মূর্খ বলবে না, কিন্তু একটা জাত যখন তার নিজের সাহিত্যে আত্ম-আবিষ্কারের, আত্ম-অনুসন্ধানের পরিবর্তে বিদেশজাত পণ্য-সামগ্রীর বিকৃত রূপদর্শনে আহ্লাদ প্রকাশ করতে থাকে তখন এবং তখনই সে তার শরৎচন্দ্রদের সম্বন্ধে ক্রমশ উদাসীন হয়ে ওঠে। সেটাই ট্রাজেডি।

২. শরৎ-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা

'নবীন পাঠক আজি বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়'

স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাংলা সাহিত্যের নবীন পাঠক-পাঠিকারা শরৎ-সাহিত্য প্রসঙ্গে এমনিতর সমস্যায় পড়েছেন। দিনক্ষণ বিচার করে লগ্ন নিরূপণ করা সহজ নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা-উত্তর কালেই শরৎ-সাহিত্য বিষয়ে সংশয় স্পষ্ট হতে থাকে। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটির প্রকাশকাল থেকেই এই সংশয়ের সূত্রপাত। তারও আগে শরৎচন্দ্র যখন পাঠকসাধারণের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর, তখনও যে কোনো-কোনো মহলে শরৎ-সাহিত্যের বিচারে-সমাদরে দ্বিধা দেখা দেয় নি, তা অবশ্য নয়। তবু বলা যায়, 'শেষ প্রশ্ন' থেকেই শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে সেকালের বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচকরা প্রশ্ন তুলতে থাকেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রশ্ন রীতিমতো সংশয়ে পরিণত হয়। গত বছর পনেরো-কুড়ি ধরে শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদস্পৃহাও বেশ স্পষ্ট চেহারা নিতে আরম্ভ করে। এ কালের নবীন পাঠকেরা তো অনেকেই শরৎ-সাহিত্যের গায়ে 'বাতিল'—এই লেবেল এঁটে দিয়েছেন!

এই অবস্থায় শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ চলে এলো। উৎসব-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। বক্তৃতা-অভিনয়-সভা-সমিতি চলছে, অসংখ্য প্রবন্ধ, প্রবন্ধ-সঙ্কলন, বইপত্র—শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য বিষয়ে, প্রকাশিত হচ্ছে ও হবে। সামগ্রিকভাবে এ সবেরই মূল সুর আবেগ-উচ্ছ্বসিত এবং মোটামুটিভাবে সবটাই প্রশস্তিমূলক। এই রকমই সাধারণত হয়। এইটাই স্বাভাবিক! কিছু-কিঞ্চিৎ সংশয়-প্রতিবাদ এরও মধ্যে উচ্চারিত হবে হয় তো। তা-ও অস্বাভাবিক নয়।

স্বাধীনতাপর্বের নবীন পাঠকেরা আজ প্রৌঢ় অনেকেই, শরৎ-সাহিত্য যাঁদের চোখে ও বিচারে ফিকে হয়ে এসেছিল, তাঁরা অনেকেই বয়সে চল্লিশোত্তর, শরৎ-সাহিত্য যাঁরা এক কথায় 'বাতিল' বলে রায় দেন, তাঁদের মধ্যে পনেরো থেকে পঞ্চাশ, সব বয়সেরই অসংখ্য পাঠক-সমালোচক আছেন। এঁদের একটা বড় অংশ শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে তুষ্ণীম্ভূত হয়ে আছেন, থাকবেন। দুঃসাহসী কেউ-কেউ দু'চারটি সংশয় প্রতিবাদ উত্থাপন করবেন হয় তো বা। সৎ-সাহসী কেউ-কেউ প্রথম তারুণ্যের ও যৌবনের সিদ্ধান্ত, মন্তব্য, পুনর্বিবেচনার ফলে প্রত্যাহারও করে নিতে পারেন। সৃষ্টির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাঁরা এসেছেন, তেমন অনেক লেখক আজ হয়তো শরৎসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা জেনেও তার স্বরূপ-নির্ণয়ে এগিয়ে আসবেন, শরৎ-সাহিত্যের গুণের দিকটার উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব আজ তাঁদের কেউ-কেউ কর্তব্য হিশেবেই গ্রহণ করতে পারেন। যেমন সম্প্রতি, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর কলমে সেই কর্তব্য পালন করেছেন।

কিন্তু, আমার চিন্তা এ কালের উদাসীন উন্নাসিক নবীন পাঠক-পাঠিকাদেরই কেন্দ্র করে। শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার ভাবটা দূর হতে চায় না কিছুতেই। তাঁদের সকলেরই সাহিত্যরুচি ও বোধবুদ্ধি যে নিম্নমানের, তা-ও নয়। সেইজন্যই, ভেবে দেখতে হবে। শরৎসাহিত্য কেন তাঁদের বিপুল অংশকে আজ স্পর্শ করতে পারছে না।

একটা বিষয় অবশ্য খুবই স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র যে-দেশকাল জাতিরুচির মধ্যে লেখক হিশেবে দেখা দিয়েছিলেন, ক্রমবর্ধিত হয়েছিলেন, সেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষণী থেকে আজ আমরা অনেকটা দূরবর্তী। শরৎচন্দ্রের

যে-কোনো গল্প-উপন্যাস সম্পর্কেই আজকের নবীন পাঠক 'বাস্তবতা'র প্রশ্ন তুলতে পারেন। তাঁদের মনে হতেই পারে, শরৎ-সাহিত্যের সমস্যা তাঁদের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি থেকে অত্যন্তই পৃথক। সেজন্য, প্রাণের যোগ রচিত হওয়াও শক্ত।

'পল্লীসমাজ' বইটির কথাই ধরা যাক। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ তারিখে একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র জনৈক পত্রপ্রেরককে লিখছেন: 'পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি—স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরি বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে, কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্তত ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা শহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।'—সাম্প্রতিক নবীন পাঠক, যাঁরা সাহিত্যপাঠে উৎসাহী, তাঁদের মধ্যে যাঁরা শহরবাসী, তাঁরা আজ শরৎচন্দ্রের সমকালের পল্লী-সমাজকে অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি দিয়ে কী ভাবে আত্মস্থ করতে পারেন? আজ যাঁরা পল্লীবাসী, তাঁদের পল্লী ও পল্লীসমাজ আর শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ একই বস্তু নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং সমাজ-মানস। সমস্যা দূর হয় নি সম্পূর্ণত। এবং অনেক নতুন সমস্যা ও সুবিধা দেখা দিয়েছে, যা প্রবহমান সময়েরই দান।

সুতরাং, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের সঙ্গে যাঁদের কখনো কোনো পরিচয় ছিল না এবং হয় নি বা হলো না, তাঁদের পক্ষে 'পল্লীসমাজ' গ্রন্থটি সম্পর্কেও দ্বিধা-সংশয়-দূরত্ব অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক। অথচ, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসের কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে পল্লী বা শহরের মানুষের খুব একটা মৌলিক ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায় নি। যে সব মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে, তাঁদের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয়। সেইজন্য আবার পল্লীসমাজ বই হিশেবে আজ ব্যাপক জনপ্রিয়তার অধিকারী না-হলেও, একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি।

সমাজ-প্রগতি ও সামাজিক বিন্যাস-পরিবর্তনের ফলে যদি কখনো শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের সব সমস্যারই সম্পূর্ণ সমাধান হয়েও যায়, তবু পল্লীসমাজের সাহিত্যমূল্য তথা মানবমূল্য সম্পূর্ণ উবে যেতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিগত মানুষের মৌলিক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা-অপূর্ণতার বোধ থেকেই যায়। এই সব সমস্যাগুলি চিরন্তন। অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও অনুভূতির সত্যে রঞ্জিত এই যে সব সমস্যা-সংকট বেদনা-মাধুর্য — এর কি কোনো শেষ আছে? অবসান?

পল্লীসমাজের মানুষগুলি কি সত্য হয়ে উঠেছে? মহেশ গল্পের গফুর মিঞা কি ছিল না? নেই? তার বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা কি জীবনের তথ্য থেকে সাহিত্যের সত্যেও উন্নীত হয়েছে? শরৎসাহিত্যে চিত্রিত জীবন ও মানুষগুলি কি অনিবারণীয়রূপে বিশ্বাসযোগ্য?

এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলি যদি অনুকূল হয়, তা হলে শরৎসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার সহজাত প্রতিভা ছিল। চারিপাশের সংসার ও জীবনকে পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম সামর্থ্য ছিল। তাঁর সেই জীবনকে দেখা ও জীবন-দর্শন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এইখানেই শরৎসাহিত্যের চিরন্তন মূল্য। এবং প্রাসঙ্গিকতাও।

সবচেয়ে বড়ো কথা, পথের দাবী ও শেষ প্রশ্ন বই দু'খানির আংশিক কৃত্রিমতার কথা বাদ দিলে শরৎসাহিত্যের সংসার তাঁর চোখে-দেখা, হৃদয়-দিয়ে অনুভব-করা জীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের 'শিল্পরূপ' নিয়ে কিছুটা দ্বিধা বিদগ্ধ পাঠকদের থাকতেও পারে, তার কোনো কারণই নেই, তা-ও হলফ করে বলবো না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের যেটা raw material বা কাঁচা মাল, সেটা খুব খাঁটি, খুব অকৃত্রিম। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্য শুধু টেকনিকসর্বস্ব হয়ে বাঁচে না। আজকের শিল্পরূপ আগামী কাল বিবর্ণ লাগতে পারে, সাহিত্যের প্রসাধনকলাও সাময়িক ফ্যাশন-অনুবর্তী। কিন্তু যে-জীবনকে নিয়ে, জীবনের যে-অংশ নিয়ে একজন লেখকের কাজ, সেই জীবন-উপাদান যদি খাঁটি হয়, সেই জীবন-উপলব্ধি যদি সত্য হয়, তা হলে জীবনের তাগিদে, জীবন-সত্যের তাগিদে ঐ উপাদান তার নিজস্ব শিল্প-আধারকে স্বতঃস্ফূর্ত তাড়নায় পেয়ে যায়; চূড়ান্ত গতিভরে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

৩. ছোটগল্পের কর্ম ও শরৎচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান ও ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার করার অবকাশ নেই। তাঁর সমকাল থেকে এ-পর্যন্ত সমালোচকমহলে নানাকারণে বারবার তিনি নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা দেখিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় সেদিনও ছিল না, আজও নেই। সেকালে কোনো কোনো সমালোচক এবং এ কালে অনেক সমালোচকই তাঁর রচনায় 'ইনটেলেকট'-এর অভাব দেখেছেন, দেখেছেন হৃদয়বৃত্তির প্রবণতা। এ কথা অবশ্য সত্য, শরৎসাহিত্যে হৃদয় যতটা প্রশ্রয় পেয়েছে, বুদ্ধি ততটা নয়। তবে শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় 'চিন্তাশক্তি'কে কখনই বর্জনীয় বলে মনে করেন নি। সাহিত্যে চিন্তাশক্তির স্থান তিনি বেশ সচেতনভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু 'অনুভূতির সত্য'কেই তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্য দিয়েছেন। তাঁর চিঠিপত্রে এ সব কথা তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন। অতএব, তিনি যা চেয়েছেন, তা-ই যদি করে থাকেন এবং পেরে থাকেন, তা হ'লে তাঁর শক্তি ও সততাকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

তাঁর অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং ভাষা, শরৎসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও জনচিত্তজয়ী করেছে। তাঁর আন্তরিকতা এবং ক্ষমতাকে বিনাবাক্যে স্বীকার করা উচিত। তাঁর সাহিত্যে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই, এমন কথা বস্তুনিষ্ঠ কোনো পাঠক বা সমালোচকই বলবেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পঁচিশে আশ্বিন রবিবাসর কর্তৃক অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে-ভাষায় তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, তার যথার্থতা আজও স্বীকার্য : 'শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংগঠিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।'

শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন আতিশয্যমুক্ত এবং আন্তরিক। এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও মোটামুটিভাবে এই মূল্যায়ন সঠিক বলে যদি মেনে নিই, তা হলে, শরৎসাহিত্যের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য অসামান্য বলতেই হবে।

শরৎচন্দ্র বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর সাহিত্যচিন্তা তেমন সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করেন নি বটে, কিন্তু মধুসূদনের চিঠিপত্র থেকে যেমন তাঁর সাহিত্যচিন্তার বিবিধ ও বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকেও তাঁর সাহিত্যভাবনার বহু পরিচয়ই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।*

শরৎসাহিত্যের প্রশংসনীয় নানা দিকের কথা মনে রেখেও এবং স্বীকার করেও আজ নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁর রচনাবলীবিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করা কর্তব্য। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। ছোটগল্প হিসাবে 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' বাংলা সাহিত্যে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সার্থকতা যতটা, শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প ততটা সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে হয় না।

বরং সত্যের খাতিরে বলতে হয়, বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, শরৎচন্দ্র ছোটগল্প রচনায় সামগ্রিক ভাবে ব্যর্থই হয়েছেন।

এর কারণ, ছোটগল্পের ফর্ম সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অথবা, বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য বলা যায়, ছোটগল্পের ফর্ম সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণা ছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উপন্যাস রচনায় সামগ্রিকভাবে তাঁর সাফল্যের হেতু কী? সহজ উত্তর এই যে, উপন্যাসের ফর্মের ব্যাপারে লেখকের যে অকল্পনীয় স্বাধীনতা আছে, তাতে বহু বিচ্যুতিই সহজে ঢাকা পড়ে যায়। উপন্যাস শুধু আয়তনেই বৃহৎ নয়, স্বভাবেও উদার। ছোটগল্প আয়তনে অনেক ছোট এবং স্বভাবেও একব্রতী। তাই উপন্যাসে ফর্মের যে-শৈথিল্য অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, অনুভূতির সত্য এবং ভাষার আন্তরিকতায় চোখেই পড়তে চায় না, ছোটগল্পে সেই এতটুকু শৈথিল্য অনেকটা হয়ে ওঠে, অমার্জনীয় হয়ে ওঠে। ছোটগল্প শাণিত ও ঋজুস্বভাব, সে কোনো বাহুল্যকে সইতে পারে না। এতটুকু ভার তার কাছে দুর্বহ বোঝা।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ মে তারিখে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্র উপেনবাবুর একটি গল্পপ্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, 'গল্পটা সত্যই ভাল'—'কিন্তু,

*আমি সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটে যথাক্রমে 'মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা' ও 'শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' বিষয়ে পঠিত প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি করে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।'—এই পত্রাংশ থেকেই বোঝা যায়, ছোটগল্পের ফর্ম সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কী পরিতাপজনকরূপে বিভ্রান্ত ছিলেন। গল্পটা যদি 'সত্যই ভাল' হয়, তবে তার আয়তনে কী এসে যায়? আর গল্পের শেষটা? দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের লম্বা চওড়া কোটেশন না দিয়ে একজন স্রষ্টারই বক্তব্য স্মরণ করা যাক: 'অন্তরে অতৃপ্তি রবে / সাঙ্গ করি মনে হবে / শেষ হয়ে হইল না শেষ!' কাজেই, 'conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই'—এই দাবি ও ধারণা ছোটগল্পের ফর্মবিরোধী অর্থাৎ ছোটগল্পের বাঞ্ছিত রসপরিণাম-বিরোধী। "গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই"—শরৎচন্দ্রের এই ধারণাও খুব বহিরঙ্গ ও যান্ত্রিক। ছোটগল্প কেন, সকল সাহিত্য-শিল্পই স্ব-ধর্ম এবং স্ব-ভাব রক্ষা করতে পারলেই হলো। কাজেই ছোটগল্প ত্ন'পাতারও হতে পারে, বত্রিশ পাতারও হতে পারে এবং অবশ্যই বারো চোদ্দ পাতারও হতে পারে।

তাই, আমার ধারণা, 'মহেশ' গল্পটির সামগ্রিক সাফল্য সত্ত্বেও, ছোট গল্পসৃষ্টি সম্ভবত শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট প্রতিভার অনুকূল ছিল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পর্যাপ্ত স্বাধীনতার সঙ্গে লিখতে পারতেন বলে আসলে উপন্যাসই ছিল তাঁর অনুকূল মাধ্যম। উপন্যাসের ফর্ম-বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে বলা যায়, সে ক্ষেত্রে তেমন বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে হয না লেখককে। শরৎচন্দ্র 'নভেলেট' লিখেছেন অনেক। আসলে, তাঁর 'গল্প' নামে চিহ্নিত বহু রচনাই মূলত 'নভেলেট'।

সেইজন্যই, ছোটগল্প লিখতে শরৎচন্দ্রও খুব স্বস্তিবোধ করতেন না। তা না হলে একই চিঠিতে কেন লিখবেন শরৎচন্দ্র যে, 'আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার তো আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। ..যদি গল্প (অর্থাৎ ছোটগল্প!) লেখার কাজটা তোমরা চালিযে নিতে পার, আমি শুধু নভেল ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি।'—একই চিঠিতে লিখছেন,'...আমি আর ছোটগল্প বড় লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না।'

ঐ চিঠি থেকে শরৎচন্দ্রের ভাষায় আরো জানা যায়, 'পথনির্দেশ' ও 'রামের সুমতি' কলকাতা ও রেঙ্গুনের পাঠকেরা 'Superlative degree' তে 'Excellent !' বলে মনে করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাকি লেখাদুটিকে 'গল্পের আদর্শ !' বলে মনে করেছিলেন এ-ও জানা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের কলমে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না ছোটগল্পের বস্তু ও ফর্ম—শরৎচন্দ্রের চিন্তায় একাত্ম হয়ে উঠতে পারে নি। এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে, ছোটগল্প লিখতে গিয়েও সেই সামঞ্জস্যকে তিনি ক্বচিৎ স্পর্শ করতে পেরেছেন।

৪. শরৎচন্দ্র : লেখক ও ক্রিটিক

'মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে'—লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র নিজেই। কথাটা সত্যিও। লেখক যখন সৃষ্টিশীল, সেই মুহূর্তেও তাঁর মধ্যে একটি সমালোচক-সত্তাও সক্রিয়। লেখকের ব্যক্তিত্বের কতটা অংশ সৃজনমুহূর্তে আত্মবিস্মৃত আর কত ভাগই বা সমালোচনা-প্রখর, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগাভাগি নিয়ে সহসা মীমাংসা হবে না বটে, কিন্তু সৃষ্টিমগ্ন লেখক একেবারে 'আত্মহারা' হলে, আর যাই হোক শিল্পকর্ম সুসম্পন্ন হতে পারে না।

এই যে অবস্থার কথা বলা হলো, সেটা লেখক যখন স্রষ্টা, তখনকার কথা। বলাই বাহুল্য স্রষ্টার ক্রিটিক-সত্তার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটা রূপও আছে। আবার, সেই ক্রিটিকও যে শুষ্ক বিশ্লেষণেই তাঁর কাজ শেষ হলো বলে মনে করেন, এমন কথা ভাবা উচিত হবে না। সাহিত্য-সমালোচনা যখন রসোত্তীর্ণ, তখন তা সাহিত্যশিল্পের কিছু আবশ্যিক শর্তও পূরণ করতে চেষ্টা করে।

এই প্রসঙ্গেই সমস্যাটা দেখা দেয় অনিবার্যত। যিনি সমালোচক, সাহিত্যসৃষ্টিতে হাত দিলেই তিনি যে সার্থকতা অর্জন করবেনই এ কথা যেমন জোর দিয়ে বলা যায় না, তেমনই যিনি সাহিত্যস্রষ্টা, তিনি যখন সাহিত্য-সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন দ্বিধা ও এমন কি পরস্পরবিরোধিতার আশঙ্কাও রীতিমতো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো সব্যসাচীরাও তাঁদের সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনার মধ্যবর্তী ব্যবধানটুকু সবসময়ে ঘুচিয়ে দিতে পারেন না। তখন শরৎচন্দ্র স্রষ্টার আসন থেকে ক্রিটিক-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে

সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারবেন, এতখানি আশা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র : বাংলা উপন্যাসের প্রাক-কল্লোল-পর্বে এঁরাই হলেন তিন প্রধান পুরুষ। ঔপন্যাসিক হিশেবে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বহু-আলোচিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও সম্প্রতি স্বতন্ত্র বিচারবিশ্লেষণের উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে।

তিন প্রধানের মধ্যে প্রবীণতম বঙ্কিমচন্দ্র, প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। তাঁর, ভেবে দেখলে, যোগ্য কোনো পূর্বসূরী নেই। নবীনতম শরৎচন্দ্র উপন্যাস-রচনারম্ভের কালে সামনেই পেয়েছেন : দুই প্রধান—বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী তো ছিলোই, রবীন্দ্র-উপন্যাসের, তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর কিয়দংশ—ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পথনির্দেশ করেছে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি আর গোরা-র মতো উপন্যাস হাতের কাছেই পেয়ে গেলে যে-কোনো নবীন ঔপন্যাসিক কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হতেন। শরৎচন্দ্রও পূর্বসূরীদের কাছে বার বার ঋণ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্র-উপন্যাস-প্রসঙ্গে, বিশেষত চোখের বালি ও গোরা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র-স্বীকারে রীতিমতো সরব। অতটা না হলেও বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলিও যে এক সময়ে তাঁকে বেশ প্রভাবিত করেছিল তাঁর সাহিত্যজীবনের আদি পর্বে, সে কথাও শরৎচন্দ্র অন্তত একবার বিশেষভাবেই স্বীকার করেছিলেন।

অল্পবয়সেই, লিখেছেন শরৎচন্দ্র, 'এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাসসাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, যেন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হযে গেল। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হযেছে কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।'

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেই গুরুর পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও তাঁর ঋণ ও প্রেরণার পরিমাণ ও প্রকৃতি উপেক্ষার যোগ্য নয়। এই মুহূর্তে তা বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলে থাকলে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ঐতিহ্য ও বিবর্তনকে যে সঠিক উপলব্ধি ও আত্মস্থ করা সম্ভব নয় শরৎচন্দ্র তা বুঝেছিলেন। আমাদের সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র।

এই জনপ্রিয়তার নানা কারণ আছে। শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রাঞ্জলতা হৃদয়ের গভীরতা, বিষয় নির্বাচনে ও উপস্থাপনায় বাঙালী স্বভাবের সংস্কারের আত্মীকরণ এবং মোটামুটিভাবে বিদেশী প্রসঙ্গ ও রীতির নকলনবিশী থেকে আত্মরক্ষা করে চলা : এ সমস্তই তাঁকে দুর্লভ জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। তাঁর অগ্রজ দুই প্রধান ঔপন্যাসিকের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগও তাঁকে সাহায্য করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি দেখা গেল। 'চোখের বালি' তাঁকে যে কী ভাবে অভিভূত করেছিল, তাঁর ভাষাতেই জানা যেতে পারে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত চোখের বালি পড়ে শরৎচন্দ্রের মনে হয়েছিল '·...ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নতুন আলোএসে যেন চোখে পড়লো। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি।...ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?' রবীন্দ্রনাথের কিছু কাব্য ও গল্প উপন্যাসের বই শরৎচন্দ্রের প্রবাস জীবনের সঙ্গী ছিল। ঘুরে ঘুরে ওই বইগুলোই পড়তেন আর ভাবতেন '.....এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে কি কথাসাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।......আর কোথাও না হোক সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।'

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শরৎচন্দ্র ঠিক কী গ্রহণ করতে পারতেন এবং ঠিক কতটা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তা বিস্তৃত বিশ্লেষণের বিষয়। এখানে সংক্ষেপে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিটোল গল্পকার শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের কাছে মরমী ভাষাশিল্পী ও মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের রূপকার শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই কিছু গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য গ্রহণের মধ্যে পীড়ন বা জোরজবরদস্তির প্রশ্ন আসে না। যিনি গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর প্রবণতা ও সংস্কার অনুসারেই গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'ছেলেবেলায় কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল।...অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি

কিছু আর রইল না !' শরৎচন্দ্র রোহিণীর এই পরিণামে ক্ষুব্ধ। তাঁর প্রশ্ন: 'কিন্তু আর একটা দিক ? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন, —নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম ?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।'

রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের সম্পর্কটাই কতটা গভীর, এদের মধ্যে নরনারীর হৃদয়ের গূঢ়তম প্রেম আদৌ জন্মেছিল কি-না, এসব প্রশ্ন অবান্তর নয়। হরলাল-প্রত্যাখ্যানে রোহিণী গোবিন্দলালের রূপজ ও আনুষঙ্গিক আকর্ষণে ধরা দিল (গোবিন্দলালও), আর প্রসাদপুরের বাড়িতে অবসাদগ্রস্ত নিস্তেজ কামনাবহ্নি যখন গোবিন্দলাল ও রোহিণী উভয়কেই পরস্পরের বিষয়ে বীতস্পৃহ করে তুলেছে, তখন গোবিন্দলালের 'অন্তরে ভ্রমর, বাহিরে রোহিণী' আর রোহিণীও তার নির্ভুল নারীস্বভাব দিয়ে বুঝেছে সেই নিষ্ঠুর সত্য, অতএব অন্য আশ্রয়ের সন্ধানেই সে নিশাকরের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনে প্রায় বাধ্য হয়েছে। তারপর অপরাধী-বিবেক ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে হত্যা করে, তখন শুধু রোহিণীকেই মারতে চায় না, মারতে চায় মানবস্বভাববিরোধী এক তীব্র অস্বস্তিকর পরিবেশকে। আর, রোহিণী ? হত্যার আগেই সে একাধিকবার আত্মহত্যা করেছে। আসলে, রোহিণীর মৃত্যুতে ভ্রমর বা গোবিন্দলাল কেউ তো বাঁচে নি ! প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পের সম্মানেই বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠুর হয়েছেন। কাউকে জোর করে বাঁচাতে চান নি। সামাজিক বা নৈতিক বুদ্ধির কোনো লাভ-লোকসান নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পবুদ্ধিই জয়ী হয়েছে।

সমালোচক শরৎচন্দ্র যা-ই বলুন রোহিণীর প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরেও তিনি নিজের কোন্ উপন্যাসে সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির ঊর্ধ্বে যেতে পেরেছেন ? গোবিন্দলালের তবু ভ্রমর ছিল, রাজলক্ষ্মী ছাড়া শ্রীকান্তর কে ছিল ? তবু ওরা মিলতে পারে না। সতীশ-সাবিত্রী পারে না, রমা-রমেশ পারে না। এবং কিরণময়ী ?

চোখের বালির উপসংহার সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আপত্তির কথা জানি না। কিন্তু আমাদের বিচার যা-ই হোক, শরৎচন্দ্রের হিশেবে বিহারী-বিনোদিনীর মিলন ছাড়া বিকল্প কী ?

থেকে যায় এইসব বিরোধ-বৈপরীত্য। লেখক যখন ক্রিটিক-এর ভূমিকায়, তখনও। কিংবা তখনই ?

আশ্চর্য এই, শরৎচন্দ্রই আপত্তি জানিয়ে যান, 'যোগাযোগ'-এর উপসংহার সম্পর্কে। যোগাযোগ-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য ও বিচার বেশ রূঢ়। প্রাসঙ্গিক অংশমাত্র উদ্ধার করা যাক : 'যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি তো ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কী করে ? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে।'

চোখের বালি ও গোরা-র সমালোচক শরৎচন্দ্র যোগাযোগ উপন্যাসটির আস্বাদনে যে বিচার-বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছেন তা যদিও বিস্ময়কর, তবু তার একটা তাৎক্ষণিক কারণ ছিল। দিলীপকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি—'সাহিত্যের মাত্রা' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আপত্তি ও ক্ষোভ ছিল। এ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে লেখা চিঠিতেই শরৎচন্দ্র যোগাযোগ সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন। উপন্যাস হিসাবে সামগ্রিক বিচারে যোগাযোগ চোখের বালি ও গোরা-র চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পরূপের বিচারেও যোগাযোগ-এর জুড়ি মেলা ভার বাংলা উপন্যাসে।

মনে হয়; তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াবশতই শরৎচন্দ্র 'কুমুর প্রব্লেম'-এর গুরুত্ব ও গভীরতা তলিয়ে দেখেন নি। কারণ তিনি তো ঠিকই জানতেন, 'কুমারসম্ভবের প্রব্লেম' উত্তরকাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়।' কুমুর প্রব্লেম কি 'হাঙ্গামা বাধানো'র মধ্যেই নিঃশেষিত ?

লেডি ডাক্তার এসে যখন জানায়, কমু সন্তানসম্ভবা তখন কি কুমুর সমস্যা 'এত সহজ' হয়ে যায় ? কুমুর ট্র্যাজেডি কি অফুরাণ হয় না তখনই, সমাধানের অতীত স্তরে গিয়ে পৌছায় না তা ? যে-কুমুকে আমরা জানি, যে কুমু উপসংহারে ঐ নিষ্ঠুর, চরম করুণ, দারুণ কঠিন পতিগৃহযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে, যাওয়ার আগে বিপ্রদাসকে বলে যায়, এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না—সেই কুমুর সন্তানসম্ভাবনা, মধুসূদনকে বিবাহ করার চেয়েও অনেক গভীর, তীব্র ট্র্যাজেডি।

গৃহদাহ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এক আশ্চর্য নারীকে আমাদের মুখোমুখী

করেন। অচলা যদি সুরেশের সংস্পর্শে সন্তানসম্ভবা হতো, কী হতো গৃহদাহ-এর পরিণাম? যে সন্তানসম্ভাবনার কথা জেনে কুমুর মন অশুচিতায় ভরে যায়, সেই সন্তান যাদের, তাদের হাতে তুলে দেওয়ার নৈতিক বোধ থেকে কুমু তবু মধুসূদনের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়, অন্তত সাময়িকভাবে, আর অচলা? তার প্রেম কী ভাবে 'এত সহজ' হয়ে যায়? লেখক শরৎচন্দ্র 'আদর্শ হিন্দুনারী' মৃণালের অঙ্গুলিনির্দেশকেই উপন্যাসের শেষে জোর করে বড়ো করে দেখান। মৃণালের শুষ্ক তত্ত্বাদর্শের কাছে জীবনরসরসিক অচলার আত্মসমর্পণ শরৎচন্দ্রের সামজিক ও নৈতিক বুদ্ধির কাছে শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তারই পরাভব!

থেকেই যায় এসব বিরোধ-বৈপরীত্য। লেখক যখন ক্রিটিক-এর ভূমিকায় তখনও। অন্তত, মাঝে মাঝে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। শরৎচন্দ্র যতটা হৃদয়-নির্ভর,ততটা বিচারপ্রবণ নন বলেই, তাঁর ক্ষেত্রে এই বিরোধ-বৈপরীত্যের পরিমাণ হয়তো কিছু বেশিই।

৫. শরৎসাহিত্যের পাঠক

'জনপ্রিয়তা' ব্যাপারটা শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে সব সময় কিছু সুখের বা স্বস্তির নয়। সুবিধাজনক বটে। বিষয়বুদ্ধির বিচারে। কিন্তু সুখকর বা স্বস্তিকর নয়। এই জন্যে যে, জনপ্রিয়তা সাধারণত সাময়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অথচ, শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিজেদের কাল ছাড়িয়েও বেঁচে থাকতে চান। তাঁরা চিরত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। যাঁরা সে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এবং কিছুকালের জন্য জনপ্রিয়তা ভোগ করে কাজ কারবার গুছিয়ে পাততাড়ি গুটোতে চান, তাঁরা আর দশটা জিনিশের ব্যবসায়ীর মতো সাহিত্য-ব্যবসায়ী মাত্র। তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তারও একটা নেশা আছে। তার ঘোর কাটতে চায় না। ব্যাপারটা অব্যাহত ভোগ করতে ভালো লাগে। তা'ছাড়া চিরত্বের কথাটা ভরসা করে ক'জনই বা ভাবতে পারেন? কিন্তু অনেকেই আছেন, যাঁরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অন্তত, জনপ্রিয়তাটা ভোগ করতে চান।

তখন এটা সত্যিই দুঃখের কথা, প্রথম লেখাটি বা প্রথম দিকের লেখাগুলির জন্য পাঠকসাধারণের করতালি একবার যিনি ভোগ করেছেন, তাঁরই লেখার চাহিদা যখন এক দশকেই ফুরিয়ে যায়। কত কারণেই যে, কত লেখা এক

একটা বিশেষ সময়ে পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়, তার ইয়ত্তা নেই। লেখকদের সম্পর্কে পাঠকদের কী বিচিত্র কৌতূহল, আমরা জানি। একজন চলচ্চিত্রশিল্পীর প্রতিদিনের কার্যসূচী এবং ইত্যাদি বিষয়ে দর্শকদের যে অবিশ্বাস্য কৌতূহল, অন্য ক্ষেত্রের শিল্পী বা সাহিত্যিক সম্পর্কেও প্রায় সেই কৌতূহল সাধারণ মানুষ পোষণ করেন। শিল্পী-লেখকেরা সাধারণের কাছে চিরটা কাল জিজ্ঞাসা হয়েই থাকেন।

কিছুটা চিন্তাশীল একজন শিল্পী বা লেখকের কাছে সাধারণ মানুষও সমপরিমাণেই রহস্যাবৃত। শিল্প-সাহিত্যের একটা বাজার আছে। সেই বাজারের যাঁরা ক্রেতা, তাঁদের ইচ্ছা-রুচি-চাহিদা কী রহস্যময় ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, কখন কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে, তার সন্ধান শিল্পী ও লেখককেও রাখতে হয়। সাধারণ মানুষ যেমন মোটামুটিভাবে অদৃষ্টনির্ভর, ঠিক সেই ভাবেই লেখককেও তাঁর অজানা ভবিষ্যতের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাতে হয়। ভবিষ্যৎ অর্থাৎ অ-দৃষ্টকে নিয়ে তাঁরও উদ্বেগ-দুর্ভাবনার সীমা নেই। দূর ভবিষ্যৎ বস্তুত অজ্ঞাত, কাজেই লেখকের ভাবনা সাধারণত তাঁর সমকালকে নিয়ে ঘুরপাক খায় বেশি করে। জেনে-শুনে-বুঝে এবং না-জেনে না-বুঝেও কোনো-কোনো লেখক কোনো কোনো কালের পাঠকদের আচ্ছন্ন করে রাখার কৌশলগুলি আয়ত্ত করে ফেলেছেন, এ-রকম প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু তাঁরাও নিশ্চিত নন, ঐ মোহমন্ত্রে পাঠকদের আর কতকাল টেনে রাখবেন।

তা' হলে কী দাঁড়াচ্ছে, জনপ্রিয়তা মানেই শস্তা অথচ রহস্যময় ব্যাপার ?

সাধারণত তা-ই বটে। কিন্তু, সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন একজন লেখক দীর্ঘ সময় ব্যেপে তাঁর পাঠকদের টানতেই থাকেন, স্পর্শ করতে থাকেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠককে—প্রায় প্রত্যেক যুগেই। তাঁর রচনাবলী বিস্মৃত হয় না, তিনি লেখক হিশেবে মুছে যান না পাঠকের হৃদয় থেকে। মুষ্টিমেয় পাঠক, যাঁরা নিজেদের বিশিষ্ট ও রসজ্ঞ বলে দাবি করে থাকেন, জাহির করে থাকেন নিজেদের ঝানু সমালোচক হিশেবে, তাঁদের মতামত উড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধা আমাদের নেই; কিন্তু 'পাঠকসাধারণ' নামে যে পাঠকেরা চিহ্নিত, তাঁদের অভিমত, যতই ঘড়ি-ঘড়ি বদলাক, তারও গুরুত্ব কম নয়, কোনো-কোনো দিক থেকে বরং বেশি। সেই পাঠকসাধারণ, যখন দেখি, দীর্ঘকাল কোনো লেখককে 'প্রিয়'-রূপে চিহ্নিত করে রেখেছে, তখন কিন্তু বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য সমস্যারূপে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যিকরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাবলগ্নেই যে-বিপুল জনসমাদর পেয়েছিলেন, তা আজ এতকাল পরেও, এতকাল ধরেও, নিঃশেষিত হয় নি। তাঁর জন্মশতবর্ষে এই সব ভাবনার সময়ে এ কথাও মনে হচ্ছে, অন্তত গত বছর কুড়ি যাবৎ শরৎসাহিত্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা অভিযোগ উত্থাপন ক'রে আসছেন বুদ্ধি-অভিমানী কিছু পাঠক-সমালোচকেরা। তাঁদের সংখ্যা তো বটেই, তাঁদের যুক্তিগুলিও সর্বাংশে উপেক্ষণীয় নয়।

শরৎসাহিত্য সহজ আবেগে ভরপুর, শরৎচন্দ্র হৃদয়-সর্বস্ব, ঠিক বুদ্ধিগ্রাহ্য নন, তিনি বস্তুত বাস্তববাদী নন, মূলত আদর্শবাদী। তিনি মানুষের দুঃখবেদনার কথা বলেছেন, কিন্তু তার কারণ ও সমাধাননির্দেশে বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রয়োগ করেন নি, তিনি নীচুতলার মানুষ ও তাদের সমস্যা তুলে ধরতে চেষ্টা করলেও তাঁর রচনায় সেই সব মানুষ বড়ো বেশি আদর্শায়িত, তাদের সমস্যা-গুলিও বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যরূপ পায় নি ইত্যাদি তো আছেই, তা'ছাড়াও এক কথায় 'শরৎচন্দ্র বাঙালী জাতির সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করে বাঙালীহৃদয়ে প্রায় ফাঁকি দিয়েই একটা আসন তৈরি করে ফেলেছেন'—এমন উক্তিও আমরা বহু সমালোচক ধুরন্ধরকে করতে শুনেছি। এইভাবেই শরৎসাহিত্যের ললাটে 'বাতিল' ছাপ মেরে দেওয়ার চেষ্টাও অনেকটা পরিমাণে সফল: তরুণ সাহিত্যপাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে সেটা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না।

তবু শরৎসাহিত্য পাঠকবঞ্চিত নয়। আজও শরৎসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকসাধারণের সংখ্যা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। শরৎসাহিত্যের বহু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, শরৎসাহিত্যের মধ্যে চিরত্বের চিহ্ন কোনো-না-কোনোভাবে লগ্ন হয়ে আছে। যদি সত্যিই তা' হয়, তবে সেটা কী? কোন্ গুণে শরৎসাহিত্য আজও পাঠকদের টানে? এই জিজ্ঞাসাটুকু পরিস্ফুট হয়ে থাকলেই, আমাদের এই ক্ষুদ্র রচনার সার্থকতা।

মনে রাখতে হবে, শুধু কিন্তু 'বাঙালীহৃদয়'-এর দোহাই পাড়া চলবে না। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় শরৎসাহিত্যের অনুবাদ হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। অ-বাঙালী অসংখ্য ভারতীয় পাঠক-পাঠিকাদের, অনুবাদের মাধ্যমেও, শরৎচন্দ্র জয় করেছেন। সেক্ষেত্রে, ঐ একই প্রশ্ন। কেন? কী ভাবে, কোন্ গুণে এটা সম্ভব হলো?

জিজ্ঞাসাটার উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ভাবনাটা শুরু হোক

নতুন ভাবে। উত্তরটা এখান থেকে শুরু করলে কেমন হয়?—আসলে, বাঙালীহৃদয়ই নয়, সাধারণভাবে মানবহৃদয়ই শরৎচন্দ্রের সহৃদয়, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির বিষয় ছিল? একটা সময়, একটি জাতি এবং কয়েকটি সমস্যা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হলেও সেগুলির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বিশ্বমানবমনের প্রধান একটি অংশকে অন্তত ছুঁয়ে যেতে পেরেছেন : এটা কি ভাবা ভুল হবে? এও কি সত্যি নয়, দুঃখী, বঞ্চিত, অসহায় এবং ভুলভাবে অপরাধীরূপে চিহ্নিত মানুষের অভাব আজকের পৃথিবীতেও নেই? তাঁদের জন্য যাঁর সমবেদনা, সেই লেখককে কি এত দ্রুত ভুলিয়ে দেওয়া যায়? সমালোচকের হাতের অস্ত্র যতই মোক্ষম হোক্, শরৎচন্দ্রের অপার ভালোবাসার শক্তি কি তারও চেয়েবেশি নয়?

৬. প্রসঙ্গ : শরৎচন্দ্র

তাঁদের সকলকেই লেখক বলা যায় না, যাঁরা লেখালেখি করে থাকেন। এ কথা যদি সত্যি বলে মানতে হয়, তবে এ কথাটাও কম সত্যি নয় যে, সমালোচকমাত্রই সমালোচক নন। এই সূত্রটিকেই পাঠকদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে। পাঠ করেন যিনি, তিনিই পাঠক নন। তবু হয়তো বিতর্ক-বিশ্লেষণ না বাড়িয়েও বলা যায়, প্রকৃত লেখক বা প্রকৃত সমালোচকের তুলনায় সহৃদয় পাঠকের সংখ্যা ঢের, ঢের বেশি। খুব সচেতন না হলেও, উল্লেখযোগ্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী না হলেও, তেমন বিশ্লেষণশক্তি না থাকলেও—সেই বিপুলসংখ্যক পাঠক মোটামুটিভাবে বেছে নিতে পারেন তাঁর লেখককে, লেখকদের; বেছে নিতে পারেন সেই সব বই : যা তিনি পড়বেন।

পাঠক সাধারণের এই নির্বাচনবুদ্ধি ও বোধ যে সব সময়েই সঠিক, সব সময়ের জন্যই সঠিক, এ কথা কেউ বলবেন না। কখনো-সখনো অর্থাৎ কোনো কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ কালের 'বিশেষ পাঠকসাধারণ'-এর নির্বাচন বিভ্রান্ত বা বিভ্রম-উদ্রেককারী বলে সংশয় পোষণের যথেষ্ট কারণ ঘটতে পারে, ঘটেও থাকে। কিন্তু পাঠক-সাধারণের রায়কে সাধারণ পাঠকের বিচারমূঢ়তা রূপে সর্বদা ও সর্বতোভাবে উপেক্ষা করাটাও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় হবে না।

আসলে, কথাটা হলো : জনপ্রিয় লেখকদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেরই কিছুটা সংশয় আছে। এই সংশয় খুব স্বাভাবিক অবশ্য। কারণ, জনরুচিই যে শ্রেষ্ঠ রুচি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আগেই যা বলেছি, অনেক সময়েই জনরুচি উন্নতরুচির প্রতীক নয়। বিশেষ দেশ-কালের

বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে জনরুচি গড়ে ওঠে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রভাবেই জনরুচির চরিত্র নির্মিত হয়। এক কথায়, সামাজিক ব্যবস্থার ও অব্যবস্থার ছাপই জনরুচিতে প্রতিফলিত হয়। আর সেই জন্যই এক একটা বিশেষ যুগে বিশেষ ধরনের সাহিত্য পাঠক সাধারণের কাছে অপরিমিত প্রশ্রয় পেয়ে যায়।

সাহিত্য তাই সব সময়েই সাহিত্যিক কারণেই গৃহীত হয় না। বহুবিধ কারণে, অনেক ক্ষেত্রে, লেখকবিশেষের রচনা কিংবা বিশেষ ধরনের রচনা সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ অবিশ্বাস্য বলে প্রতীত হয়—সে সব কারণ অসাহিত্যিক।

আবার, সমাজের বৈপ্লবিক না হোক্, প্রায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পরেও যখন কোনো লেখক প্রায় সমপরিমাণেই পাঠকদের চিত্তজয় করে যেতে থাকেন, তখন উন্নাসিকতা পরিহার করে এই জটিল প্রশ্নের মুখোমুখী হওয়া ভালো যে, কী আছে তাঁর অর্থাৎ সেই বিশেষ লেখকের রচনায় যা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করেছে?

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে এই সব নানা কথা মনে এলো। কেননা, শরৎচন্দ্র অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কেননা, শরৎচন্দ্র আমৃত্যু সেই জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছিলেন। কেননা, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আজো অক্ষুণ্ণ আছে।

শরৎচন্দ্রের এই ধারাবাহিক, অব্যাহত জনপ্রিয়তাই শরৎসাহিত্যের আধুনিক সমালোচকের কাছে একটি বিশ্লেষণযোগ্য সমস্যা। বলেছি, সমালোচকমাত্রেই সমালোচক নন। এ কথাটাও মেনেছি যে, পাঠকসাধারণের 'রায়'কে সাধারণ পাঠকের বিচারমূঢ়তা বলে উড়িয়ে দেওয়াটাও কোনো কাজের কথা নয়। অতএব, সমলোচকের কাজ নয়, নিছক স্তুতি বা নিন্দা। জনপ্রিয় লেখকের প্রসঙ্গে তাঁর কাজ, অন্তত অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হলো এটাই নির্ণয়ের চেষ্টা যে, লেখক-বিশেষ, যিনি অব্যাহত জনপ্রিয়তার অধিকারী, তিনি কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য, বা কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারলেন।

সমকালের করতালি-সংবর্ধিত হয়েই যাঁদের জনপ্রিয়তা নিঃশেষিত হয়ে গেছে, যাচ্ছে বা যাবে, তাঁদের কথা এই মুহূর্তে উঠছে না। কারণ, শরৎসাহিত্য শুধু সমকালকে আলোড়িত ও আনন্দিত করেই হারিয়ে যায় নি।

পরবর্তী-কালকেও, এবং অদ্যাবধি, শরৎসাহিত্য কোনো-না-কোনো ভাবে স্পর্শ করতে পারছে।

'স্পর্শ' কথাটাই এই প্রসঙ্গে সঙ্গত ব্যবহার। কারণ, কেবল প্রশংসিত নয়, শরৎসাহিত্য সমকালে যথেষ্ট নিন্দাও কুড়িয়েছে। এ কালেও শরৎসাহিত্য নিন্দা-প্রশংসাকে আত্মস্থ করেই দিব্য বেঁচে আছে। বুদ্ধিমান, অতি আধুনিক পাঠক যা-ই বলুন, আজো শরৎসাহিত্য স্পর্শশক্তি হারায় নি।

কিন্তু, কেন হারায় নি?

বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা উচিত, শিল্পকৌশল যে স্তরেরই হোক, গল্পরস নামক বস্তুটি কথাসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। টেকনিকসর্বস্ব গল্প-উপন্যাসের মতো কাহিনীসর্বস্ব গল্প-উপন্যাসও স্বল্পায়ু। কাজেই, গল্পরসপ্রধানই হোক্ কিংবা টেকনিকমুখ্য হোক্, গল্প-উপন্যাসকেও বক্তব্যময় হয়ে উঠতে হয়। বস্তুত, অন্যান্য সৎ শিল্পকর্মের মতোই গল্প-উপন্যাসেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মুখ্যভাবে হোক বা গৌণভাবে হোক 'গল্প' একটা থাকেই। খুব আটঘাট বেঁধে, আয়োজন অনুষ্ঠান করে, প্রকরণকে বা নিছক বক্তব্যকেই স্ব-প্রধান করে কথাসাহিত্য রচনা করা যায়, কিন্তু তার আয়ুও সীমাবদ্ধ। বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের কাছে তারও চাহিদা থাকতে পারে, তা সাময়িক অথবা, এমন-কি ঐতিহাসিক তাৎপর্যেও চিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু তা যাদুঘরের সামগ্রীর মতো।

আসল কথা হলো, শুধু গল্পে বা উপন্যাসেই নয়, সমস্ত শিল্পসাহিত্যেই স্রষ্টাকে সৎ থাকতে হয়—নিজের কাছে। কোনো 'ভঙ্গি' নয়, সাময়িক বাজার চল্‌তি কোনো 'মাদুলি'ও নয়, সে জন্য যা প্রয়োজন, তার নাম আন্তরিকতা, নিষ্ঠা। অনুভূতির সত্য যদি কথাসাহিত্যের গল্পরসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য শিল্পরূপ লাভ করে, তা-হলে তা', অন্তত, দীর্ঘায়ু হয়।

প্রসঙ্গত, অতি-আধুনিকমনস্ক উন্নাসিক পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লেখক শরৎচন্দ্রকে শিল্পী হিসাবে তাঁরা যতটা উদাসীন বলে মনে করেন, শরৎচন্দ্র ঠিক তা ছিলেন না। বরং কারো কথা ধার না করে শরৎচন্দ্রের নিজের কথা তুলেই প্রমাণ করা যায় যে, তাঁর শিল্পবোধ ছিল যথেষ্ট প্রখর, লেখক হিশেবে তাঁর যে জয়জয়কার, তার কারণ, ঐ শিল্পবোধের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল জীবনবোধ।

একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে।' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিটিকটিও বাড়তে থাকে। বেশি বয়সে লেখক যখন লিখতে যায়, তখন এই ক্রিটিক প্রতি হাতে তারা হাত চেপে ধরতে থাকে। সুতরাং, শরৎচন্দ্রের মতে, পরিণত বয়সের সেই রচনায় জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধি যতই প্রকাশ পাক, রসের দিক থেকে তাতে কিছু ঘাটতিও পড়তে থাকে। শরৎচন্দ্র যে লিখেছেন, 'অভিজ্ঞতা দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে'—সেটা বোধ হয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বড়ো লেখকেরও পরিণত বয়সের রচনায়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'থট্ এ্যাডভেঞ্চার',—তুলনায় বিরল বৈকি। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের যে দুঃসাহস, লেখকের পক্ষে তার উপযোগিতা অসামান্য।

শরৎচন্দ্রের লেখার একটা বড়ো গুণ, তিনি খুব তোড়জোড় করে, ধাক্কা দেওয়ার জন্য সাহিত্যের আসরে নামেন নি। অথচ, তাঁরই লেখা এক সময়ে বাংলা সাহিত্যকে এবং সে-সাহিত্যের পাঠককে তীব্রভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল। বিভিন্ন সময়ের, সাম্প্রতিক কালেরও কোনো কোনো প্রয়াস সম্বন্ধে আবার উল্টোটাই সত্য। অনেকেই বিস্তর আয়োজন করে তাল ঠুকে কাজ শুরু করেন। কিন্তু 'দিন না ফুরাতে'ই সেই সব আপাত-ঝকৃঝকে রচনাবলী ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র জানতেন, 'উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী তো হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়'। একই চিঠিতে লিখেছিলেন, 'গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি, তখনি মনে করো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য,—সে টিকবে না।'

'ইনটেলেকচুয়াল গল্প' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দ্বিধা এমন-কি আপত্তিই ছিল। এই জাতীয় একটি গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : '…লেখকের বিদ্যার ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে'। শরৎচন্দ্রের এই মূল্যায়ন থেকে আমরা যেন ধরে না বসি গল্প-উপন্যাসের কাহিনীমুখ্য রূপই ছিল তাঁর আরাধ্য। কেননা তিনিও জানতেন, '…গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা' পরিত্যাজ্য

হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।'

শরৎচন্দ্র চিন্তাশক্তিকে তাঁর সাহিত্যে বর্জন করেন নি। অবশ্য, তিনি তাকে অপরিমিত প্রশ্রয়ও দেন নি। হৃদয়ের দিকটাই তাঁর সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্য পেয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা তাঁর আন্তরিকতার সঙ্গে মিশে তাঁর রচনাকে পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। মনে রাখতে হবে, সাধারণ বাঙালী লেখকদের তুলনায় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার দিকটা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বিচিত্র। বাঙালা স্বভাবকে তিনি পরিহার করেন নি। অথচ, তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে আরো কিছুটা ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়ে গেছেন। মানুষের বাইরের ও ভিতরের দুঃখকষ্টকে, দুঃখী-নির্যাতিত মানুষের সমস্যাকে তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য বিচারকালে তাঁর ভাষার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই ভাষাই বলে দেয়, শরৎচন্দ্রের অসামান্য সহৃদয়তার কথা। শুধু মধ্যবিত্ত জীবন নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের জীবনের এই সহৃদয় রূপকার বাংলা কথাসাহিত্যের 'বিত্ত' বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই দান অস্বীকার করার চেষ্টা মূঢ়তা। চেষ্টা করে লাভও নেই, কারণ, 'দেশের হৃদয় তাঁরে রাখিয়াছে বরি' : রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন অন্তত এই মুহূর্ত পর্যন্ত, তাঁর জন্মের শতবর্ষেও সত্য বলেই অনুভব করা যাচ্ছে।

ঔপন্যাসিক সরোজকুমার

Every writer has a philosophy...

The history of the novel is, in this sense, the history of the novelists' search for an adequate philosophy of life. This is not to say that the novel is philosophy....But the view of life is nevertheless there, illuminating every word he writes, and it is his view of life which will determine the nature and the profundity of the pattern of his book.

Arnold Kettle

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০১-১৯৭২) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য (Major) ঔপন্যাসিক। কিঞ্চিদধিক শতাব্দীকালের (১৮৭২-১৯৭৪) মুখ্য বাঙালী ঔপন্যাসিকদের বিচারনিষ্ঠ তালিকা রচনা করতে হলে সরোজকুমারকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে ধ'রে এই প্রবন্ধের রচনাকাল পর্যন্ত (আগস্ট : ১৯৭৪) যে সব উপন্যাস-লেখককে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ইতিহাস ও ঔপন্যাসিক শব্দ দুটি যথাক্রমে সন-তারিখযুক্ত তথ্যপঞ্জী ও নামাবলী এবং গদ্যে-রচিত কাহিনীমাত্রের লেখক-অর্থে একমাত্র শিথিলভাবেই প্রয়োগ করা সম্ভব। সমগ্রতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত তথ্যতালিকা ইতিহাস নয় আর তাৎপর্যহীন গদ্য-আখ্যান জনপ্রিয়তা ও বিজ্ঞাপনের চমক সত্ত্বেও সেই উপন্যাস হবে না, যেখানে লেখকের সচেতন বা অনতিসচেতন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লক্ষ্যই হচ্ছে 'search for an adequate philosophy of life.' জীবনদর্শন কথাটা বড়োই পুথিঘেঁষা, গুরুভার অথচ অতিব্যবহারে জীর্ণ। কাজেই শব্দটি একটু খুলে দেওয়া দরকার : বলা যায়, লেখকের জীবনদর্শন হ'লো তা-ই যা কি-না উপন্যাসকে সমগ্রতা দেয়, অর্থ-পূর্ণ ক'রে তোলে,

উপন্যাসপাঠ যার ফলে হ'য়ে ওঠে একটি অভিজ্ঞতা : পূর্ণাঙ্গ ও তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা।

উপন্যাসের কাঁচা ও প্রাথমিক কিন্তু অত্যাবশ্যক উপাদান যে জীবন নামক একটা বাস্তব ব্যাপার, মাত্র তর্কেরই খাতিরে ছাড়া কেউ বোধ হয় তা নিয়ে তর্ক করবেন না। কিন্তু জীবন নামক বাস্তব ব্যাপারটায় ঠাসা হলেও কোনো গদ্যে-রচিত আখ্যান তাৎপর্যপূর্ণ না-ও হয়ে উঠতে পারে। জীবনকে উপাদান হিশেবে পর্যাপ্ত পরিমাণেই ব্যবহার করা হলো : তবু উপন্যাস তাৎপর্যে অন্বিত হলো না, সাধারণত এই রকমই হয়, কেননা খুব কম লেখকই দৃষ্টি-শক্তির অধিকারী। জীবন স্বপ্নও নয় ফটোগ্রাফিও নয়। জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র পেলাম, কিন্তু চিত্রিত জীবন সম্পর্কে লেখকের কোনো ভাষ্য পেলাম না : এই অবস্থায় কী বলতে পারি ? জীবন যে রকম : এই, আর কী ?

স্বপ্ন নয়, ফটোগ্রাফ নয় : জীবন-কাহিনী অথবা জীবনানুসারী কাহিনী চাই আর তার সঙ্গেই চাই : আলাদা-ক'রে চাই না : ঠিক সহাবস্থানও নয়, শরীরের সঙ্গে প্রাণের মতো থাকবে আর-কি : কী বলবো ? সেই জীবনদর্শন ব্যাপারটা। এটা ঠিক পরিকল্পনামাফিক করা যায় না, সম্ভবই নয়। জিনিশটা যাকে বলে : স্বতঃস্ফূর্ত। ঐ প্রাণের মতো। তৈরি করা যাবে না। হলে হলো, না হলে হলো না। হলো তো : এক শো পৃষ্ঠার কিংবা তার ছোট মাপের গ্রন্থেই হয়ে গেল ; আর না হলে ? বিশ কিংবা ত্রিশ কিংবা পঞ্চাশ টাকা দামে বাজারে বিকোলেও হলোই না !

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসকে যখন ভাবি, তখন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি : সরোজকুমার খুব খাঁটি অর্থে ঔপন্যাসিক। এবং অন্যতম মুখ্য ঔপন্যাসিক। বলতে পারি : রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ঔপন্যাসের [যার সূচনাও রবীন্দ্রনাথ থেকেই : ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে একাধিক রচনায় চতুরঙ্গ (১৯১৬)-কেই প্রথম আধুনিক বাংলা উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করেছি] যে-ইতিহাস, তার পরিচয় প্রকৃতই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় যদি সরোজকুমারের নামে চিহ্নিত না-হয়।

প্রশ্ন জাগে : চতুরঙ্গ (১৯১৬) থেকে জাগরী (১৯৪৬) পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ত্রিশ বছরকে চোখের সামনে রেখেও চতুরঙ্গ আর জাগরীর লেখক-দু'জন ছাড়া শুধু বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ীর উল্লেখ ও আলোচনা কি ক্রমশ কৃত্রিম ও যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে না ? বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক

আলোচ্য পর্যায়ের তিনজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক, সন্দেহ নেই। এঁদের যে-কোনো একজনের উল্লেখ করলেই পাশাপাশি অপর দুটি নামও উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনাভিজ্ঞতার বিস্তার ও বৈচিত্র্যে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক সমপর্যায়ভুক্ত কী-না, ভেবে দেখা দরকার।

সব বিতর্ক শেষেও তারাশঙ্কর অন্যান্য গুণ ছাড়াও বিস্তার ও বৈচিত্র্যে আলোচ্য লেখকত্রয়ীর মধ্যে অগ্রগণ্য। মানিক জীবনকেই উপন্যাসের 'raw material' হিশেবে প্রায় সর্বত্র বিশ্বস্ততাভরে ব্যবহার করেছেন। তাঁর জীবন-সম্পর্কিত ভাষ্য সর্বত্রই স্পষ্ট। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত উপন্যাসগুলি প্রথমার্ধের তুলনায় বেশি ভালো কী-না, তা নিয়ে তর্ক আছে, কিন্তু সেগুলিকে সাহিত্যেতর বিচারে অনেকেরই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হতে পারে। সব জড়িয়ে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ লেখক। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ সম্পর্কে 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল থেকে এ-পর্যন্ত যিনি যা ব'লেছেন, সবই প্রায় এক সুরে বাঁধা। আরো অনেকের মতো তাঁর সম্পর্কেও কিছু ধারণা তৈরি হয়ে আছে। তিনি বিতর্কিত নন বলেই তাঁর সম্পর্কে মুখস্থ করা প্রশংসা ছাড়া গভীর কোনো আলোচনা চোখেই পড়ে না। অথচ এ-রকম তৈরি ধারণার ফলে সমালোচনাসাহিত্যের ক্ষতি হয়। সত্যও অবিকৃত থাকে না।

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে রচিত 'বর্তমান বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রয়াত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন :

'তাঁহার (বিভূতিভূষণের) কল্পনা লিরিক-কবির মতই আত্মকেন্দ্রিক, তাই অতিশয় সংকীর্ণ; তিনি কেবল তাঁহার নিজেরই ভাবানুভূতির লিপিকার। ঔপন্যাসিককে জীবনের রূপকার হইতে হইবে, এরূপ একান্ত লিরিক-কল্পনা উপন্যাসের উপযোগী নয়। তিনি জীবনের আর্টিস্ট মাত্র — জীবনের কবি নহেন। তাঁহার যাহা কিছু সৃষ্টিনৈপুণ্য তাহা স্টাইলের বলে তিনি তাঁহার সেই প্রথম উপন্যাসের পরে বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জীবনের রহস্যপুরীর কোন নূতন দ্বার-উন্মোচন নাই; সেই একই সুরের আলাপ আছে। এইরূপ রচনা বিভূতিবাবুর পক্ষে এতই সহজ এবং তাঁহার ওই স্টাইল এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, তিনি অনায়াসে সাহিত্য-বিপণির পণ্যভার বৃদ্ধি করিতেছেন, সামান্য ডায়েরী-জাতীয় রচনাও উপন্যাসরূপে বাঙালী পাঠকের

উপাদেয় হইয়া উঠে।···প্রত্যেক যুগের সাহিত্যে জীবনের যুগোচিত অনুভূতি ও তজ্জনিত ধ্যান-ধারণা যেমনই হউক,—যাহা কেবলই আর্ট নয় –কাব্যও বটে, অর্থাৎ, যাহা মানুষেরই গভীরতম পরিচয়-কাহিনী, তাহাতে আমরা কেবল সুর পাই না, কথাও পাই ; সে কেবল সুন্দরের কথাই নয়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বঘটিত এক অপূর্ব রহস্য-রসের কথা। অতএব বিভূতিভূষণের রচনাগুলি আকারে ভঙ্গিতে উপন্যাস হইলেও, আমি—মাত্রাভেদ সত্ত্বেও যাহাকে খাঁটি সৃষ্টিশক্তি বলিয়াছি—তাহার দিক দিয়া, তিনি বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্য-শিল্পী-মাত্র।'

মনে রাখা জরুরি, 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে যখন 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন এই মোহিতলালই 'শনিবারের চিঠি'তে বিভূতিভূষণের রচনার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে লিখিত 'দুইখানি উপন্যাস' প্রবন্ধে 'শেষ প্রশ্ন' ও 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন মোহিতলাল। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে লেখা 'বর্তমান বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধে বিভূতিভূষণের প্রতিভার মৌলিকতাকে স্বীকৃতি জানিয়েও মোহিতলাল লিখেছিলেন—বিভূতিভূষণের কল্পনা 'লিরিক-কবির মতই আত্মকেন্দ্রিক, তাই অতিশয় সংকীর্ণ, তিনি কেবল তাঁহার নিজেরই ভাবানুভূতির লিপিকার। ঔপন্যাসিককে জীবনের রূপকার হইতে হইবে, এরূপ একান্ত লিরিক-কল্পনা উপন্যাসের উপযোগী নয়।···তিনি বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্য-শিল্পী-মাত্র।'

'পথের পাঁচালী' 'আরণ্যক' 'ইছামতী' রচনাত্রয়ীর আমরা মুগ্ধ পাঠক। তবু 'ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ' সম্বন্ধে মোহিতলালের এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আজ নতুন ক'রে ভাবাতে পারে আমাদের। বিচারহীন অভ্যাসজাত প্রশস্তির চেয়ে যুক্তিনির্ভর সমালোচনা সত্যের অনেক বেশি কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় অনাবশ্যক প্রখরতা ও বাগ্‌বাহুল্য সত্ত্বেও কবি মোহিতলাল বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কেননা, তাঁর সমালোচনা পড়তে গিয়ে অন্তত এই অভ্রান্ত প্রত্যয় জন্মায় যে, '···the ultimate concern of the study of literature is evaluation, the pssing of judgement on each particular work of art.'

তাঁর সব সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য নয়, অনেক সিদ্ধান্তই অস্বস্তিকর: কিন্তু সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত উপস্থাপনার দায়িত্ব সমালোচক মোহিতলাল কোথাও এড়িয়ে যান নি, অস্বীকার করেন নি।

মনে রাখতে হবে, বিভূতিভূষণের সুপরিচিত অটল ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ না করেও ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের প্রতি চিরপ্রচলিত ঔদাসীন্যকে আঘাত করা যায়, বাংলা সাহিত্যের এই মহৎ ও অনিবার্য ঔপন্যাসিকের প্রতি বহু সমালোচকের দ্বিধা নামক প্রায় অবিচারকে খণ্ডন করতে গিয়ে বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করাও অনাবশ্যক ও অনুচিত। আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের প্রতিভার স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র…রবীন্দ্রনাথ…শরৎচন্দ্র, তারপরেই একনিঃশ্বাসে পর-পর বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয়ীর উল্লেখ ক'রেই বিভিন্ন লেখকের নামের তাৎপর্যবিহীন তালিকানির্মাণ ও মন্তব্য—এ রকম কাণ্ডকারখানা ইতিহাস ও উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবেকী পাঠক-সমালোচককে বিমূঢ় ও প্রতিবাদী করে তোলে।

আসলে কাজটা সহজ নয়। কারণ, চতুরঙ্গ (১৯১৬) ও জাগরী (১৯৪৬)-র ঔপন্যাসিকদ্বয়ের মধ্যবর্তী ত্রিশ বৎসরটা অন্তরঙ্গ জটিল ও বিচিত্র কিছু উপন্যাসের জন্মকাল: এই সময়টায় বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয়ী ছাড়াও আরো ক'জন ঔপন্যাসিক থেকে যাচ্ছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে বলা যায়, আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় অধুনা-উপেক্ষিত গোপাল হালদার এই সময়ের একজন তাৎপর্যপূর্ণ ঔপন্যাসিক। জীবন ও জীবনের ভাষ্যরচনায় মহিমান্বিত সরোজকুমারও অবশ্য-আলোচ্য একজন ঔপন্যাসিক।

স্পষ্ট করে না-বললেও চতুরঙ্গ থেকে জাগরীর মধ্যবর্তী ত্রিশ বৎসরের মুখ্য (Major) ঔপন্যাসিকরূপে মনে মনে ধরে রাখা হয় শুধু বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয়ীর নাম। এটা অনৈতিহাসিক। অর্থাৎ অন্যায়। অবৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ অসত্য।

হ্যাঁ। সাহিত্য-সমালোচনার কাজটা বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত।

সরোজকুমারের সাহিত্যকৃতি নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন নি: এ কথা বলা হচ্ছে না। সরোজকুমার রায়চৌধুরী নামে একজন লেখক ছিলেন, তিনি ভালোই লিখতেন, খুব খাঁটি নিরহংকার নির্লোভ মানুষ

ছিলেন, সাহিত্যিক দলাদলি থেকে নীরবে নিভৃতে থাকতে ভালোবাসতেন : এইসব তাৎক্ষণিক বিদায়-সংবর্ধনাসূচক কথাবার্তা নিশ্চয়ই শোনা গেছে।

মনে রাখতে হবে, সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঢিলেঢালা স্ফীতকায় বইটাতেই সরোজকুমার আলোচিত, প্রশংসিত ; যতই সংক্ষিপ্ত হোক, ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা উপন্যাসত্রয়ীর বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট ভাষায় নির্ধারণের কাজ সেই মোহিতলালের ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে।

এটা বেশ করুণ কৌতুকই বলতে হবে যে, প্রায়-সেকেলে, রক্ষণশীল (সাম্প্রতিক পাঠক-সমালোচকদের একাংশের বিবেচনাপ্রসূত এইসব বিশেষণ !) প্রবীণতর শ্রীকুমার ও মোহিতলালই প্রায়-যথাকালে (মোহিতলাল তো সঙ্গে সঙ্গেই) সরোজকুমারকে 'উল্লেখযোগ্য' বলে 'উল্লেখ' করেছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ একেলে সমালোচকরা তাঁদের উপন্যাসবিষয়ক বেশ মোটা ওজনের পুথিতেও ঔপন্যাসিক সরোজকুমারকে জায়গা দিতে পারেন না। কেউ বা এক-আধ লাইনে ফুলগঙ্গাজল ছিটিয়ে দ্রুত চলে যান ভিন্ন আঙিনায়।

'উত্তর সাহিত্য' প্রকাশিত (২১ আগস্ট : ১৯৭১) 'সরোজকুমার' প্রবন্ধ-সংকলনটি যে আনুষ্ঠানিক আর প্রেক্ষণ-এর সরোজকুমার স্মৃতি বিশেষ সংখ্যাও (ভাদ্র-আশ্বিন : ১৩৭৯) যে তা-ই : এ তো সত্যি ? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সরোজ-সাহিত্য-পরিক্রমা বইটি কোথায় পাওয়া যায়, ঈশ্বরই জানেন (অর্থাৎ কোনো বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় না)।

সরোজকুমারের বিশেষ বিশেষ উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রটি অনেকেই অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না। অবশ্য, ব্যতিক্রম আছে।*

আমার চিন্তা অবশ্য ঔপন্যাসিক সরোজকুমারকে নিয়ে। সরোজকুমারের কোনো বিশেষ উপন্যাসকে নিয়েই নয়। স্পষ্ট করে বলা দরকার, বিশেষ উপন্যাস নিয়েও আলোচনা করা যায়। সেটা আদৌ দোষের নয়। বরং সমালোচনার একটি রীতিই। সমালোচককে মনে রাখতে হয় : '...the ultimate concern of the study of literature is evaluation, the passing of judgement on each particular work of art.' আর

---

* অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী সরোজকুমারের গল্প ও একটি উপন্যাস নিয়ে, অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র ও রথীন্দ্রনাথ রায় সরোজকুমারের কোনো কোনো উপন্যাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন।

বলাই বাহুল্য, লেখকবিশেষের গ্রন্থবিশেষ নিয়ে আলোচনা তখনই তাৎপর্যলাভ করে, যখন সমগ্র লেখকসত্তাটির স্বরূপসন্ধান ও প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের অনেকেরই দুঃখ : সমগ্রত ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের 'evaluation' এর দায়িত্ব যোগ্য ব্যক্তিদের কেউ এখনও গ্রহণ করেন নি। সরোজকুমারের ট্রিলজি ভালো, খুবই ভালো, কালোঘোড়া অনবদ্য, কৃশানু চমৎকার : কিন্তু এভাবে কোনো ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে সরোজকুমার রায়চৌধুরী কে? কী? কতখানি? এইসব স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, অনিবার্য প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারলে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস বা আলোচনা : ইতিহাসও নয়, আলোচনাও নয়।

না। শুধু সরোজকুমার সম্বন্ধেই নয়। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস রচনার বা বাংলা উপন্যাসের আলোচনার দায়িত্ব যিনিই গ্রহণ করবেন, তাঁকেই প্রত্যেক ঔপন্যাসিক সম্বন্ধেই এই ক্ষুদ্র ও কঠিন প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে হবে : বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠায়। সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারটা রহস্যময় ও জটিল : ভাববাদী বা বস্তুবাদী কেউ তা নিয়ে তর্ক করবেন না বোধ হয়। কিন্তু ভাসা-ভাসা তন্দ্রালসা ভাষায় সাহিত্য-বিচার হয় না। সমগ্রতার বোধ নিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণই সাহিত্য-সমালোচকের কাজ।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী কে, কী আর কতখানি : এই সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট উত্তরসহ এই প্রবন্ধের সূচনা করেছি :

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০১-১৯৭২) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য (Major) ঔপন্যাসিক। কিঞ্চিদধিক শতাব্দীকালের (১৮৭২-১৯৭৪) মুখ্য বাঙালী ঔপন্যাসিকদের বিচারনিষ্ঠ তালিকা রচনা করতে হলেও সরোজকুমারকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

জীবনকে তার গূঢ়তা, বিস্তার ও বৈচিত্র্যসমেত সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে ঔপন্যাসিকের জীবনসম্পর্কিত গভীর ধ্যানের তাৎপর্যময় সংবাদ : এমন উপন্যাসের সংখ্যা কত? এমন ঔপন্যাসিক ক'জন?

সতীনাথ ভাদুড়ীর পূর্ববর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেক্ষিত

জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ ছাড়া যাঁদের কথা ভাবা যায়, তাঁদের মধ্যে সরোজকুমার নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য। এই মুহূর্তে ঔপন্যাসিক সরোজকুমারকে কেন্দ্র করেই আমার বিচার-বোধ-বিশ্লেষণ স্থির ও সংহত করতে চাই। কোন্ লগ্নে কার প্রথম উপন্যাসটি বেরিয়েছিল, সেই 'হিসাব মিলাতে' আমার উৎসাহ নেই। নিছক তথ্যচারণারও প্রস্তুতিজনিত প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা অত্যাবশ্যক নয়। সরোজকুমারের তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসের সন্ধানেই আমাদের উদ্যম।

বন্ধনী (১৩৩৮), শৃঙ্খল (১৩৩৯), ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা (১৩৪৩-১৩৪৪-১৩৪৫) ও শতাব্দীর অভিশাপ (১৩৪৮)—সরোজকুমারের এই ক'টি তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস বেরিয়েছিল আমাদের নির্বাচিত কালসীমার মধ্যেই। কালোঘোড়া (১৩৫৩) ও কৃশানু (১৩৬১)—খুব সতর্ক সংযত নির্বাচনেও এই আরো দু'টি গ্রন্থ ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের স্থান ও গুরুত্বনির্দেশে নিশ্চয়ই সহায়ক।

নির্বাচিত কালসীমার মধ্যেই সরোজকুমার যে বিস্তার ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সদ্য-উপস্থাপিত তালিকার বন্ধনী, শৃঙ্খল ও শতাব্দীর অভিশাপ তারই প্রমাণ দেয়। কিন্তু ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা উপন্যাসত্রয়ী আলোচ্য পর্বের অন্যতম মহৎ উপন্যাস। আলোচ্য পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে ক'টি মাত্র বিরল সৃষ্টির এ যে অন্যতম, সে-বিষয়ে সংশয়মাত্র নেই। উপন্যাসত্রয়ীকে আলোচ্য পর্বের মহৎ সৃষ্টি বলায় মনে হতে পারে সরোজকুমারের ট্রিলজি যেন কালোত্তীর্ণ নয়। বলাই বাহুল্য যে-সৃষ্টি 'মহৎ' তা' যে-পর্বেরই হোক, কালোত্তীর্ণও। ময়ূরাক্ষীর রহস্যধারায় পুণ্যস্নানের অভিজ্ঞতা যে-পাঠকের হয়েছে, তিনিই নিঃসংশয়ে স্বীকার করবেন, নতুন ফসল ট্রিলজির নিঃশব্দ অধিকারের বিরলমহিমাকে।

অতঃপর ঔপন্যাসিক সরোজকুমারকে কেন অন্যতম মুখ্য ঔপন্যাসিক বলে মনে করি, সে সম্বন্ধে কিছু বিশ্লেষণ অবান্তর হবে না।

ঔপন্যাসিক বলতে কোন্ ধরনের লেখককে বুঝি, সে বিষয়ে আমার ধারণা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে আশা করা যায়। তবু, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার মতে, মানুষ ও তার জীবনকে গূঢ়তা, বিস্তার ও বৈচিত্র্যসমেত

বিশ্বস্ততাভরে সার্থকভাবে যিনি তুলে ধরতে পারেন মোটামুটি দীর্ঘ কিন্তু অনতিনির্দিষ্ট আয়তনের গদ্যে-রচিত আখ্যানে আর যাঁর রচনা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে জীবনসম্পর্কিত তাঁর গভীর ধ্যানের তাৎপর্যময় সংবাদ ; তাঁকেই ঔপন্যাসিকরূপে চিহ্নিত করা যায়।

সত্যি কথা বলতে কী, সাধারণ উপন্যাস-লেখকেরা এই সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবেন না। এমন কি, ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা 'above the average'—তাঁরাও একের অধিক গ্রন্থে আমাদের এইসব দাবি পূরণ করতে পারবেন না। অথচ একটি মোটামুটি সার্থক উপন্যাস লিখবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-কলম-কালি ও সময়ই যথেষ্ট একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে : বিদেশী সমালোচকের এই ভরসা মুখ্য ঔপন্যাসিকের পক্ষে আদৌ সান্ত্বনার কারণ নয়।

একটি মাত্র উপন্যাসের সফলতার ভিত্তিতে কাউকে মুখ্য ঔপন্যাসিকরূপে চিহ্নিত করা সঙ্গত বলে আমি মনে করি না। জীবনের বিস্তার ও বৈচিত্র্যকে কতটা আত্মস্থ কতটা প্রকাশ করার শক্তি ঔপন্যাসিকের আছে, তার পরিচয় পেতে হলে তাঁর তিন-চার-পাঁচ অথবা আরো বেশি সংখ্যক উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমার সংজ্ঞাধৃত সূত্রগুলি প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে তার ফল নির্ণয় করতে হবে।

১. জীবনের গূঢ় সমাচার তিনি শোনাতে পেরেছেন আমাদের
২. জীবনকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে না দেখে তিনি জীবনের প্রসারিত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাঁর রচনায় জীবনের সেই বিস্তার লক্ষণীয়
৩. তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনভাবনা বৈচিত্র্যপূর্ণ
৪. তিনি জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত, উপন্যাসের মধ্যে রোমান্সের অযথা আমদানি তাঁর বিস্ময়কর মাত্রাবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের দরুন তিনি ঠেকাতে পারেন, শক্তিমান তারাশঙ্করও যা সবসময়ে পারেন না
৫. তাঁর রূপায়ণ সার্থক
৬. গল্পকে টেনে লম্বা করে তিনি উপন্যাস বানান নি, আবার সৌভাগ্যক্রমে বৃহদায়তন উপন্যাসই মহৎ উপন্যাস : এই সাম্প্রতিক আত্মপ্রতারণার পরিচয় তাঁর রচনায় নেই
৭. তাঁর উপন্যাসে জীবনের কাঁচা উপাদান যেমন ব্যবহৃত হয়েছে,

তেমনি তাঁর উপন্যাসে জীবনসম্পর্কিত তাঁর গভীর ধ্যানের তাৎপর্যময় সংবাদও স্বতঃস্ফূর্ত

সরোজকুমারের খান দশেক উপন্যাস সম্পর্কে, একটু আগে উল্লিখিত অন্তত ছয়টি (ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা উপন্যাসত্রয়ী : যা 'নতুন ফসল' ট্রিলজি নামে পরিচিত : এগুলিকে একটি উপন্যাস হিশেবে ধ'রে) উপন্যাসপ্রসঙ্গে উপযুক্ত সাতটি দাবি উত্থাপন করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সেইজন্যই, আমার বিচার-বোধ অনুসারে আমি সরোজকুমারকে মুখ্য (Major) ঔপন্যাসিক বলে মনে করি।

কতজন বাঙালী ঔপন্যাসিক খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যাঁরা পাঁচ বা ততোধিক উপন্যাসে মুখ্য ঔপন্যাসিকের এই চরিত্র-লক্ষণগুলি বজায় রাখতে পেরেছেন, জীবনের জটিল, বিচিত্র, গভীর রহস্যরূপের অন্তরঙ্গ পাঠ-পরিচয় গ্রহণ ও উপস্থাপন করতে পেরেছেন ?

ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ এই সূত্রে স্মরণীয়। সাহিত্য-রূপসৃষ্টিতে তারাশঙ্করকে গ্রামীন ও মানিককে তাঁর নাগরিক মননসমৃদ্ধ বলে মনে হয়েছিল। বিভূতিভূষণকে তিনি 'কোকিলবৃত্ত' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, লিখেছিলেন, বিভূতিভূষণ আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষণপন্থী নন। সুন্দর ও মধুরের শান্ত উপাসক, জটিলতামুক্ত জীবনের পূজারী বলে তাঁকে সকলেরই মনে হবে।

লক্ষণীয় যে, সরোজকুমারের মুখ্য উপন্যাসগুলিকে কোনো একটি সূত্রে বাঁধা কিছুতেই সম্ভব নয় : সমান অসম্ভব কোনো একটি 'বিশেষণ'-এ সরোজকুমারের সামগ্রিক ঔপন্যাসিক-পরিচয়কে বাঁধা। সরোজকুমার গ্রাম-নগর মিলিয়ে যে-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার পরিধি ও বৈচিত্র্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়।

সেইজন্যই, 'কল্লোলযুগ' বইটিতে অচিন্ত্যকুমার স্বভাবসুলভ স্বাদু গদ্যে লেখক সরোজকুমারের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, বহুজন-সমাদৃত ও উদ্ধৃত সেই মন্তব্যটিকে সরোজকুমারের ঔপন্যাসিক সত্তার স্বরূপ বিচারের পক্ষে সহায়ক বলে আমার মনে হয় না। অচিন্ত্যকুমারের সহৃদয় গদ্য ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের একাংশকে আলোকিত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সাহায্যে তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার সমগ্ররূপটিকে অনুভব করা যায় না। ফলত, মন্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। অচিন্ত্য লিখেছেন : 'লেখনীটি সূক্ষ্ম ও শান্ত, একটু বা কোমলার্দ্র। জীবনের যে খুঁটিনাটিগুলি উপেক্ষিত, অন্তরদৃষ্টি তার প্রতিই বেশি

উৎসুক। 'কল্লোলে'র যে দিকটা বিপ্লবের সেদিকে সে নেই বটে, কিন্তু যে দিকটা পরীক্ষা বা পরীষ্টির সে দিকের সে একজন। এক কথায় বিদ্রোহী না হোক সন্ধানী সে। এবং যে সন্ধানী সেই সংগ্রামী।'

অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্যটির প্রথম দু'টি বাক্য ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের সামগ্রিক-পরিচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত। সরোজকুমারের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথাই অচিন্ত্যকুমারের ঐ বাক্যদুটিতে প্রতিফলিত। লেখনীটি সূক্ষ্ম তো বটেই, আপাত-শান্তও বটে, কিন্তু শরতের মেঘের ভিতরেও বজ্র লুকিয়ে থাকে। কেবল শান্ত বা কোমলার্দ্র নয় সরোজকুমারের লেখনী। তা জীবনের শান্ত-অশান্ত, কোমল ও কঠিন উভয় রূপকেই তুলে ধরে। জীবনের খুঁটিনাটিগুলিই তো ঔপন্যাসিকের রচনায় উদ্ভাসিত হবে। ডিটেলের কাজ ঔপন্যাসিকের অবজারভেশনের ক্ষমতাকেই প্রমাণ করে। কিন্তু সেই দিকেই সরোজকুমারের অন্তরদৃষ্টি 'বেশি উৎসুক' এমন কথা আমাদের মনে হয় না। যা প্রবল, প্রত্যক্ষ, জটিল: তার প্রতিও সরোজকুমারের নির্মোহ ঔপন্যাসিকদৃষ্টি প্রসারিত। কল্লোলের ঔপন্যাসিকদের জীবনদর্শনের সীমাবদ্ধতা, সৌভাগ্যক্রমে, সরোজকুমারের রচনায় অনুপস্থিত।

পরবর্তী তিনটি বাক্যও দ্বিধাজড়িত, যদিও অচিন্ত্যকুমারের নিপুণ বাক্যবয়নের শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় সেখানেও আছে। কল্লোলের 'বিপ্লবের দিকটা' আজ সাময়িক উত্তেজনার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয় না আমাদের। সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এইরকম তথাকথিত বিপ্লবপ্রয়াস অবশ্য লক্ষণীয়। এই জাতীয় বিপ্লবের তাৎক্ষণিক উপযোগিতা যাই হোক, সাহিত্যের মূল ধারায় তার স্থায়ী প্রভাব প্রতিপত্তি প্রেরণা বহুলাংশে বিতর্কাধীন। 'কল্লোলে'র বিপ্লবের দিকে সরোজকুমার ছিলেন না, অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন। ভালোই হয়েছে। সে-দিকে তারাশঙ্কর ও মানিকও ছিলেন না। ছিলেন না বলেই তারাশঙ্কর, সরোজকুমার, মানিক কিছু সার্থক স্থায়ী উপন্যাস লিখতে পেরেছেন: লক্ষণীয় যে, 'কল্লোলের প্রধানতম শিল্পীরা জীবন সম্বন্ধে নেতিবাদী মনোভঙ্গির জন্য কোনো স্থায়ী মহৎ উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি, অনেকগুলি চমৎকার ছোটগল্পের বিদ্যুদ্‌বিকাশেই তাঁরা নিজেদেব শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।'

'এক কথায় বিদ্রোহী না হোক সন্ধানী সে। এবং যে সন্ধানী সেই সংগ্রামী।'—এই কুশলী শব্দবিন্যাস থেকে সরোজকুমার সম্বন্ধে লেখক কী বলতে

চাইছেন আর কী বলতে চাইছেন না, কিছুই যেন স্পষ্ট হয় না। কিন্তু একটা কথা ঠিক, 'বিদ্রোহী' বা 'সংগ্রামী'-রূপে সমকালে চিহ্নিত লেখকরা 'তাৎক্ষণিকের যৎসামান্য পরশে'র বেশি কিছু বড়ো একটা পান না। বরং 'সন্ধানী' কথাটা ভালো। একজন ঔপন্যাসিক 'সন্ধানী' ('the novelists' search for an adequate philosophy of life'): কথাটা ভালো লাগে আমাদের।

সরোজকুমারের সমকালীন অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্যটি দেখা গেল। এবার তাঁর পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক বিমল করের (আমার মতে, বিমল কর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য ঔপন্যাসিক) একটি সংক্ষিপ্ত রচনার (এত সংক্ষেপে সরোজকুমারের ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, ঋজুভঙ্গিতে আর কেউ তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না) অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: 'সরোজকুমারকে আমরা ভুলে যাব—এটা আমার সহ্য হয় না। অন্তত, আজ যাঁরা কমপক্ষেও আমার বয়সী—পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছেন তাঁদের পক্ষে তো নয়ই। আমাদের জীবনে এমন কোনো কোনো ঘটনা ঘটে গেছে যা ভোলা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এইরকম একটি ঘটনা। আর সরোজকুমার সেই সময়ে এমন দু'একটি লেখা লিখেছেন যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নেই। 'শতাব্দীর অভিশাপ' 'কালোঘোড়া'র মতন উপন্যাস সহজে লেখা যায় না। যিনি লিখতে পারেন তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার করা মূর্খতা।'

'শতাব্দীর অভিশাপ'-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বিমল করের মন্তব্য: 'এ-কথা আমরা হয়তো কোনোদিন ভেবে দেখি নি, বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের যে আদর্শগত সংঘাত বেধেছিল তার প্রথম ইঙ্গিত রয়ে গেছে 'শতাব্দীর অভিশাপ' গ্রন্থে। তিন পুরুষের আদর্শগত, ধারণাগত বিরোধের কাহিনী 'শতাব্দীর অভিশাপ'।...ব্যক্তিগতভাবে আমি, আমার যৌবনে, এই উপন্যাস পড়ে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এখনও কখনো কখনো এই উপন্যাসটির 'থিম্' আমাকে নাড়া দেয়।'

'কালোঘোড়া' সম্বন্ধে বিমল করের মন্তব্য: যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ কলকাতা শহরের পটভূমিতে সে-সময় অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু, সরোজকুমারের মতো 'এমন বিশ্বস্ত, সমৃদ্ধ কাহিনী বোধ হয় অন্য কেউ লিখতে পারেন নি।...এক এক সময় এমনও মনে হয়, যথার্থ 'ইভিল'-এর ছবি বাংলা

সাহিত্যে বিশেষ একটা আঁকা হয় না, আমাদের ক্ষমতায় কুলোয় না। সরোজকুমার সেদিক থেকে আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেই ছবিকে প্রায় নিখুঁত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের ভালো লেখার মধ্যে 'কালোঘোড়া'র স্থান হওয়া উচিত।'

নতুন ফসল নিয়ে একাধিক আলোচনা আছে সমালোচকদের। তবু এই ট্রিলজি নিয়ে আরো অনেক সমালোচনা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্ভবপর। হারাণ-বিনোদিনীর বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এবং তারপর হাবল-মেনীকে নিয়ে দু'জনের যাত্রা নিজেদের ঘর-গৃহস্থালির পানে আর সেই সময় বিনোদিনীর বর্ণনা অনেকেই উদ্ধৃত করেন। সত্যিই অসামান্য সেই বর্ণনা।

মাঠের পথ ভেঙে ওরা তখন চলেছে স্টেশনের দিকে। আগে হারাণ— 'কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ। মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্যের পরিপূর্ণ আলোর রাজছত্র। যেন সে এই বসুন্ধরার দিগ্বিজয়ী রাজা।··পিছনে বিনোদিনী। মাঠের প্রবল হাওয়ায় তার পিঠের কাপড় নৌকার পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে।··সবাইকে চেনা যাচ্ছে, কেবল ওকে নয়। ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন এই বসুন্ধরা স্বয়ং—আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে, ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে দেখা দেয়। কলঙ্কে এবং মহিমায় সে রূপের আর শেষ নেই!' অংশটি আমি সংক্ষেপেই উদ্ধৃত করলাম। কিন্তু নতুন ফসল-এর এই শেষতম অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করা যে-কোনো সমালোচকের পক্ষেই কঠিন, তা স্বীকার করি।

কিন্তু সুখপাঠ্য মন-ভরানো এই অনুচ্ছেদটির ক্লাসিক ব্যঞ্জনা-মহিমা উপলব্ধির জন্য পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটিও পাশাপাশি রাখতে হয়। বুঝে নিতে হয়, বিনোদিনীই কেন 'এই বসুন্ধরা স্বয়ং'! কেবল শেষ অনুচ্ছেদটি থেকে তা তো স্পষ্ট হয় না। ট্রিলজির পাঠক 'কলঙ্কের' কথাটা বুঝতে পারে, কিন্তু বিনোদিনীর বসুন্ধরাসুলভ 'মহিমা'টি কী রকম?

সর্বশেষ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী উপেক্ষিত অনুচ্ছেদটির দিকে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি পড়া উচিত: 'আজকে রোদের যেন একটু তেজ আছে। কদিন আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে লাঙল দেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। রিক্তা বসুন্ধরার বক্ষ বিদীর্ণ করে আবার নতুন বীজ বপন করা হবে। ধু ধু করা শূন্য মাঠ আবার উঠবে ধনে-ধান্যে ভরে। তারই আয়োজন চলছে মাঠে মাঠে।'

'রিক্তা বসুন্ধরার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আবার নতুন বীজ বপন করা হবে'

'ও (বিনোদিনী) যেন এই বসুন্ধরা স্বয়ং'

'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত' হয়েও বসুন্ধরার উর্বরতা যেমন প্রশ্নহীন : বিনোদিনীও তেমনি হারাণ, যে-কোনো অর্থেই হোক্ গৌরহরির, তারাপদর আনন্দসুখের উপকরণরূপে 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত' হয়েও সতত 'নতুন বীজ বপনে'র যোগ্য, উর্বরা প্রাণভূমি। প্রৌঢ় হারাণের বর্ণনা : 'কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ।···যেন সে এই বসুন্ধরার দিগ্বিজয়ী রাজা।'—'বসুন্ধরা'র রাজা। বিনোদিনীই বসুন্ধরা।

তবে কি 'নারী' এখানে সততসৃষ্টিব্যাকুলা বসুন্ধরাই? না। ময়ূরাক্ষী তো কেবল 'নতুন ফসল'-এর প্রথম পর্বই নয়। সমগ্র ট্রিলজিরই নাম হতে পারতো : 'ময়ূরাক্ষী'। অর্থাৎ নারী (বিনোদিনী) এই ট্রিলজিতে একাধারে নদী ও বসুন্ধরা।

বলা যায় : নারী = নদী + বসুন্ধরা।

জল আর মাটি মিলে ফসল। দুটিকেই ধারণ করেন বসুন্ধরা। নারীও মানববংশকে সতত ধারণ করে চলেছে। বহু বেদনায়। হাসিতে অশ্রুতে। অপমানে অভিষেকে। রসময় বলেই দিয়েছে : নারী কখনো অপবিত্র তথা অব্যবহার্য হতেই পারে না। 'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত' হলেও নয়। বসুন্ধরাও যেমন কখনো পুরোনো হলো না। পুরোনো হলো না এই পুরোনো পৃথিবী বারবার নতুন জন্মের আবির্ভাবেও। তাই 'নতুন ফসল' নামটিও সার্থক। একই জমিতে কতবার ফসল ওঠে। একই নারী নানারূপে নিত্যনবীনা। কর্ষণ-নিপুণ কৃষক-পুরুষের প্রযত্নে নারী-বসুন্ধরা বারবার ধনে-ধান্যে : ফসলের গরিমায় : ভরে ওঠে।

কিন্তু না, ময়ূরাক্ষীকে ভুললে চলবে না। নতুন ফসল-এর অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রটির অবিচ্ছিন্নতা এই ময়ূরাক্ষীর প্রবাহগুণে। লক্ষণীয়, ময়ূরাক্ষীর স্বভাব-বর্ণনাও নিছক 'কোমলার্দ্র' নয়। তা'ছাড়া : বিনোদিনী শুধু বসুন্ধরাই নয়। বিনোদিনী ময়ূরাক্ষীও। তাই ময়ূরাক্ষীর এই আপাত-সাধারণ বর্ণনার ভিতরেই নারীর, বিনোদিনীর দ্বৈত-স্বভাবের আশ্চর্য-গভীর পরিচয় কত অনায়াসে ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে : 'এমনি করে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী। কোথাও গ্রামের কোল ঘেঁষে লাজনম্রা তনুদেহ কিশোরী বধূর মতো। কোথাও দিগন্তপ্রসারী ছায়াহীন শূন্য মাঠের মধ্যে দিয়ে অনশনক্ষীণা ব্রতচারিণী

দেয়াসিনীর মতো। আবার দহের কাছে যেন স্থিরযৌবনা বিলাসিনীর মতো. তার নিস্তরঙ্গ নীলাভ কালো জল মৃত্যুর মতো লোভার্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।'

তাই বলা যায়: বিনোদিনী নামের নারী নতুন ফসল-এ ময়ূরাক্ষী নামের নদী ও বসুন্ধরার সমার্থক। এই বোধের সমগ্রতাতেই ট্রিলজির অসামান্যতা।

নানা নামে এই নায়িকার পরিচয়: সে কখনো বিনোদিনী : কখনো ময়ূরাক্ষী : কখনো বা বসুন্ধরা!

সার্থক ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন তো উপন্যাসের কোনো একটি পৃষ্ঠায় বা অনুচ্ছেদে বন্দী থাকে না। প্রথমেই বলেছিলাম: জিনিশটা স্বতঃস্ফূর্ত। ঐ প্রাণের মতো। শরীরের সঙ্গে প্রাণের মতো যা মিশে থাকে সর্বাঙ্গে। তাই এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের পরেও মনে হয় 'নতুন ফসল'-এ সরোজকুমারের জীবনদর্শনের বিশিষ্টতার একটি দিক প্রতিফলিত হয়েছে ললিতার চিন্তায়:

'ঠিক বোঝা যায় না,—কিছুতেই ঠিক বোঝা যায় না। বুঝতে গিয়ে কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। মানুষের কাছে তার নিজের মনের চেয়ে অপরিচিত আর কিছুই নেই। তার শেষ পর্যন্ত নজর চলে না। কেমন অস্পষ্ট অনুভব করা যায়। কেবল কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না,— এবং কিছুই ঠিক বোঝা যায় না।'

আমার ধারণা, সরোজকুমারের সেই নির্লিপ্ত নির্মোহ দৃষ্টি ছিল, যা' সত্যের মর্মস্থল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয়। কোনো গোষ্ঠী বা দলের মুখ চেয়ে পূর্বপোষিত কোনো ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি জীবনকে দেখেন নি, দেখানও নি। তিনি জানতেন, লেখকের কাছে:'...সমাজও বড়ো নয়, রাজনীতিও বড়ো নয়, অর্থনীতিও বড়ো নয়। সেগুলি রসসৃষ্টির উপাদানমাত্র। বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে অথবা একটা বিশেষ পটভূমিকার সামনে মানবমনের যে অপরূপ প্রকাশ, আসলে তাই তাকে আকর্ষণ করে। সেইটাই হচ্ছে গল্পের চিরন্তন আবেদন, রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও নয়। আজকের রাজনীতি কাল হয়তো বাতিল হয়ে যাবে, আজকের অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক আবেষ্টনের কাল হয়তো চিহ্নও থাকবে না। কিন্তু মানুষের কাছে এ আবেদন তা সর্বকাল সর্বদেশেই সমান প্রবল। সাহিত্যের পরমায়ু তার মধ্যেই নিহিত।'

সমগ্রত ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের স্বরূপ-সন্ধানের এই হলো ভূমিকা।

কবিতায় দুর্বোধ্যতা, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

লেখকে-পাঠকে একটা লুকোচুরি খেলা চলে আসছে অনেকদিন ধরেই। কে জানে হয়তো চিরদিনই এমনি ছিল। হয়তো এমনই থাকবে। সব যুগেই উঠতি-লেখকেরা 'একটা নতুন কিছু করো'র প্রেরণায়, ঝোঁকে, তাঁদের রচনায় কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছু দুর্বোধ্যতা সঞ্চার করতে পছন্দ করেন আর তক্ষুনি অভ্যস্ত রুচির পাঠকেরা 'এর মানে কী' 'এর মানে কী' এই বলে তোলপাড় শুরু করেন।

দুর্বোধ্যতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে, প্রকৃত প্রস্তাবে খুব কম ক্ষেত্রেই অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দুর্বোধ্যতা অনেক সময়েই বহুলাংশে আরোপিত অর্থাৎ লেখকের অক্ষমতাজনিত। আবার, অভ্যস্ত রুচির পাঠকের দুর্বোধ্যতা বিষয়ক আপত্তি বহু ক্ষেত্রেই নিরর্থক ও আলস্যজনিত চেঁচামেচি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ছাড়াও আছেন এক শ্রেণীর আধুনিকমনা পাঠক, নবীন, প্রবীণ যাই হোন তাঁরা, যাঁর যে রচনা যত বেশি দুর্বোধ্য, তারই উদ্দেশ্যে সমবেত সঙ্গীত গেয়ে ওঠেন 'বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম, গাহিলাম জয়, তব জয়'! এঁদের দশাটা হলো মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের মনস্তত্ত্বের মতো, যার সম্বন্ধে রক্তকরবীর চন্দ্রা বলেছিল বিশুকে, 'যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ, সেই তোমাদের তত বেশি টানে'। কে জানে, যে কবিতা কালবিশেষে যত কম বোঝা যায়, তাই আমাদের তত বেশি টানে হয়তো!

কেন এমন ধরে নেওয়া হয়, আধুনিকতা = দুর্বোধ্যতা, অথবা দুর্বোধ্যতা = আধুনিকতা, এই রহস্য ভেদ করা সত্যিই কঠিন। স্বাদবদলের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তুই মানুষ গ্রহণ করে থাকে বটে কিন্তু কোনটা কী, তা বোধহয় জেনে রাখা ভালো, লোভনীয় খাদ্যবস্তুও অস্বাস্থ্যকর হওয়া বিচিত্র নয়।

আধুনিকতা তো অসুস্থতা নয়, ভঙ্গিসর্বস্বতাও নয়। আধুনিক রচনামাত্রই যেমন দুর্বোধ্য নয়, তেমনি দুর্বোধ্য রচনামাত্রই আধুনিক রচনা নয়, এর চেয়ে সহজ কথা আর কী হতে পারে? কিন্তু জীবনের জটিলতা জীবন দিয়ে উপলব্ধির আগেই আমাদের মধ্যে যাঁরা পুথি পড়েই জীবন ও জীবনের সব জটিলতা খুঁজে পেয়েছেন, তাঁদের কি সহজ কথা শোনার কিংবা বোঝার সময় জীবনেও হবে?

তবু মাঝে মাঝে বোধ হয় ভেবে দেখা ভালো। অদূর অতীতের দিকেও ফিরে দেখলে ক্ষতি নেই, লাভ হতে পারে। অদূর অতীতের কথাটাও ভয়ে ভয়ে বলতে হয়। কারণ, আমরা তো জেনেই বসে আছি, অতীত মানেই পুরোনো, আর যা পুরোনো তাই 'অনাধুনিক'। সর্বনাশ। 'অনাধুনিক' হওয়ার ঝুঁকি কি নেওয়া যায়? নতুনদার সেই আর এক পাটি পাম্প-এর মতো! জীবন যায় যাক্! সে তো ছার! কিন্তু ঐ 'আর এক পাটি পাম্প'? তার বিহনে অস্তিত্বের আর বাকি কী রইল?

কিন্তু 'আর এক পাটি পাম্প'-এর মতো 'আধুনিকতা'কে যারা মোহরঞ্জিত দৃষ্টি নিয়ে দেখে, তারা যে আধুনিকই নয়, সে কথা তারা নিজেরাও জানে না। সত্যি কথা বলতে কী, নির্মোহ, নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে আধুনিকতার অন্যতম প্রধান চরিত্র লক্ষণ। তাই আধুনিক হতে হলে সর্বপ্রথম নির্মোহ, নির্লিপ্ত, বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা প্রয়োজন। 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে মোহবদ্ধতা আধুনিক হওয়ার পথে সব চেয়ে প্রধান অন্তরায়।

আধুনিক কাব্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সায়াম্সেই বলো আর আর্টসেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন' — মনের এই নিরাসক্তি না থাকলে বস্তুর সত্যস্বরূপ কী ভাবে উপলব্ধি হয়?

'মডার্ন' কথাটার অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা'। সাহিত্যের সঙ্গে নদীর উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ যেমন বাঁক ফেরে, সাহিত্যও তেমনি চলার পথে মাঝে মাঝে বাঁক নেয়। সেই বাঁকটাকেই মডার্ন বা আধুনিক বলা যেতে

পারে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি হলো, 'এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'

সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনারীতির বাঁক পরিবর্তনটা নিছক নদীর বাঁক ফেরার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথও দেখেন নি। সমাজ-জীবনে যে সব নতুন ঘাত প্রতিঘাত ও পরিবর্তন-পরম্পরা, তা থেকেই সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বাণীর স্বাতন্ত্র্য ও রীতির বিশিষ্টতা দেখা দেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই সুরস্বাতন্ত্র্য, বাণী ও রীতির বিশিষ্টতা পাঠক-সমালোচককে অনভ্যাসের অস্বস্তিতে ফেলতে পারে সময় সময়। এই অস্বস্তিরই নামান্তর যাঁদের কাছে দুর্বোধ্যতা, তাঁদের আরামপ্রিয় আলস্যপরায়ণ পাঠক বলাই ভালো। এঁদের হিশেবে আধুনিকতা মানেই দুর্বোধ্যতা এবং ফলত দুটিই পরিত্যাজ্য। এঁদের হিশেবের মধ্যেই যে গোলমাল, সেটা এ দেরই চোখে পড়বে কী করে? তাই এঁরা যে কোনো আধুনিক কবিতা, তা যতই সৎ ও শুদ্ধ রচনা হোক না কেন, সব কিছু নিয়েই এলোমেলো রসিকতা করে রসজ্ঞতার পরিচয় দিতে পছন্দ করেন।

অন্যদিকে আছেন আধুনিকতা-বিলাসীর দল। এঁরাও দায়িত্ব ও শ্রম সংক্ষেপের জন্য সাহিত্যের পূর্বতন ইতিহাস, অভিপ্রায়, স্বভাবধর্ম ও ঐতিহ্যের ঠিকানা না নিয়েই 'আধুনিক' বনবার দুরাশায় বিবিধ বিদেশী কোটেশন ও নিজেদের এলাকায় প্রচলিত একটি নিজস্ব শব্দভাণ্ডার ব্যবহারের সহায়তায় কার্যোদ্ধারে উদ্যোগী হন। সমকালকে কিছুকালের জন্য কখনো বা দীর্ঘকালের জন্য বিভ্রান্ত করার কলাকৌশল এঁরা জানেন। যদি বলেন সেটাই বা কম কী? তার জবাব না দিলেও চলে। বলার কথাটা এই যে, আধুনিকতা অলীক বস্তু নয়। সেটা সত্য বলেই তার নকল সাহিত্যের বড়োবাজারে বিস্তর পাওয়া যায়। সতর্কতার আবশ্যক সেখানেই। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার যিনি প্রথম অরাবীন্দ্রিক কবি, সেই রবীন্দ্রনাথই তো সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন,

'সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।'

আবার, 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি,
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।'

দেশ বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তা থেকে গ্রহণের মধ্যে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। বড়ো লেখকেরা নানা সূত্র থেকে গ্রহণ করেই থাকেন, কিন্তু তা শুধু নিছক ঋণগ্রহণে সমাপ্ত নয়, সুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই। তাঁদের রচনাকার্যে তাঁরাও যুক্ত করে দেন—'নতুন কিছু, ভিন্নতর কিছু'। কথাটা বিদেশী সমালোচকেরই। কিন্তু খাঁটি কথা।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে আধুনিক কবিতার মিল ও অমিল দুটোই লক্ষণীয়। সেটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই মিল থাকা আর না থাকাটাও। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'—আবার তিনিই বলেছেন, 'এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।' অর্থাৎ 'কালের কথা'টা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না বোধ হয়।

'কবিতার কথা'য় উত্তর রৈবিক যুগ সম্বন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন 'এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়—কয়েকজন কবির যুগ। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একছত্র প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত অনুভব করার পর এই নতুন কবি সাধারণ সংঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান।'—'সময়ের দান' কথাটা স্বীকার করা উচিত।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে আধুনিক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভূমিকায় আইয়ুব যেমন লিখেছেন 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্ততঃ মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি'—হীরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বতন্ত্র ভূমিকায় তেমনি লিখেছেন : 'রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই লেখা থেকে এ সংকলন, আর এখানে সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথকে।'

প্রতিষ্ঠা লাভের পথে বহু সমালোচক কর্তৃক নিন্দিত রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে কবিতায় নতুন বিশ্ব নির্মাণ করেছিলেন, পরে সময়ের মর্জিকে মেনে নিয়ে নিজের তৈরি ঐতিহ্য অতিক্রম করে রবীন্দ্রবিরোধী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

'সময়ের মর্জির' কথা বলেছি, রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন নি, জীবনানন্দ মনে রাখতে বলেছেন, তবু আধুনিকতা 'কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।' প্রাচীন কাব্যের কোনো কোনো অংশ তাই আধুনিক।

আবার সাম্প্রতিক কবিতার বৃহদংশ আধুনিক-ভাব বঞ্চিত। 'সেই সাহিত্যই বড়ো সাহিত্য, যা সর্বযুগেই সাময়িক, যাতে প্রতিযুগই ঠিক যেন আপন মর্মকথাটি শুনতে পায়। তাতে বলার চাইতে না বলার অংশ থাকে বেশি, এবং সেই না বলাটুকু প্রতি যুগ তার অর্থ দিয়ে ভরিয়ে নেয়। এই গুণটাকেই বলা যেতে পারে চিরন্তনতা—সত্যিকার আধুনিকতাও হয়তো তাই।' বুদ্ধদেব বসুর এই বক্তব্য অধিকতর সংহত, অর্থগাঢ়, তাৎপর্যময় রূপ পেয়েছিল জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভাষায়: 'মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।'

খুব খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা বিষয়ে আধুনিক কবি ও কবিতার রসজ্ঞ পাঠক-সমালোচকদের এইসব ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার মিল ও অমিল দুটোই চোখে পড়বে। সেটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই মিল থাকা আর না-থাকাটাও!

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থ — বিষয় — লেখক

[সংকেত—উ=উপন্যাস ক=কাব্য গ্র=গ্রন্থ না=নাটক
প=পত্রিকা প্র=প্রবন্ধ]